জয়িতা

চিত্তরঞ্জন মাইতি

সমকাল প্রকাশনী
১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলি-৬

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৬০

প্রকাশক :
প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট :
সুধীর মৈত্র

মুদ্রাকর :
নিউ মণ্ডল প্রিন্টার্স
৪/১ই, বিডন রো
কলকাতা-৭০০০০৬

ফরেস্ট বাংলো

সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। সামনের সমুদ্রে রঙের খেলাটুকু তন্ময় হয়ে দেখছিলেন ভারত-বিখ্যাত শিল্পী অনির্বাণ চৌধুরী। এই নিরালা নিবাসের সামনের বারান্দায় বসে দীর্ঘ পঁচিশটি বছরের কত দিন যে তিনি সমুদ্রকে কতভাবে দেখেছেন তার কি আর লেখাজোখা আছে। পাশে ধু ধু সোনালি বালির প্রান্তরে ছোট ছোট ঝাউয়ের যে গাছগুলিকে তিনি প্রথমে এখানে এসে দেখেছিলেন, তারা এখন বৃহৎ বৃক্ষসংসারে পরিণত হয়েছে। মাঝরাতে কখনো ঘুম ভেঙে গেলে শিয়রের জানালা দিয়ে তিনি তাকিয়ে থাকেন। মরা জ্যোৎস্নায় ঝাউয়ের পাতাগুলোকে ঠিক যেন বেহালার একগোছা তার বলে মনে হয়। তিনি কান পেতে শোনেন, বেহালা বাজছে। অনেক দূরের অস্পষ্ট জগতের একটা সঙ্গীতের সুর কে যেন ঝড়ের টানে টানে বেয়ে চলেছে।

এই সমুদ্রতীরের বারান্দায় বসে কত কথাই না মনে পড়ে তাঁর। পেছনে ফিরে তাকালে তিনি স্পষ্ট দেখতে পান একটা প্রসারিত পথ। সে পথে হেঁটে চলেছে একটি কিশোর। দেহে দারিদ্র্যের মলিন চিহ্ন। শুধু দুটি চোখ তার ব্যতিক্রম। একটা উজ্জ্বল স্বপ্নের ছবি আঁকা হয়ে আছে সে চোখের চাহনিতে।

পথের এক পাশে একটি বিরাট সৌধ। কি বিস্ময় নিয়ে কিশোরটি তাকিয়ে রইল সেদিকে। ভাগ্য কি দেবে তাকে সেখানে প্রবেশের সামান্যতম সুযোগ?

জীবনের সিঁড়ি ভাঙার কত ইতিহাস স্মৃতির পাতায় লেখা হয়ে আছে শিল্পী অনির্বাণ চৌধুরীর।

আজ তিনি 'শিল্প বিদ্যা ভবনের'ই কেবল অধ্যক্ষ নন, শিল্পী হিসেবে ভারতজোড়া তাঁর নাম। সরকারী বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠানের শিল্প-বিভাগের শীর্ষে আজ কর্মরত তাঁর ছাত্ররা।

তিনি নিজে ফাইন আর্টসের ছাত্র হয়েও কমার্শিয়াল আর্টের ছেলে-

মেয়েদের উৎসাহ দেন। কাছে ডেকে নিয়ে বলেন, কমার্শিয়াল আর্টস হল প্রথমা স্ত্রী, আর ফাইন আর্টস দ্বিতীয়া।

কেউ যদি বলে, এ কথা কেমন করে বললেন অনির্বাণদা ?

অমনি অনির্বাণ বলেন, যা সত্য তাই বলছি। দ্বিতীয়াকে নিয়ে পেয়ার করবি, রঙে রসে জাল বুনবি, কুসুমে রতনে কুমকুমে চন্দনে সাজাবি, কিন্তু খিদে পেলেই দ্বারস্থ হতে হবে প্রথমার। সে-ই পরিপাটি করে খাবার এনে তুলে ধরবে মুখে। তবে ঘরোয়া বলে তাকে ঘেন্না করতে নেই, তাকেও সাজাতে হয়, তার মন জুগিয়ে চললে তবেই সব সচল। জাতশিল্পী কমার্শিয়াল আর্টকেও ফাইন আর্টসের পর্যায়ে তুলতে পারেন।

অনির্বাণ চোধুরী বিয়ে করেননি। বিয়ের সময়টা ছবি এঁকে পার করে দিয়েছেন। এখন ছাত্রছাত্রীরাই তাঁর সংসার, তাঁর সব।

এই সন্ধ্যার মুহূর্তগুলিতে তাঁর পাশে এসে বসেন আর একজন। তিনি এই নিরালা নিবাসের মালিক রত্নমঞ্জুলা দেবী। যৌবনের শেষপ্রান্তে এসেও আশ্চর্য এক শ্রীতে উদ্ভাসিত তাঁর দেহ। মুখে প্রশান্তির ছাপ। জীবনে সব পেলে যে তৃপ্তির আলো ফুটে ওঠে সে আলোর খবর তাঁর চোখের তারায়। কিন্তু সিঁথিতে নেই তাঁর সিঁদুরের চিহ্ন। নিরালা নিবাসে নেই কোন আত্মীয়-সমাগম। নির্জনতা তিনি প্রাণভরে ভালবাসেন; তাই এই সমুদ্রতীরে জীবনের অনেকগুলি বছর তিনি কাটিয়ে দিলেন।

শুধু এখানে আসেন শিল্পী অনির্বাণ আর আসে তাঁর ছাত্রছাত্রীর দল। তারা কেউ জানে না রত্নমঞ্জুলা দেবীর আসল পরিচয়। জানে না অনির্বাণ চৌধুরীর সঙ্গে রত্নমঞ্জুলার পরিচয়ের কোন গোপন সূত্র।

সেদিন রত্নমঞ্জুলা দেবী বসেছিলেন রোজকার মত শিল্পীর পাশটিতে। দেখছিলেন সমুদ্রের জলে শেষসূর্যের খেলা। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল পাশের ঝাউবীথির ভেতর দিয়ে মালবী আর শংখ নিরালা নিবাসের দিকেই ছুটে আসছে। আর্ট কলেজের এ দুটি সেরা ছাত্রছাত্রীকে এবার সঙ্গে এনেছেন শিল্পী চৌধুরী।

ব্যাপারটা জানবার জন্যে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে গেলেন রত্নমঞ্জুলা দেবী। ওপরে তেমনি স্থির হয়ে বসে আছেন শিল্পী অনির্বাণ। সামনের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে ঢেউগুলো। কোটি কোটি বছরের এই সমুদ্রের গান আজও একই সুরে বেজে চলেছে। সৃষ্টির কোন আদিম উষায় পরেছিল অনন্তযৌবনা সমুদ্র একখানা নীল শাড়ি, মাথায় গুঁজেছিল সাদা মল্লিকার মালা, তা আজও খোলেনি। জলে রৌদ্রে সে নিত্য শুদ্ধ।

কয়েকটি পায়ের সাড়া বেজে উঠল সিঁড়িতে। মালবী আর শংখ চেঁচিয়ে উঠল একসঙ্গে, অনির্বাণদা, ইণ্টারন্যাশনাল এগজিবিশনে আপনার ছবি ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে।

শংখ আনন্দে হিপ্ হিপ্ হুররে আওয়াজ তুলল। মালবী ততক্ষণে অনির্বাণের চোখের সামনে ধরল সন্ধ্যার মেলে আসা স্টেটসম্যান কাগজখানা।

অনির্বাণ চৌধুরী দেখলেন খবরটা। সত্যিই তাঁর ছবি শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের সম্মান পেয়েছে। এই ছাত্রছাত্রীরাই জোর করে ফ্রান্সের ওয়ার্লড ফেয়ারে ছবিগুলো পাঠিয়েছিল। শিল্পী অনির্বাণ চৌধুরী সত্যি বলতে কি সে সময় সংকুচিতই হয়েছিলেন মনে মনে। তবে ভারতীয় শিল্পীর কাজ ওদের চোখে পড়ুক এ ইচ্ছাটুকুও যে মনের ভেতর না ছিল তা নয়। কিন্তু এ ধরনের স্বীকৃতি ছিল তাঁর একেবারে আশার বাইরে।

মালবী আর শংখ পায়ে হাত ছোঁয়াতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাদের আশীর্বাদ করলেন।

কাগজের লেখাটা ভাল করে পড়ার জন্যে মালবীর হাতে দিলেন।

কাগজে খবর যা বেরিয়েছে তাতে পুরস্কৃত হয়েছে ওঁর 'ফরেস্ট ফায়ার' ছবিখানা। ছবির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটি ছোট্ট সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আছে।

অরণ্যবহ্নি লক লক রসনা মেলে ঘিরে ফেলেছে। একটি কৃষ্ণচূড়ার সবুজ গাছ মাথায় দুটি আগুনরঙা লাল ফুল ফুটিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। ঠিক তার তলায় ভীত দুটি হরিণ পালাবার পথ না পেয়ে পরস্পর মুখে মুখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

ফ্রান্সের এক চিত্রসমালোচকের মন্তব্য তুলে দেওয়া হয়েছেঃ মৃত্যুর মুখোমুখি জীবনের এক আশ্চর্য অনুভূতি যেন সারা ছবিখানির মধ্যে স্পন্দিত হয়েছে।

রত্নমঞ্জুলা উঠে এলেন ওপরে। সন্ধ্যায় পথের বাঁকে জুঁইফুল গেঁথে সুন্দর কাজললতা তৈরী করে একটি ছেলে। তিনি তার কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন কাজললতা। অনির্বাণের অতি প্রিয় এই ফুলের কারুকর্মটি।

রত্নমঞ্জুলা কাজললতাটি অনির্বাণের হাতে ধরিয়ে দিয়ে প্রণাম করার জন্য নত হতেই তিনি তাঁকে হাত ধরে বসালেন পাশে। বললেন, আজ প্রণাম নয় মঞ্জুলা, শ্রদ্ধা দেখিয়ে দূরে সরিয়ে দিও না আমাকে। এতদিনে তোমারই জয় হল। আজ তোমার প্রতীক্ষার পুরস্কার এল অনেক দূরের মানুষের কাছ থেকে।

মালবী আর শংখ ততক্ষণে বসে পড়েছে ওঁদের দুজনকে ঘিরে।

আশ্চর্য একটা চাঁদ ঝাউগাছের ঝিরিঝিরি পাতার ফাঁকে হঠাৎ জেগে উঠল। কি কোমল লাবণ্যেভরা আলো ঝরে পড়ছিল ঝকঝকে রূপোর ভরা পাত্রখানা থেকে।

ওদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন শিল্পী অনির্বাণ চৌধুরী।

বললেন, শিল্পীর জীবন বড় সুখের নয় শংখ। অনেক ঝড়ের পথ তাকে পেরিয়ে আসতে হবে। কারো সাহায্য পেলে সে তোমার সৌভাগ্য, কিন্তু তার জন্যে তোমার কোন প্রত্যাশা থাকবে না। শুধু একটি কথা আজ মনে রেখো, শিল্পীর সমাজ নেই, সংসার নেই, কেবল নিজের সৃষ্টিকে ঘিরে প্রতি মুহূর্তের পথ চলা। যদি এমনি করে শিল্পসৃষ্টির ভেতর জীবনকে মেশাতে পার তাহলেই একদিন তোমার শিল্প যথার্থ সৃষ্টির পর্যায়ে গিয়ে

পৌঁছবে। জীবনের সবটুকু সুখ-দুঃখের অনুভূতি ছড়িয়ে দিতে হবে ছবির সর্বাঙ্গে, না হলে কোন সৃষ্টিই সফল হবে না মালবী।

মালবী বলল, দাদা, আজ এই সময়টিতে আপনার নিজের মুখে আপনারই ফেলে আসা জীবনের কথা শুনতে বড় ইচ্ছে করছে। আপনার শিল্পী-জীবনের সুখ-দুঃখ সাধনার কথা।

চুপচাপ কতক্ষণ নীরবে বসে রইলেন শিল্পী অনির্বাণ চৌধুরী। বেশ বোঝা গেল স্মৃতির অতলে ডুব দিয়ে তিনি দুঃখের মুক্তোগুলো কুড়োবার চেষ্টা করছেন।

একসময় বলে উঠলেন, একটু আগে যে কথা বললাম তারই সূত্র ধরে আমার জীবনের দুচার কথা বলব। যে ছবিটি আজ স্বীকৃতি পেল তার পেছনে আমার জীবনের যে অভিজ্ঞতাটুকু জড়ানো রয়েছে তা তোমাদের দুজনের কারোরই জানা নেই। তোমাদের অনির্বাণদার জীবনের সেই অজানা রহস্যটুকু আজ জেনে নাও। শুধু অনির্বাণ চৌধুরী তোমাদের শিল্প বিদ্যা ভবনের অধ্যক্ষই নয়, কিংবা ছাত্রদের প্রতি সহৃদয়ই নয়, তারও একটি ব্যক্তিগত জীবন আছে। সে জীবনের ভাল-মন্দ থেকে মানুষটাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখো না।

অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে হঠাৎ থামলেন, অনির্বাণ চৌধুরী।

একসময় আবার শুরু করলেন তাঁর জীবনের কথা।

বছর পনেরো বয়স তখন মা-বাবা কয়েক মাসের ব্যবধানেই মারা গেলেন। আমি দু'দুটো বছর আত্মীয়দের বাড়ী ঘুরে ঘুরে কাটালাম। তারপর একদিন নিঃসম্বল অসহায় অবস্থায় পথে এসে নামলাম।

আমাদের দেশ থেকে কলকাতার দূরত্ব খুব বেশী ছিল না। একদিন কলকাতার পথে হেঁটেই পাড়ি জমালাম। চলার পথে কোন কোন বাড়ীতে গৃহভৃত্যের কাজ নিয়ে থেকেও গেছি। দু-চারদিন পরে গায়ে চলার জোর পেলে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়েছি।

আমি শুনেছিলাম, কলকাতায় আর্ট স্কুল আছে, যেখানে কেবল ছবি আঁকা শেখানো হয়। ছেলেবেলা থেকেই আঁকার দুরন্ত নেশা আমার। যদি কোনরকমে ওখানে ছবি আঁকাটা শিখতে পারি।

ইতিমধ্যে মফস্বল একটা শহরে সিনেমার আঁকার ব্যাপারে সাকরেদী করে ছবি সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেই জ্ঞানটুকু সম্বল করে একদিন চলে এলাম আমার স্বপ্নের তীর্থ কলকাতায়।

অনেক খুঁজে পেলাম আর্ট স্কুলের হদিস। কিন্তু প্রবেশের পথ পাই কি করে? এদিকে খাবার সংস্থান নেই, থাকার আস্তানা খোলা আকাশের নীচে।

দরোয়ানকে ধরে বললাম, একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

ও বলল, প্রিন্সিপাল বহুৎ আচ্ছা মানুষ আছে, ওঁর কাছে ধরে পড়লে একটা

কিছু হইয়ে যাবে। কাছে-পিঠে অপেক্ষা করুন, উনি ময়দান থেকে বেড়ায়ে ফিরবেন তখন মেজাজটাও শরীফ থাকবে, সেই সুযোগে সব কথা বলবেন।

তখনও রোদের সোনা আকাশ থেকে মিলিয়ে যায় নি। আমি পকেট থেকে রঙীন চক বের করে আর্টস্কুলের গেটের সামনের ফুটপাথে রাম-রাবণের যুদ্ধের একটি ছবি আঁকতে লেগে গেলাম।

আঁকতে আঁকতে তন্ময় হয়ে গেছি, কোন দিক দিয়ে যে কত সময় পার হয়ে গেছে জানতে পারিনি। অন্ধকার ঘন হয়ে এসে যখন ছবির টানগুলোকে অস্পষ্ট করে দিল তখন ফুটপাথ থেকে মুখ তুললাম।

চমকে দেখলাম, আমার পাশে প্রশান্ত এক প্রৌঢ়-মূর্তি দাঁড়িয়ে। তিনি মগ্ন হয়ে তখনও আমার ছবি দেখছিলেন।

আমার মনে হল ইনিই প্রিন্সিপাল। আমি সেই সৌম্যমূর্তি ভদ্রলোককে নত হয়ে প্রণাম করলাম।

কোথায় থাক তুমি? পড়াশোনা কর, না ছবি এঁকে বেড়াও?

বললাম, এখানে আমার কোন আস্তানা নেই। আমি ছবি আঁকতে খুব ভালবাসি। আপনি একটু দয়া করলে আমি আপনার স্কুলে ছবি আঁকার সুযোগ পাই।

উনি বললেন, কাল এসো, দেখব।

বলেই চলে গেলেন গেট পার হয়ে কোয়ার্টারের দিকে।

আমার তখন আনন্দে দিশাহারা অবস্থা। আমি ফুটপাথ ধরে প্রায় নাচতে নাচতেই এগিয়ে চললাম।

হঠাৎ পেছন থেকে ডাক শুনলাম, বাবু, ও বাবুসাহেব!

পেছন ফিরে দেখি স্কুলের সেই দরোয়ান। অনেকখানি পথ আমার পেছনে ছুটে এসেছে, তাই হাঁপাচ্ছে।

বলল, প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন, আপনার নাকি থাকবার ডেরা নাই, আপনাকে তলব করিয়েছেন, চলুন হামার সঙ্গে।

আমি তো অবাক। হঠাৎ আমার চোখে জল এসে গেল। কতদিন মানুষের স্নেহ পাইনি। একটা মিষ্টি কথা একটি দিনের জন্যেও মুখ ফুটে কেউ বলেনি।

আমি যখন আর্টস্কুলের বড় বড় থামওয়ালা বিল্ডিং পেরিয়ে প্রিন্সিপালের কোয়ার্টারে পেঁছলাম তখন চারদিকে সন্ধ্যার বাতি জ্বলে গেছে।

প্রিন্সিপাল ড্রইংরুমে বসেছিলেন। দরোয়ানের সঙ্গে আমি ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। প্রিন্সিপালের সামনের টেবিলে রবীন্দ্রনাথের একটি পাথরের মূর্তি। তিনি সেদিকে তাকিয়েছিলেন নিবিষ্ট হয়ে। আমরা যে ঘরে ঢুকলাম, তিনি টেরই পেলেন না। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে ঘরের চারিদিকে দেখতে লাগলাম। দেয়াল জুড়ে ছবির মেলা। সব মিলিয়ে মনে হল বসন্তের বনে যেন রঙের জোয়ার লেগেছে।

এক সময় ধ্যান ভাঙলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

আমার কাছে এসে বললেন, ছবি দেখছ, এ সব আমার স্কুলের ছাত্রদের আঁকা।

উনি ঘুরে ঘুরে এক একটা ছবির বৈশিষ্ট্য কি তা বুঝিয়ে বলতে লাগলেন। কোন ছবি কোন মিডিয়ামে আঁকা তাও বলে দিলেন। ছবির কথা বলা হয়ে গেলে তিনি আমাকে একটা আসন দেখিয়ে বসতে বলে নিজেও বসলেন।

আমরা তখন দুজনের মুখোমুখি।

প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী বললেন, বাড়ীতে কে আছেন তোমার ?

কেউ নেই স্যার। বাবা-মা মারা গেছেন। ভাই-বোনও নেই।

তোমার দেশের বাড়ি-ঘর তুমি না থাকলে কে দেখাশোনা করবে ?

একটা জঙ্গলের ভেতরে পড়ো ভাঙা বাড়ীতে আমরা থাকতাম। এখন সেখানে কেউ থাকে না।

তোমার আসবাবপত্র কিছু সেখানে নেই ?

কিছু নেই স্যার।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তুমি আমার কোয়ার্টারে আজ রাত থেকেই থাকবে। কাল তোমাকে আর্টস্কুলে ভর্তি করে নেব।

সাহস করে বললাম, মাইনে দেবার ক্ষমতা নেই আমার।

উনি বললেন, সেটা ভেবে নিয়েই তো তোমাকে ভর্তি করছি।

সেদিন থেকে একটা সতেরো বছরের ছেলে এক হৃদয়বান শিল্পীর বাড়ীতে আশ্রয় পেয়ে গেল।

সেখানেই আমার পরিচয় সেঁজুতির সঙ্গে। প্রিন্সিপাল ললিতমোহন চক্রবর্তীর মেয়ে। বয়সে আমার চেয়ে কিছু ছোট হবে। কিন্তু ডানপিটের ওস্তাদ।

আমি প্রথম ঘরে ঢুকে সেঁজুতিকে দেখতে পাইনি, কারণ সে তখন মাসীর বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিল। রাতে যখন আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছি তখন ওরা এলো। দরোয়ানের কাছেই আমি সেঁজুতি সম্বন্ধে সব খবর পেয়েছিলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল ওরা। একটি মেয়ের গলা কল কল করে বেজে উঠল। বুঝলাম সেঁজুতির গলা।

ওরা উঠে গেল তিনতলায়।

আমি শুয়ে শুয়ে নিজের ভাগ্যের কথা ভাবছি। জানালা দিয়ে খোলা ময়দানের অনেকখানি দেখা যায়। আমি সেদিকে তাকিয়ে আকাশের তারা দেখতে লাগলাম। অগণিত নক্ষত্রের সংসার। নিয়ম শৃঙ্খলায় সাজানো। নিজের জীবনের কথা ভাবলাম। কত এলোমেলো, কত বিশৃঙ্খল।

কতক্ষণ রাতের আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে এমনি সব ভাবছিলাম মনে নেই, হঠাৎ ওপর থেকে কার গলা যেন বেজে উঠল, এই বুকুনি যাসনে, এখন যেতে নেই!

কে কাকে কি জন্যে বারণ করছে বোঝার আগেই সিঁড়িতে দুড়দাড় পায়ের

আওয়াজ বেজে উঠল। মুহূর্তের ভেতর আমার ঘরের বাতিটা টুক করে জ্বলে উঠল। সারা ঘর আলোয় আলোময়। খালি গায়ে শুয়েছিলাম। অপ্রস্তুত হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি একটি বছর পনেরো বয়েসের মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমাকে তার দিকে ফিরে তাকাতে দেখেই মুহূর্তে সে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সিঁড়িতে দ্রুত শব্দ তুলে ওপরে উঠে গেল।

আমার অপ্রস্তুত অবস্থাটা কাটাতে সময় লাগল।

কিন্তু স্বাভাবিক হলাম যখন তখন সেঁজুতি ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই। ভারী সুন্দর দেখতে মেয়েটিকে। যেমন মুখের চেহারা, দেহের গড়ন, তেমনি দুধ-হলুদ মেশানো রঙ। মেয়েটি সম্বন্ধে দরোয়ান রামপ্রসাদের মুখে যা শুনেছিলাম তার পরিচয় প্রথম রাতেই পাওয়া গেল।

ওর কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ হাসি পেল। ওকে ওপর থেকে নীচে আসতে যিনি মানা করেছিলেন, তিনি 'বুক্‌নি' বলেই ওকে ডেকেছিলেন। তাহলে সেঁজুতি ওর পোশাকী নাম। আসলে ও যে নামে পরিচিত সেটা 'বুক্‌নি'। ওকে যদিও সে রাতে একটি কথাও আমার মুখোমুখি বলতে শুনিনি, তবু ডানপিটেমির যে নমুনা ও দিয়েছে তাতে বুক্‌নিতে ও যে একটা ভাল প্রাইজ পাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অনেকদিন ভাল করে ঘুমোইনি, তাই এমন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে ভোরে বিছানা ছাড়তে পারিনি।

হঠাৎ দরজার কাছে একটা গলা বেজে উঠল, শুনছেন, এই যে শুনছেন কালাচাঁদবাবু, আমার মাস্টারমশায় আসার সময় হয়ে গেছে, এখন উঠতে পারেন।

খুব লজ্জিত হয়ে উঠে পড়লাম। বিছানাপত্র একপাশে সরিয়ে রাখলাম। হঠাৎ মনে হল, মেয়েটা আমাকে কালাচাঁদবাবু বলে ডাকল কেন? আমার রঙটা একটু ময়লা বলে কি?

ঘর থেকে জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় বললাম, আমার নাম কালাচাঁদ নয়, অনির্বাণ চৌধুরী।

মেয়েটি দরজার একপাশে দাঁড়িয়েছিল, মুখখানায় অদ্ভুত ভঙ্গী করে বলল, ইস্!

সতেরো বছরের ছেলে, রাগ যে একটু হয়নি এ কথা বলি কি করে।

হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, বক বক কর সারাদিন, তাই বুঝি তোমার নাম বুক্‌নি?

দেখলাম, চোখে-মুখে ওর বিস্ময়ের একটা ছবি ফুটে উঠেছে। ওর নামটা এই রাতের ভেতর আমি কি করে জেনে ফেললাম তাই ও ভাবতে লাগল।

বেশীক্ষণ নয়, নামতে যাচ্ছি, ও বলল, অনেক বেলা অবধি ময়দানে বেড়ানো খুব বিচ্ছিরি, তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ওপরে মায়ের কাছে চলে যেও। মা খাবার নিয়ে বসে থাকবে।

আমি বেরিয়ে গেলাম।

যখন ফিরে এলাম তখন স্যার সঙ্গে। তিনি রোজ সকালে ময়দানে অনেক সময় ধরে হেঁটে বেড়ান।

কোয়ার্টারে ঢোকার মুখেই দেখলাম এক দৃশ্য। সেঁজুতি মস্ত উঁচু পাঁচিলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। একটা বিরাট পাখির ডানার মত দুটো হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে শরীরের ব্যালেন্স রাখছে।

আমি ভয়ে থমকে দাঁড়ালাম। ওখান থেকে একবার পড়লে নির্ঘাৎ পা দুটো ভাঙবে।

দৃশ্যটার দিকে স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যেতেই উনি মুখে আঙুল রেখে আমাকে কিছু মন্তব্য করতে বারণ করলেন।

ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলাম, দেখি তার আগেই ও এসে বসে আছে। তাকিয়ে দেখি জানালার গরাদ নেই। ওদিক দিয়ে কার্নিশ বেয়ে পাঁচিলে নেমে আপন মনে খেলা দেখাচ্ছিল।

ওপর থেকে চা আর জলখাবার খেয়ে নেমে এলাম আমার দোতলার ঘরে। ও টেবিল-চেয়ার সাজিয়ে বসেছিল। বোধকরি টিউটরের প্রতীক্ষা করছিল।

বললাম, বিনি পয়সায় একটা খুব ভাল সার্কাস দেখলাম।

ও ছেলেমানুষের মত লাফিয়ে উঠে বলল, কোথায়, কোথায় ?

বললাম, আর্টস্কুলের পাঁচিলের ওপর।

ও এবার ধ্যাৎ বলে চেয়ারে বসে পড়ল।

একটু পরেই ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, অনির্বাণদা তুমি এখন পাশের ড্রইংরুমে একটু যাবে, আমাদের আতংকভঞ্জনবাবু আসছেন।

বললাম, যাচ্ছি, কিন্তু আতংকভঞ্জনবাবু কে সেঁজুতি ?

ও বলল, আমার টিউটর। অংক আর ভূগোলের আতংকভঞ্জনের জন্যে মা ওঁকে নিযুক্ত করেছেন।

বলতে বলতে সিঁড়িতে আতংকভঞ্জনবাবুর চটিজুতোর ফটাস ফটাস আওয়াজ শোনা গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে সরে পড়লাম।

ওঘরে বসে কিন্তু মনের ভেতর আমার একটা ভাবনা এল। সুন্দর একটা সুখের ভাবনা। আলতো করে পাতাসমেত গন্ধরাজের একটা ফুল নাকের ওপর ছুঁইয়ে নিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি কোমল মধুর একটা অনুভূতি আমার সতেরো বছরের তরুণ জীবনটাকে প্রথম ছুঁয়ে গেল। সেজুঁতি আমাকে মিষ্টি গলায় অনির্বাণদা বলে ডেকেছে। আমার কানে বার বার বাজতে লাগল সে ডাক। তারপর সেই ডাকটুকু হাওয়ায় ভর করে আলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঐ ময়দান পেরিয়ে আকাশের দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

আতংকভঞ্জনবাবু চলে যেতেই সেঁজুতি এল আমার ঘরে। খুব মিষ্টি আর শান্ত গলায় বলল, তোমাকে অনেকক্ষণ একা বসে থাকতে হল, তাই না ?

বললাম, এ ঘরখানা ছবি দিয়ে মোড়া, তাই একা বসে আছি মনে হয় না।

সেঁজুতি বলল, কাল আমরা ফিরে আসতেই বাবা তোমার কথা বলল। কি ভাল যে তোমার ছবির হাত সেই কথা মাকে বলছিল। তুমি গেটের সামনে রাম-রাবণের দারুণ একটা যুদ্ধের ছবি এঁকেছ। বাবার মুখে শুনে খেতে খেতেই আমি উঠে দৌড়ে গিয়ে দেখে এসেছি।

বললাম, তুমি আমার ঐ ছবিটা দেখেছ ? সত্যি করে বল কেমন লেগেছে ?

সেঁজুতি সঙ্গে সঙ্গে মুখখানাকে কুঁচকে বলল, বিচ্ছিরি।

সত্যি বলছ ?

ও বলল দারুণ লেগেছে আমার রাবণের মুখখানা। দশখানা মুখ আর দশজোড়া চোখে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে।

বললাম, রামচন্দ্রকে কি রকম লাগল ?

বড় বড় টানা টানা খুব সুন্দর চোখ, কিন্তু রাগ নেই। হাতে তীর-ধনুক আছে, তাই যুদ্ধ করছে বলে মনে হচ্ছে।

বললাম, খুব রাগ দেখায় যে সে বড় বেশী যুদ্ধ করতে পারে না। কথায় বলে, যত গর্জে তত বর্ষে না।

ও বলল, আজ সকালে কেন পাঁচিলে উঠেছিলাম জান ?

মাথা নেড়ে জানালাম, না।

সেঁজুতি বলল, ভেবে ভেবে একটা কিছু বলই না।

অনেক ভেবে বললাম, তুমি ব্যালেন্স বেস প্র্যাকটিশ করছিলে।

সেঁজুতি বলল, দূর, হল না।

আবার ভাবতে লাগলাম। এবার বললাম, নিশ্চয়ই মর্নিং ওয়াক করছিলে।

সেঁজুতি মুখ ভেংচে হাত নেড়ে বলল, তোমার মুণ্ডু।

তারপর নিজের কথাতে অপ্রস্তুত হয়ে বলল, তুমি কিছু মনে করলে না তো অনির্বাণদা ?

ওর কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, আমি হেরে গেছি, এখন তুমি বল কি জন্যে পাঁচিলে উঠেছিলে।

ও বলল, তুমি একটা হেরো। আচ্ছা বলছি শোন, তোমার ছবি দেখতে উঠেছিলাম।

অবাক হয়ে বললাম, আমার ছবি দেখতে ? মিছে কথা। সে তো তুমি কালই দেখেছ। তাছাড়া দেখবার ইচ্ছে হলে নীচে গিয়েই তো দেখতে পারতে।

ও বলল, তুমি ছবি হয়তো আঁকতে পার কিন্তু তার নিয়ম জান না। ছবিকে বার বার দেখতে হয় নানা এ্যাংগেল থেকে। তাই ওপর থেকে দেখছিলাম কেমন দেখায়। এরোপ্লেন থেকে তোলা ছবি দেখনি, কি সুন্দর দেখায়।

কেমন লাগল ওপর থেকে আমার ছবি ?

অদ্ভুত লাগল। মনে হল, ঠিক যেন ঘোলা জলের ওপর মস্তবড় কাগজের একখানা ছবি ভেসে আছে।

ওর কথা শুনে আমার হাসি পেল।

আমাকে হাসতে দেখে ও গম্ভীর হয়ে বলল, বিশ্বাস না হয় দেখে এসো না।

বললাম, আমি কি বাঁদর যে পাঁচিলে লাফ দিয়ে বেড়াব।

ও হঠাৎ আমার মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলল, তার মানে, আমাকে বাঁদর বলা হচ্ছে?

উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময় সিঁড়ি ভেঙে কেউ আসছে বলে মনে হল, আর এক পলকে পাখির মত হুস্ করে উড়ে পালাল সেঁজুতি।

বলতে বলতে একটুখানি থামলেন অনির্বাণ চৌধুরী। শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের আমার ছেলেমানুষী কাহিনী বলে বোর করছি না তো?

মালবী বলল, কি বলছেন দাদা, অদ্ভুত ভাল লাগছে আমার। মনে হচ্ছে আমি ঐ আর্টস্কুলের ভেতর দাঁড়িয়ে আপনাদের দেখছি।

শংখ বলল, আপনার জীবনের এই অজানা দিকটা আপনি আজ না বললে আমরা কোনদিনই জানতে পারতাম না।

অনির্বাণ এবার একটু মৃদু হেসে তাকালেন রত্নমঞ্জুলার দিকে।

রত্নমঞ্জুলা মুখে হাসি টেনে সে হাসির উত্তর দিলেন।

অনির্বাণ চৌধুরী বললেন, কম বয়সের কথা বলতে গিয়ে মানুষ একটু বেশী প্রগল্ভ হয়ে ওঠে। অন্যের ভাল লাগা না লাগার দিকে খেয়াল থাকে না।

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন, আমার কাহিনীর পাতা থেকে চারটে বছরের খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে দাও। একটি কিশোরী মেয়েকে দিনের পর দিন আমি বড় হতে দেখলাম। তার চপলতা আস্তে আস্তে কমে এল। সে মনে মনে গভীর হল। এখন সে বর্ষা ঋতুতেও বসন্তের কথা ভেবে উতলা হয়। একুশ বছরের অনির্বাণ চৌধুরীর মনেও ওর ঐ মাধুরীর ঢেউ এসে লাগে।

সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করে প্রেসিডেন্সীতে ঢুকল সেঁজুতি। কিন্তু ইতিমধ্যে সে আর একটা বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠছিল। আশ্চর্য বলিষ্ঠ রেখার টান ছিল তার হাতে। রঙের পরিমিত ও কোমল ব্যবহারে তার যেন স্বাভাবিক দক্ষতা ফুটে উঠত। সে আর্টস্কুলে শিখত না, কিন্তু বাড়ীতে আমার রঙ-তুলি নিয়েই কাজ শুরু করেছিল। প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী একদিন হঠাৎ আমার আঁকার ঘরে তার ছবি দেখে বিস্ময়ে থমকে গেলেন।

আমাকে বার বার জিজ্ঞেস করলেন, এ বুকুনির নিজের হাতে আঁকা, তুমি ঠিক বলছ? কোন সাহায্য তুমি তাকে করনি?

আমি বললাম, প্রথম প্রথম সামান্য সাহায্য করেছি, কিন্তু এখনকার এ সব ছবিই ওর নিজের হাতের তৈরী, নিজের মাথা থেকে সাবজেক্টও

ঠিক করেছে ও।

উনি শুনে বললেন, ওকে কলেজে পাঠিয়ে বোধহয় ভুলই করলাম অনির্বাণ। আর্টস্কুলে ঢুকিয়ে নিলেই পারতাম।

একটু থেমে বললেন, যা হবার হয়েছে, এখন তুমি ওর ছবি আঁকার দিকে একটু লক্ষ্য রেখো।

বেরিয়ে যাবার সময় ফিরে তাকিয়ে বললেন, যখন বাইরে কোথাও স্কেচ করতে যাবে তখন সঙ্গে নিয়ে যেও বুকুনিকে।

সেঁজুতি কলেজ থেকে এলে ওকে আর তিনতলায় উঠতে না দিয়ে মাঝপথে আমার ঘরে ডেকে নিলাম। খবরটা শোনাতে ওর মুখে একটা খুশীর ভাব খেলা করে গেল।

শেষে যখন বললাম, এবার থেকে স্যারের অর্ডার হয়েছে, যখনই আমি স্কেচ করতে বাইরে বেরোব তখনই তুমি আমার সঙ্গী হবে। তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে স্কেচ কবে বেড়াবে।

সেঁজুতি বলল, এটুকু তোমার বানানো।

বিশ্বাস কর সেঁজুতি।

ও চোখে-মুখে আশ্চর্য সুন্দর একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, সত্যি বলছ অনির্বাণদা, আমি আর তুমি একসঙ্গে স্কেচ করতে বেরোব ?

আমিও মুখে হাসি ফুটিযে মাথা নাড়লাম।

ও ওপরে চলে গেলে আমি ভাবতে লাগলাম, কত পরিবর্তন হযেছে সেঁজুতির স্বভাবের। কত গভীব আব মৃদুভাষী হযেছে ও। কিশোরী সেঁজুতি হলে আমার কথা শুনেই বলে উঠত, তোমার সঙ্গে বেরোব না হাতী! আর যদি বেরোই তাহলে তুমি যখন মোষের স্কেচ করবে তখন আমি তোমার ছবি আঁকব। মিলিয়ে দেখো দুটো একইরকম হবে।

কিশোরী সেঁজুতি তারপব আমি স্কেচ করতে বেরোলেই ছায়ার মত নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে সঙ্গে চলত। ওর মুখের ভাষা আর কাজের মিল ছিল না তখন।

আজকের তরুণী সেঁজুতির সঙ্গে কত তফাৎ সেদিনের কিশোরী কন্যাটির।

এরপর ঘন ঘনই আমরা স্কেচ করতে বাইরে বেরোতে লাগলাম।

তোমরা নিশ্চয়ই ধারণা করতে পার আমরা ছবির জগৎ থেকে ধীরে ধীরে পরস্পবের অন্তরের জগতেরও সন্ধান নিতে লাগলাম। এমনি করে একদিন দেখলাম, আমরা পরস্পরকে রেখার বাঁধনে ধরে রাখতে আনন্দ পাই।

আর ঠিক সেই সময় একটা ঘটনা ঘটল। আর্টস্কুলে যে মেয়েটি মডেলের কাজ করত সে কোন কারণে বাংলাদেশের বাইরে চলে গেল।

আমাদের স্কুলের ছেলেরা দারুণ অসুবিধায় পড়ল মডেলের অভাবে।

আমি আর সেঁজুতি ছবি আঁকছিলাম আমার ঘরে। একসময় কথায় কথায় স্কুলের মডেলের চলে যাওয়ার কথাটা উঠল।

ছবি আঁকতে আঁকতে হঠাৎ সেঁজুতি মুখ না তুলেই বলল, তুমিও মডেলের অভাবে অসুবিধায় পড়লে নাকি ?

বললাম, খুবই স্বাভাবিক। এখন ডিটেল নিয়েই কাজ হচ্ছিল। এ সময়ে ওর চলে যাওয়াটা আমাদের পক্ষে মুশকিলের ব্যাপার বই কি।

ও একটুও সংকোচের সুর গলায় না ঢেলে স্পষ্ট করেই বলল, আমাকে দিয়ে কাজ চলবে তোমার ?

আমি কথাটা শুনে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। কি বলছে সেঁজুতি।

মুখে বললাম, তার মানে, আজকাল কিছু না ভেবেই কথাবার্তা বলছ নাকি ?

ও দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, অনির্বাণদা জীবনে তোমাকে আর কিছু দিতে না পারি অন্ততঃ তোমার শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে সামান্য সাহায্য করতে পারলে অগাধ তৃপ্তি পাব জানবে।

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না।

শেষ পর্যন্ত ওর আগ্রহেই রাজী হতে হল। কিন্তু আমাদের কাজ চলল বড় সাবধানে আর সংগোপনে।

ও কলেজ যাবার নাম করে আমার ঘরে এসে ঢুকত। সেঁজুতির মা প্রায়ই দুপুরের দিকে বেড়াতে যেতেন বোনের বাড়ি। স্যার স্কুল ছুটির আগে নিতান্ত জরুরী পারিবারিক দরকার ছাড়া কোনদিন কোয়ার্টারে আসতেন না। আমি বাইরে স্কেচ করতে যাবার নাম করে চলে আসতাম আমার ঘরে।

আমি সেঁজুতির পূর্ণ দেহ-ভঙ্গীমা দেখবার আর আঁকবার সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রায় নিরাবরণ দেহটা আঁকতে গিয়ে এতটুকু বিকার আসত না আমার মনে। আমি মগ্ন হয়ে আমার কাজ করে যেতাম। বোধহয় সত্যিকারের কোন শিল্পীরই কাজের ভেতর ডুবে গেলে দেহ-বাসনার কথা মনে আসে না।

আমার আঁকা শেষ হলে ও একে একে ওর বেশবাস পরে নিত। আমি ওর দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে যেতাম। একটুও বিকারের ছবি ফুটে উঠত না ওর মুখে। রবীন্দ্রনাথের বিজয়িনী কবিতাটি পড়েছিলাম। অপূর্ব নগ্ন সৌন্দর্যের অধিকারিণী নারীর বিকারহীন চরণে প্রেমের দেবতা মদন তূণশূন্য করে সমর্পণ করেছিল তার পূজা-উপচার।

আমার মনে হত, কেন জানি না ও নগ্ন সৌন্দর্য নিয়ে আমার সামনে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হত, ও যেন কবির সেই অচ্ছোদ সরসী নীরে স্নানরতা নগ্ন নারী, যার স্তনাগ্রচূড়ায় এসে পড়েছে প্রভাতের স্বর্ণ রবি-রশ্মি।

আবার মনে হত, ও যেন উর্বশী কবিতার সেই নারী, যে জায়া নয়, জননী নয়, কন্যাও নয়। সে শুধু নারী। অনন্তযৌবনা প্রকৃতি।

একদিন রবীন্দ্র-রচনাবলী থেকে ওকে বিজয়িনী আর উর্বশী কবিতা দুটি

পড়ে শোনালাম। ও চিবুকে হাত রেখে শুনল। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ও কবিতার নায়িকাতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

পড়ার শেষে আমি কবিতা দুটি সম্বন্ধে আমার অনুভূতির কথা বলছিলাম।

ও এক সময় মুখ তুলে বলল, কলেজের প্রফেসর হলে তুমি খুব নাম করতে।

হেসে বললাম, একজন অশিক্ষিত শিল্পীকে এতখানি কমপ্লিমেণ্ট দিও না, মাথা ঘুরে যাবে।

ও অমনি বলল, ভাগ্যিস প্রফেসার হও নি, তাহলে শিল্পী অনির্বাণ চৌধুরীকে দেশ হারাত।

ইতিমধ্যে কলকাতার কয়েকটা এগজিবিশনে আমার ছবি পুরস্কৃত হল। কয়েকখানা ছবি বিক্রি হল খুব চড়া দামে। প্যাস্টেলে আঁকা 'হারভেস্ট' ছবিখানা কিনলেন এক শিল্পরসিক ইংরাজ মহিলা।

ছবি বিক্রি হলে সেঁজুতির মুখখানা কেমন ভারী হয়ে উঠত। চোখ দুটো ওর ছল ছল করত। মনে হত যেন ওর একান্ত আপনার সঞ্চিত ধন অন্য কেউ অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে।

স্যার আমার মাথায় হাত রেখে বলতেন, ছবি বিক্রি হওয়া ভাল। তোমার প্রতিভা এমনি করেই ছড়িয়ে পড়বে। সমঝদাররা শিল্পীর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু।

একদিন সেঁজুতির কি খেয়াল হল, ও বললে, এমন একখানা ছবি তুমি আঁকতে পার যাতে তোমার কাছ থেকে কোনদিন আমি হারিয়ে যেতে না পারি? ঐ ছবির ভেতর দিয়ে আমরা দুজনের কাছে চিরদিনের হয়ে থাকব।

বললাম, এ মুহূর্তে তা কেমন করে বলি সেঁজুতি। আমাদের ইচ্ছা যদি গভীর হয় তাহলে দেখো একদিন আপনিই সে ছবি জন্ম নেবে।

একবার কলারসিকরা খুব উচ্ছ্বসিত হলেন আমার একটা ছবির সিরিজ প্রদর্শনীতে দেখে।

আমি কবিগুরুর 'সাগরিকা' কবিতাটি অবলম্বন করে কয়েকখানি ছবি এঁকেছিলাম। ঐ ছবির নায়িকা সেদিন কে ছিল তা নিশ্চয়ই তোমাদের বলে দিতে হবে না। শুধু নায়িকা নয়, নির্জন ঘরে মডেল হয়ে ও 'সাগরিকা' সিরিজের ছবিগুলিকে সার্থক করে তুলেছিল।

কথার ভেতর থামলেন অনির্বাণ চৌধুরী।

ধীরে ধীরে তাঁর গলায় বেজে উঠল সাগরিকা কবিতার কয়েক ছত্র। তিনি যেন মগ্ন হয়ে তাঁর আঁকা ছবির সঙ্গে কবিগুরুর কথাগুলো মিলিয়ে দেখছেন।

সাগরজলে সিনান করি সজল এলো চুলে
বসিয়াছিলে উপল উপকূলে।
শিথিল পীত বাস

মাটির 'পরে কুটিলরেখা লুটিল চারি পাশ।
নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
চিকণ সোনা-লিখন ঊষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।

অনির্বাণ বললেন, সদ্য স্নান করে এলো চুলে ও সেদিন সম্পূর্ণ নিরাবরণ আর নিরাভরণ দেহে আমার সামনে বসেছিল। সিক্ত কাপড়খানা লুটিয়ে পড়েছিল একপাশে। ওর মুখে ফুটে উঠেছিল স্বর্ণচাঁপার লাবণ্য। কি অপূর্ব আদিম রমণীর মহিমা সেদিন ওকে ঘিরে বিরাজ করছিল তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমার শুধু মনে হয়েছিল ও সৃষ্টির সদ্যজাত প্রথম কুমারীকন্যা।

এমন সময়ে সেখানে এসে দাঁড়াল পরদেশী। তার কণ্ঠে বেজে উঠল আকুতি।

মকরচূড় মুকুটখানি প'রি ললাট 'পরে
ধনুকবাণ ধরি দখিন করে
দাঁড়ানু রাজবেশী—
কহিনু, 'আমি এসেছি পরদেশী'।

কবিতাটি পড়ে পড়েই ছবি আঁকছিলাম। এই অংশে তুলি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আমার অঙ্গে নেই রাজবেশ, হাতে নেই ধনুর্বাণ, মাথায় নেই মকরচূড় মুকুট, তাই এ হতভাগ্য আর তোমার পরদেশী হতে পারল না।

ও অমনি মিষ্টি হেসে বলল, তুমি আমার ভিখিরী রাজপুত্র।

আমি সাধারণতঃ দরজা বন্ধ করেই ছবি আঁকতাম। আমাদের এই লুকোচুরির খবর জানত একটি মাত্র লোক। সে হল আমাদের বুড়ো দবোয়ান রামপ্রসাদদা। সে আমাকে আর তার বুক্‌নিকে বড় ভালবাসত। আমাকে চৌধ্রী ভেইয়া বলে ডাকত।

একদিন ছবি আঁকতে বসেছি, সামনে বসেছে সাগরিকার মডেল, হঠাৎ দরজায় কে টোকা দিল। দারুণ চমকে উঠে দাঁড়াল সংকুচিত। চোখে-মুখে ভয়ের সে কি অভিব্যক্তি! ছড়ানো কাপড়খানা পলকে মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে চেপে ধরল বুকে। ও তখন দস্তুরমত কাঁপছিল।

আমি তখনও তুলি হাতে নিয়ে ওর দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে বসে আছি দেখে ও ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেল।

আমি ওর ঐ অবস্থার স্কেচ করতে করতে বললাম, ঠিক অমনি করে দাঁড়িয়ে থাক, চমৎকার ছবি ফুটেছে সাগরিকার!

স্কেচ সেরে ওর দিকে তাকিয়ে আবৃত্তি করলাম,

চমকি ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি শিলা-আসন ফেলে
শুধালে 'কেন এলে?'
কহিনু আমি, 'রেখো না ভয় মনে,
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুলবনে।'

আবৃত্তি সেরে ওকে বললাম, ভয় নেই, বোস! তোমার এই ত্রাসের

ছবিটুকু নেবার জন্যেই রামপ্রসাদদাকে টোকা দিতে বলেছিলাম।

ও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দেখাচ্ছি বুড়োকে মজা। আমাকে এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিল যে এখনও বুকের ধুকধুকুনি যায়নি।

বললাম, যে শাস্তি দেবে আমাকেই দাও। দূত চিরদিন অবধ্য। তাছাড়া বুড়ো টোকা দিয়েই পালিয়েছে ইস্কুলে। এ তল্লাটেই নেই।

কিছুদিন পরে একটি ঘটনা ঘটল। আমার সাগরিকা সিরিজের ছবি পুরস্কার পাবার পর একটা চাপা সমালোচনার গুঞ্জন আর্ট স্কুলে। সে গুঞ্জন আর্ট স্কুল ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। আমার আঁকা সাগরিকার সঙ্গে হুবহু একটা মিল নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে সেঁজুতির। এমন কি ঠোঁটের নীচের তিলটি পর্যন্ত।

প্রিন্সিপাল চক্রবর্তীর কানে কথাটা পেঁছিতেই তিনি বললেন, খুব স্বাভাবিক। বুক্নিকে ও কত বছর ধরে দেখছে। এমন সুন্দর ক'টি ছবি আঁকতে গিয়ে ওর কথা অনির্বাণের মনে পড়াটা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়।

প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু মা হয়ে মেয়ের নামের রটনা হেসে উড়িয়ে দিতে পারলেন না সুতপা দেবী। তিনি মেয়েকে এ বিষয়ে কোনকিছু বললেন না। আমি আড়ালে আবডালে থেকে সব শুনছিলাম। সেঁজুতির মুখখানা ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল। আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছিলাম।

একদিন সেঁজুতি কলেজে গেছে, আমি আর্ট স্কুলে, দরোয়ান রামপ্রসাদদা আমাকে বাইরে ডেকে এনে বলল, মাইজী তোমাকে তলব দিয়েছে চৌধুরী ভেইয়া।

গলাটা কেমন শুকিয়ে এল। বললাম, কি জন্যে জানো রামপ্রসাদদা ?

ও আমি বলতে পারব না। তবে মুখখানা বহুৎ বেজার দেখলাম।

আমি কোয়ার্টারের দিকে যেতে যেতে ভাবলাম, এবার আমার শাস্তি নেবার পালা। পথের থেকে যাঁরা আমাকে কুড়িয়ে এনে দুহাত ভরে এতকিছু দিলেন, আমি তাঁদের কি পুরস্কারই না দিয়েছি। তাঁদের একটি মাত্র আদরের মেয়ে তাঁদেরই বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের কাছে আমারই জন্যে আজ অপমানিত হচ্ছে।

মনে মনে প্রস্তুত হলাম। যে শাস্তি সুতপা দেবী দেবেন মাথা পেতে বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নেব।

একথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে মনে দারুণ জোর পেলাম। সেই সঙ্গে একটা কথার উদয় হল মনে। আমি সেঁজুতির সঙ্গে কোনরকম ব্যাভিচারে লিপ্ত হই নি। সুযোগ এসেছিল, চরম সুযোগ, কিন্তু আমি কিংবা সেঁজুতি কেউই তাকে গ্রহণ করি নি।

মডেল দেখে ছবি আঁকা যদি পাপ হয় সে পাপ আমি করেছি। আর মনে তিলমাত্র বিকার না রেখে মডেলের কাজ করলে যদি পাপ হয়, তাহলে

সংস্কৃতিকে সে পাপ স্পর্শ করেছে।

আমি তিন তলায় উঠে গিয়ে দেখলাম, সুতপা দেবী আমারই জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছেন।

কাছে গিয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট গলায় বললাম, আমায় ডেকেছেন মা ?

সুতপা দেবী আমার মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, বোস বাবা কথা আছে।

আমি তাঁর পাশেই একটা আসনে বসে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সুতপা দেবী বললেন, এগজিবিশনে তোমার ছবিগুলোর খুবই প্রশংসা হয়েছে শুনে দেখতে গিয়েছিলাম।

বললাম, আপনার কেমন লাগল ?

সুতপা দেবী বললেন, খুব সুন্দর কাজ হয়েছে তোমার।

একটু থেমে বললেন, সঙ্গে ছিলেন তোমার মাসীমা। উনি এমন একটা মন্তব্য করলেন যা শুনে মনটা বড় দমে গেল বাবা।

আমি বেশ জানি কথাটা কোনদিকে মোড় নিচ্ছে। তবু বললাম, ছবি ওঁর ভাল লাগেনি বুঝি ?

উনি বললেন, সে রকম কোন মন্তব্য উনি করেননি। তবে ছোট্ট করে বললেন, এ যে বুকুনি বসে আছে দেখছি, তাও বে-আব্রু।

একটু থেমে বললেন, তুমি বুঝতে পারছ বাবা, মা হয়ে কথাটা আমার প্রাণে কতখানি বেজেছে।

বললাম, মিথ্যা বলে লাভ নেই মা, সংস্কৃতির আদল আমার ছবিতে এসে গেছে। তবে শুধু একটা কথা আপনাকে বলব, অন্যায় কোন কাজ জ্ঞানত আমি করিনি।

সুতপা দেবী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, সে আমি জানি বাবা। তোমার মুখে সরল সুন্দর একটা ভাব দেখেছিলাম বলেই তোমাকে আমার বাড়িতে ঠাঁই দিতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করিনি।

বললাম, আপনাদের ঋণ এ জীবনে শোধ হবার নয়।

সুতপা দেবী আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

এক সময় বললেন, বুকুনির বিয়ের প্রায় ঠিক করে ফেলেছেন ওর মেসো। এ সময় একটা মিছে বদনাম রটলে বিয়ে ভেঙে যেতে কতক্ষণ।

বললাম, আমারই ভুল হয়েছে মা। এখন যাতে ওগুলো আর অন্য কোন এগজিবিশানে না যায় তার ব্যবস্থা করব।

সুতপা দেবী বললেন, বড় স্নেহ পড়ে গেছে বাবা তোমার ওপর, আজ এতগুলো কথা বলতে তাই কষ্ট পাচ্ছি। কিছু যেন মনে কোরো না।

বললাম, আপনাদের আমি লজ্জায় ফেললাম, এ জন্যে নিজেকে বড় ছোট মনে হচ্ছে।

সুতপা দেবী বললেন, না না, ওকথা মনে করছ কেন ? একটা ঘটনা তোমার অজানতে হয়ে গেছে, তুমি সেটা জানতে পেরে সাবধান হলে, ব্যস।

এতে অত সংকোচের কি আছে।

বললাম, আমি এখন ক্লাসে যাই মা।

আমি উঠে দাঁড়াতেই উনি বললেন, হ্যাঁ একটা কথা, বুকুনির বিয়ের খবরটা এখুনি কাউকে দিও না যেন। একেবারে পাকা হয়ে গেলে তখন তো সবাই জানতে পারবে।

মাথা নেড়ে জানালাম যে তাঁর কথা প্রতিপালিত হবে।

উনি এবার বললেন, ছেলেটি ফরেস্টে কাজ করে। এখন রেঞ্জার, একদিন হয়তো কনজারভেটারও হতে পারবে।

বললাম, খুব সুখবর, সেঁজুতির কাছ থেকে খাবার আদায় করতে হবে।

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন সুতপা দেবী, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তোমরা ভাইবোনের মত, এ বিয়েতে আনন্দ আমোদ তো তোমরা করবেই।

আমি সেদিন মুখে হাসি টেনে বেরিয়ে এলাম সুতপা দেবীর ঘর থেকে। নিজের ঘরে ফিরে এসে চুপচাপ বসে রইলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাল। আলো জ্বালতে ইচ্ছে হল না। জানালা দিয়ে অন্ধকার ময়দান আর আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এক সময় বার বার কেন জানি না মনে হতে লাগল সেঁজুতি সেই প্রথম রাতের মত তার অগাধ কৌতূহল নিয়ে অপরিচিতকে দেখবার জন্যে ঘরে এসে ঢুকবে, আর টুক করে সুইচ টিপে আলোয় আলোয় ভরিয়ে দেবে অন্ধকার ঘর।

আমার আশা পূর্ণ করবার জন্যে আমার আঁধার ঘরে দীপ জ্বালতে কেউ এল না। এমনকি রাতে যখন খাবার ডাক পড়ল আর আমি ওকে দেখবার আকুল ইচ্ছা নিয়ে ওপরে গেলাম, তখনও ওকে প্রতিদিনের মত খাবার টেবিলে দেখতে পেলাম না।

খাবার পরে নেমে আসছি, সিঁড়িতে দেখা হল রামপ্রসাদদার সঙ্গে। তার মুখেই শুনলাম, ক'দিনের জন্যে ওকে মাসীর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে পাকা দেখার কাজ হয়ে গেলে ফিরে আসবে এখানে।

সে রাতে কেন জানি না আমি ঘুমোতে পারিনি। চোখ দুটো বন্ধ করে শুধু ছবি দেখেছিলাম, এ বাড়িতে আসার প্রথম দিনটি থেকে সেঁজুতির আজকের অনুপস্থিতি পর্যন্ত। ছবিগুলো এলোমেলো আসছিল। আকাশের পটে ভেঙে-চুরে যাওয়া মেঘ-মিছিলের মত।

ভোরের পাখি দক্ষিণের আমগাছের ফাঁকে ডেকে উঠতেই আমি উঠে পড়লাম! ওদিকে তাকিয়ে পাখিটাকে খুঁজতে গিয়ে দেখলাম, ডাল-পাতার ফাঁকে একটি নীড় রচনা করা হয়েছে। সেই নীড়ে বসে একটা পাখি ভোরের বাতাসে করুণ সুর ছড়াচ্ছে।

মনে কেন জানি না এই ভাবনা এল, সেঁজুতি বিবাহিত জীবনে স্বামীকে তার ভালবাসায় ভরিয়ে দিতে পারবে তো।

পরক্ষণেই মনে মনে একটা প্রার্থনা উচ্চারিত হল, ও যেন সুখী হয়।

আমি ওর ভালবাসার অংশীদার হতে চাই না। সবটুকু ভালবাসা দিয়ে ও তার নতুন জীবন শুরু করুক। ওর মনে যদি কিছু স্থান থেকে থাকে আর কারো জন্যে, সে নিভৃত স্থানটুকু ওর স্মৃতি থেকে সরে যাক।

আমার ভোরের এই প্রার্থনা দিয়ে রাতের অশান্ত আহত মনটাকে শান্ত সুস্থ করে তুললাম।

জলখাবার খেতে গিয়ে শুনলাম, প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী আর সুতপাদেবী মধ্যাহ্ন-আহার এখানে করবেন না।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় সুতপাদেবী আমার ঘরে এসে বললেন, অনির্বাণ, আজ তুমি একা খেয়ে নিও বাবা, সন্ধ্যার আগে ফিরতে পারব না।

ওঁরা চলে গেলেন। আমি বুঝতে পারলাম সেঁজুতির বিয়ের আগের কোন একটি অনুষ্ঠান হতে চলেছে।

মনে মনে দুঃখ পেলাম। আমার সাগরিকা সিরিজের ছবিগুলো নিয়ে কানা-ঘুষো না হলে সেঁজুতির বিয়ের অনুষ্ঠানগুলো হয়তো এখানেই হত।

কিন্তু কি আশ্চর্য মানুষ এঁরা। যে-কোন মুহূর্তে আমাকে সরিয়ে দিতে পারতেন তাঁদের কোয়ার্টার থেকে। অকৃতজ্ঞ বলে মুখোমুখি ধিক্কারও দিতে পারতেন, কিন্তু তার কিছুই করলেন না। বরং সুতপাদেবী অত্যন্ত স্নেহের সুরে কথা বললেন।

পরিপূর্ণ একটা কৃতজ্ঞতাবোধ আমার মনকে মুহূর্তে ভরে তুলল।

ওরা চলে গেলে রামপ্রসাদদা এসে ঢুকল আমার ঘরে।

বলল, চৌধ্রী ভেইয়া বুক্‌নি দিদিমনি বড় কাঁদতেছিল।

বললাম, তুমি জানলে কি করে রামপ্রসাদদা ?

ও বলল, দিদিমনিকে আমি তো মাসীর বাড়িতে রেখে আইলাম।

বললাম, তোমার দিদিমনি কি তার পাকা দেখার কথা আগে জানত ?

নেহী নেহী, কিছু জানত নাই। মাসীর বাড়িতে যাবার আগে মাইজীর কাছ থেকে শুনল।

বললাম, তোমাকে কিছু বলেছিল ?

কি আর বলব চৌধ্রী ভেইয়া, শুধু বলল, আমি মাসীর বাড়ি থেকে পালায়ে আসব।

রামপ্রসাদদা তাড়াতাড়ি চলে গেল। স্কুলে ঘণ্টা দিতে হবে।

যাবার সময় শুধু বলে গেল, বুক্‌নি দিদিমনি দুঃখ পেলে হামার বুকখানা ফেটে যায় ভেইয়া।

ও চলে গেলে আবার ভাবতে বসলাম, সেঁজুতি তাহলে ব্যাপারটা জানত না। এখন আমার দিক থেকে করণীয় কি আছে ? ভাবলাম, কিন্তু কোন একটা কুলকিনারা পেলাম না। এলোমেলো ভাবনাগুলো কেবল বেড়েই চলল।

সন্ধ্যার পরে ওঁরা ফিরে এলেন। দেখলাম, সেঁজুতিও এসেছে।

সে রাতে একসঙ্গে সবাই খেতে বসলাম। সেঁজুতি ছাড়িয়ে ছিটিয়ে

একটুখানি খেয়ে উঠে পড়তেই আমি হঠাৎ বললাম, কি হল তোমার, খিদে নেই বুঝি ?

ও একটুখানি ম্লান হেসে চলে গেল। সুতপাদেবী বললেন, আজ পাকা দেখা হয়ে গেল বাবা। ওঁদের খুব পছন্দ হয়েছে আমার বুকুনিকে।

হেসে বললাম, তাই বোধহয় ও আনন্দে আর খেতে পারল না।

ওঁরাও আমার কথা শুনে হাসতে লাগলেন।

সেঁজুতি তখনও বেসিন ছেড়ে যায় নি। নিশ্চয়ই আমার কথাগুলো শুনছিল। ভারী ইচ্ছে করছিল ওর মনের অবস্থাটা জানতে।

সেঁজুতির বিয়ের আগের দিন থেকে আমি সামনের তোরণ আর বিয়ের মণ্ডপ সাজাচ্ছিলাম। প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী এটুকু দায়িত্ব আমাকেই দিয়েছিলেন।

ও এক সময় আমার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, চমৎকার ভাগ্যের খেলা। যার আজকে কোন কাজ করারই কথা নয়, সে কোমর বেঁধে কাজে লেগে গেছে। দাও, ভাল করেই সাজিয়ে দাও। বনবাসে দেবার আগে উৎসবের আয়োজনটা সম্পূর্ণ হোক তোমার হাতে।

বললাম, এমন করে কথা বললে আমার পক্ষে মণ্ডপ সাজানো যে অসম্ভব হয়ে উঠবে সেঁজুতি।

ও অমনি বলল, আগুন লাগিয়ে দেবো তোমার মণ্ডপে। অরণ্যকাণ্ডের আগে লংকাকাণ্ডটা হয়ে যাক।

হেসে বললাম, মনে হচ্ছে পছন্দ হয়েছে আমার তোরণের কাজটা।

ও বলল, তা হয়েছে। আমাকে যে ভালবাসে সেকি কোনদিন হেলাফেলা করে কাজ করতে পারে ?

আমি বললাম, তুমি খুব সুখী হবে সেঁজুতি।

ঝাঁঝিয়ে উঠে ও বলল, মা-বাবাদের মত ঐসব কথা তোমার মুখে শুনলে আমি একেবারে সইতে পারি না।

তুমি অসুখী হও, এ কথাই কি আমার মুখ থেকে শুনতে চাও ?

কোন কথাই আমি শুনতে চাই না তোমার কাছ থেকে। দোহাই তোমার, আমাকে চুপচাপ চলে যেতে দাও।

ও আর কোন কথা না বলে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ ফিরে বলল, দেখ, বিয়েতে সাতপাক ঘোরাবার সময় দয়া করে তুমি যেন পিঁড়িটা ধোর না।

হেসে বললাম, তোমাকে সবার সামনে তুলে ধরার ঐ তো আমার একটি মাত্র সুযোগ। তাও না দিলে শুধু দর্শকের আসন থেকেই তাকিয়ে থাকতে হবে।

ও বলল, এসো, মালাবদলের সময় তোমার গলাতেই পরিয়ে দেব মালা, তারপর যা হয় হোক।

বিয়ের লগ্নে সত্যিই পিঁড়ি ধরার জন্যে ডাক পড়েছিল আমার। হাতে

চোট লেগেছে বলে এড়িয়ে গেলাম আমি। হয়তো কিছুই হত না, তবু মনে হল, বিশ্বাস নেই ওকে। যদি সংযুক্তি হঠাৎ কিশোরী বুকুনি হয়ে যায় তাহলে নির্ঘাৎ মালাটা আমার গলাতেই পরিয়ে দেবে।

বিয়ের পর ও চলে গেল ফরেস্টে। যাবার আগে ওর আঁকা ছবিগুলো নিয়ে যাবার অছিলায় ঢুকল এসে আমার ঘরে।

দু'একটা ছবি হাতে তুলে নিয়ে বলল, শুধু বনেই আমি যাচ্ছি না অনির্বাণদা, একটা বাঘের গুহায় সবাই মিলে আমাকে ফেলে দিলে।

অত্যন্ত আহত হয়ে বললাম, এ কথা কেন বলছ সংযুক্তি ?

ও কান্নাটাকে শক্ত তুষার করে বুকে চেপে রেখে বলল, জানো অনির্বাণদা, বাসরঘরে গভীর রাতে ওর বন্ধু এসে ওকে ড্রিংক করিয়ে গেছে। আমাকে খাওয়ানোর জন্যে দুজনের সে কি ধস্তাধস্তি ! সমস্ত শরীর আমার সারারাত বিষিয়ে উঠেছে।

মাথা নীচু করে বসে রইলাম।

ও বলল, জীবনে একথা যেন তৃতীয়জন না জানতে পারে অনির্বাণদা। ভাগ্য নিয়ে এবার আমার সত্যিকারের জুয়াখেলা শুরু হল।

ও চলে গেল। আমার বুকখানাকে কে যেন টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিয়ে গেল।

দু'বছর পরের কথা। আর্টস্কুলের পড়া শেষ হয়েছে, কিন্তু কাজ জোটাতে পারিনি কিছু। এদিকে প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী সদ্য অবসর নিয়েছেন। তাঁরা সম্প্রতি চলে গেছেন হুগলী জেলায় নিজের বাড়িতে। অবসর দিনগুলি কাটাবেন সেখানে।

ওঁদের চলে যাবার পর আমি আবার পথে নামলাম। ফাইন আর্টসের ছেলের চাকরী নেই। ছবি বেচে আমাদের দেশে আর যা হোক পেট চালানো যায় না।

কিছুদিন বন্ধুবান্ধবের এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে কাটালাম। দু'একটা ছবির টিউশনি করলাম। কিন্তু পেট ভরে না, মন তো নয়ই।

ঠিক এমন দিনে রামপ্রসাদদার সঙ্গে দেখা।

আমাকে স্কুলের গেটের সামনে দেখেই বলে উঠল, আরে চৌধুরী ভেইয়া, তোমাকে কত রোজ ঢুঁড়ছি। বুকুনি দিদিমণি তুমার লিয়ে একটা লেফাফা ভেজিয়েছে।

সংযুক্তি আমাকে চিঠি দিয়েছে রামপ্রসাদদার ঠিকানায়। আমি যেন একটা আনন্দের রঙীন পাখি হাতের মুঠোয় ধরে ফেললাম।

রামপ্রসাদদার ঘরে বসে বসেই চিঠিখানা পড়তে লাগলাম।

অনির্বাণদা, একবার এসো আমার কাছে, কতদিন তোমাকে দেখিনি। যদি আমাকে দেখার ইচ্ছে তোমার এতদিনে মিটে গিয়ে থাকে তাহলেও অন্তত

এসো একবার এখানে। এই গভীর বনে আশ্চর্য এক শিল্পী তাঁর শিল্পের সম্ভার সাজিয়ে রেখেছেন। শুধু পৃথিবীর কোন শিল্পীর কপি করে নেবার অপেক্ষায়।

আমি কেমন আছি জানতে চেও না। ওই অরণ্য আর পাহাড়ের ভেতর তোমার সেঁজুতি চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে।

বাবা-মায়ের সঙ্গে যতটুকু যোগাযোগ না রাখলে নয় ততটুকুই আছে। আমি বুঝতে পারি তাঁরা একটিমাত্র মেয়ের পরিণতি দেখে অনুতাপ করছেন, কিন্তু আর কিই বা তাঁরা করতে পারেন।

রামপ্রসাদদাকে কতদিন দেখিনি। তোমার কাছে সে কি আমার কথা বলে?

কত দুপুর কত বিকেল কাঁধে ঝোলা নিয়ে স্কেচ করে ঘুরে বেড়িয়েছি আমরা। কত কথা দুজন দুজনকে বলেছি, সে কি হারিয়ে গেছে হাওয়ায়? সত্যি বল না অনির্বাণদা? আচ্ছা তোমার সাগরিকা সিরিজের ছবিগুলো আর এগজিবিশানে দাও না? এখন তো আর তোমার সাগরিকার দুর্নামের ভাবনা নেই।

এখানে এলে সঙ্গে করে ওগুলো আনবে কি? দেখতে দারুণ ইচ্ছে করে। তাছাড়া জান, এক একদিন বুকটা কেমন করে ওঠে। মনে পড়ে যায় সাগরিকা সিরিজের ছবি আঁকার সময়ে রামপ্রসাদদার সেই ঘরের দরজায় টোকা দেবার কথা। সেদিনের সেই ভয় আজকের স্মৃতিতে কত মধুর।

অনেক কথা লিখে ফেললাম। জানি না তুমি আসবে কিনা। আর এও জানি না, এ চিঠি তুমি পাবে কিনা!

তোমার সাগরিকা।

চিঠির তলায় সিংভূমে ওদের ফরেস্ট বাংলোয় কেমন করে যেতে হবে তার নির্দেশ দেওয়া আছে। কবে কোন গাড়িতে যাচ্ছি তা জানাতে বলেছে।

বেলা তিনটে নাগাদ এক নির্দিষ্ট দিনে গাড়ি পেঁছিল গুয়া স্টেশনে। সেঁজুতির নির্দেশ অনুযায়ী আমি ঐ স্টেশনে নেমে পড়লাম। আমার সঙ্গে কোন বেডিং ছিল না, সাধারণ একটা সুটকেশ হাতে নিয়েই নেমে পড়লাম।

ছোট্ট ছিমছাম স্টেশন। পাহাড় আর শালের বন। একটু দূরে গুয়ার ছোট্ট টাউন দেখা যাচ্ছে। ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টীলের লৌহআকর এখানকার পাহাড় ডিনামাইটের সাহায্যে ফাটিয়ে সংগ্রহ করা হয়। সেগুলির পাথর আর লোহা যন্ত্রের সাহায্যে আলাদা করে চালান দেওয়া হয় ট্রেন যোগে।

এসব কথা আমি আসার সময়ে জেনে এসেছিলাম। এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে মোটামুটি দেখে নিলাম জায়গাটা।

চেকারের হাতে টিকিট দিয়ে বেরিয়ে আসামাত্র ঝপ করে পাশ থেকে আমার

হাতটা কে ধরে ফেলল।

তাকিয়ে দেখি সেঁজুতি। চেনাই যায় না। অনেক ভারী, কিন্তু অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। ও আনন্দে কথা বলতে পারছে না। আমার অবস্থাও তাই। ও তাকিযে আছে আমার দিকে। চাঁদামাছের মত চক চক করছে দুটো চোখ।

কতক্ষণ পরে ও বলল, তুমি সত্যিই এলে অনির্বাণদা!

বললাম, তুমি ডেকেছ, না এসে পারলাম কই বল।

হঠাৎ আর এক কান্ড। এক ভদ্রলোক আমার হাত থেকে সুটকেশটা টেনে নেবার চেষ্টা করতেই আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে একটু অবাক হলাম। পরমুহূর্তেই মনে হল ইনি নিশ্চয়ই সেঁজুতির স্বামী। বিয়ের রাতে আমি ভদ্রলোককে ভাল করে দেখিনি। সুটকেশটা পায়ের কাছে রেখে হাত তুলে নমস্কার করে বললাম, চিনতে পারিনি। সেই একটিবার মাত্র আপনাব সঙ্গে দেখা হযেছিল।

ভদ্রলোক আমায় প্রতি-নমস্কার না করে হ্যান্ডসেকেব জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। হাতে জোর একটা ঝাঁকুনি দিযে আমাব সুটকেশটা তুলে নিয়ে এগিয়ে চললেন। আমি বাধা দিতে গেলাম, কিন্তু ততক্ষণে উনি জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে গেছেন।

সেঁজুতি আমার হাত ধরে পাশাপাশি চলতে চলতে বলল, তোমাকে নিয়ে আর পারা যাবে না অনির্বাণদা। উনি সুজন সিং। মিঃ ভট্চায কুপে গেছেন। উনি আমাদের পারিবারিক বন্ধু। হাসতে হাসতে বলল, বন্য পরিবাবের বুনো বাইসন।

বললাম, ভদ্রলোকেব রঙটা তো বাইসনের মত বলে মনে হল না।

ও বলল, রঙে নয় মেজাজে। তবে অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। দিনের পর দিন ওর মেজাজ আর চরিত্রের যত পরিচয় পাচ্ছি ততই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।

আমি একটু জোরে কথা বলতে যেতেই ও মুখে আঙুল রেখে আমাকে বারণ করল।

আস্তে বলল, ও বাংলা জানে। বলতেও পারে অনর্গল। সামান্য একটু টান ছাড়া ত্রুটি কিছু নেই। আর দু' দুটো বছর ধরে আমিই ওকে শিখিয়েছি।

ব্যস, ঐ পর্যন্ত কথা। আমরা একটা জীপের কাছে এসে পড়লাম।

সুজন সিং জীপে বসে হাত নাড়ছে।

আমি আর সেঁজুতি পেছনের সীটে বসামাত্র গর্জন করে লাফিয়ে উঠল জীপখানা। সুজন সিং একটা ন্যাড়া পাহাড়ের দিকে জীপটা চালিয়ে দিলে।

দু'চার মিনিটের ভেতর জীপ পাহাড়টাকে বেষ্টন করে বনের সীমানায় ঢুকে পড়ল।

আমি খোলা জীপে বসে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। হাতখানা

কিন্তু বন্দী হয়ে রইল সেঁজুতির হাতের মুঠোয়।

বড় বড় কয়েকটা গাছের জটলা পেরিয়ে আসার সময় আমি গাছের ডালে পাখির ডাক শুনতে পেলাম। ধীরে ধীরে বন ঘন হয়ে উঠল। সূর্যের হলুদ আলো পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে বড় গাছগাছালির মগডালগুলোকে ছুঁয়েছিল।

শীতের বন-পাহাড়ে শেষসূর্যের আলো কেমন নিস্তেজ আর মায়াময়।

আমাদের জীপখানা একটা ছোট্ট ঝাঁকুনি দিয়ে বিপুল গর্জন করতে করতে পাহাড় ঘুরে ঘুরে উঠতে লাগল। গাড়ি যত উপরে উঠতে লাগল নীচে ততখানি গিরিখাদ সৃষ্টি হল। বড় বড় গাছগুলো এখন নীচে নেমে যাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে নতুন গাছের সারি। শেষবেলার আলোয় তেজ কমে এলেও ওপরে উঠে আসার জন্যে চারদিক বেশ দৃশ্যমান হয়ে উঠছিল।

আমি হঠাৎ একটা নদী দেখতে পেলাম। উপত্যকার উপর দিয়ে চলেছিল। আলো পড়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল ওর বহমান জলধারা।

গাড়ি ঘুরতে ঘুরতে একসময় নেমে এল ঐ উপত্যকায়। উপল-ছড়ানো নদী পার হয়ে আবার ওপারের বন-পাহাড়ের ভেতর ঢুকে পড়ল। এখন বন অনেক নিবিড়। সূর্যের আলো একটুও দেখা যাচ্ছিল না। তবে গোধূলির আভার মত একটা আলো তখনও পথের ওপর ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই আলোয় পথ দেখে গাড়ি ওঠা-নামা করছিল ওপরে আর নীচে।

আমি সেঁজুতির হাতটা চেপে ধরে নিজের আনন্দ আর তৃপ্তির গভীর অনুভূতিটুকু জানাচ্ছিলাম। এতক্ষণ আমাদের ভেতর কোন কথাই প্রায় হয়নি।

এবার বন আরও গভীর হল। হঠাৎ করে যেন চোখের সামনে থেকে ম্লান আলোটুকু কেউ নিঃশেষে মুছে নিল। সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল আলোয় ঝলসে ওঠা তলোয়ারের মত জীপের হেডলাইট বনের অন্ধকারের বুক চিরে জ্বলে উঠল।

এতক্ষণে কথা বলল সেঁজুতি, তুমি তেমনি আছ অনির্বাণদা। কোন কিছুতে একবার মগ্ন হলে আর সব কিছু তোমার চারদিক থেকে হারিয়ে যায়।

হেসে বললাম, দু-এক ঘণ্টার ভেতরে এই বন-পাহাড় আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

সেঁজুতিও হাসল। বলল, যাদু আছে এ পাহাড়ে।

হঠাৎ সুজন সিং মুখখানা পাশে ফিরিয়ে বলল, আর বললে না বহুরাণী, মধু আছে সারান্দা বনে?

সেঁজুতি আমার হাতে জোরে একটা চাপ দিয়ে বলল, দারুণ মজার মজার মন্তব্য করতে পারে আমাদের এই বন্ধুটি!

বললাম, সিং সাহেব, আপনার মুখে এমন নিখুঁত বাংলা শুনে আমি সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

সুজন সিং বলল, সব কিছু বহুরাণীর কেরামতি। ও-ই তো আমাকে

বাংলা বোলতে শিখায়েছে।

বললাম, এতে কিন্তু আপনার গুরুর কৃতিত্ব কম। যিনি শিখেছেন তাঁর ধৈর্য আর নিষ্ঠার বেশী প্রশংসা করতে হয়।

হেসে বলল সুজন সিং, গুরুকে সব সময়ে বড় মান দিতে হয় চৌধুরীবাবু।

বললাম, আপনার মত এমন বিনয়ী ছাত্র পেলে যে-কোন গুরু পরম আগ্রহে শেখাতে লেগে যাবে।

সেঁজুতি বলল, বিনয়ী বটে। মেজাজে মেদিনী কেঁপে উঠবে। একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করে বসল, 'বর্তন' কথাটা বাংলাতে কি হবে বহুরাণী?

আমি বললাম, 'বাসন'।

ও অমনি ক্ষেপে উঠে বলল, আমাকে ভুল শিখলাচ্ছ। আমি তোমার ভাষা জানি না বলে আমাকে তুমি বুড়বক বানাচ্ছ। 'বর্তন' আর 'বাইসন' এক চিজ হল?

আমি তো তাজ্জব। যত বলি, বাসন, বাসন, ও তত ক্ষেপে উঠে বলে, বাইসন, বাইসন। তুমি আমাকে লিয়ে খেলা করছ বহুরাণী। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাকে আমি বাইসন দেখাব। 'বর্তন' আর বাইসন তখন মিলায়ে দেখবে।

ঐ ভুলটা ওর ভাঙাতে আমার বেশ সময় লেগেছিল।

সুজন সিং বলল, সে আমার বহুৎ গোস্তাকি হয়েছিল বহুরাণী।

বললাম, শিখতে গেলে এমন অনেক দুর্ঘটনাই ঘটে থাকে। জবরদস্ত ছাত্র পি ইউ টি-র 'পুট' উচ্চারণ শুনলে বি ইউ টি-র উচ্চারণ করতে গিয়ে সহজে 'বাট' বলবে না। বার বার 'বুট' ই বলবে। তাকে যদি জোর করে বলা হয়, বি ইউ টি 'বাট'ই হয়, তখন সে পি ইউ টি-কে অবশ্যই 'পাট' বলতে চাইবে।

হেসে উঠল সুজন সিং দারুণ জোরে। আর অন্ধকার গাছ থেকে কি একটা পাখি ভয় পেয়ে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে গেল।

বললাম, একটা পাখিকে আমরা বাসা-ছাড়া করলাম এ রাতে।

সুজন সিং বলল, ওটা সিল্লী পাখি আছে, রাতে-ভিতে ঘুরপাক খাবার অভ্যেস আছে ওর। জোছনা-রাতে ওদের ডাক শুনলে কেমন উদাস উদাস লাগে।

সেঁজুতি বলল, তোমারও রাতে ঘুরপাক খাবার অভ্যেস আছে।

সুজন সিং অমনি বলল, রাতে আমার হাঁক শুনলে দিলটা কি কারো উদাস হয়ে যায় বহুরাণী?

সেঁজুতি বলল, তোমার হাঁক শুনলে উদাস হয় না কারো দিল, বরং ভয়ে গুরু্ গুরু্ করে ওঠে।

আবার সেই বন কাঁপিয়ে ঠা-ঠা হাসি সুজন সিংয়ের।

এবারও একঝাঁক পাখি বাসা-ছাড়া হল। পাখার ঝাপটে মনে হল, এরা

সংখ্যায় বেশ ভারী।

বললাম, এ কোন পাখি সিং সাহেব ?

সঙ্গে সঙ্গে সুজন সিং বলল, সারোময়নার ঝাঁক আছে।

আমি বললাম, পাখি না দেখে চিনলেন কি করে ?

সেঁজুতি বলল, দারুণ অভিজ্ঞতা ওর। পাখা টানার আওয়াজে ও পাখির গাঁইগোত্র সব নিখুঁত বলে দিতে পারে। আমরা রাতে টর্চ ফেলে ওর কথার সত্যতা অনেক সময় যাচাই করে নিয়েছি। তাছাড়া একসঙ্গে হয়তো বসে আছি, মাথার ওপর দিয়ে সাঁ-সাঁ আওয়াজ তুলে পাখি উড়ে গেল, ও না দেখে যা বলল, আমরা চোখ মেলে দেখলাম, ঠিক তাই।

সুজন সিং বলল, চিড়িয়া আর জানোয়ারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট দোস্তি আছে। ওদের চলাফেরা, ওড়া নড়া সব আমার জানা হইয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ হয়ে আর একটা মানুষকে ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না চৌধুরীবাবু।

বললাম, যে জীবের বুদ্ধি যত বেশী তার মনটাকে লুকিয়ে রাখার ক্ষমতাও তত বেশী। তাই পশু পাখির চেয়ে মানুষের মনের খবর পাওয়া এত শক্ত।

সুজন সিং বলল, হয়তো আপনার কথাটাই ঠিক আছে।

একটু থেমে হঠাৎ বলে উঠল, জানেন চৌধুরীবাবু, এক এক সময় মনে হয় মানুষের ডেরা ছেড়ে জঙ্গলে জঙ্গলে শেষ জীবনটা কাটায়ে দি।

গাড়ি এসে দাঁড়াল কুম্‌ডিহ বাংলোতে। একটা লোক হ্যাজাক আলো হাতে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। সুজন সিং কিন্তু নামল না।

ভদ্রতা করে বললাম, বসে রইলেন কেন, নেমে আসুন।

সুজন সিং বলল, এখন তো আছেন কিছু দিন, রোজ আমার মুখ দেখতে দেখতে বহুরাণীর মত ব্যাজার হইয়ে যাবেন।

ফোঁস করে উঠল সেঁজুতি, আমি বুঝি তোমাকে দেখলে বিরক্ত হই ?

সুজন সিং হেসে বলল, গুস্তাকি মাফ্ কিজিয়ে।

একটু থেমে বলল, সরি, অপরাধ নিও না !

ও আমাকে উদ্দেশ্য করে ওর ডান হাতখানা কপালের কাছ বরাবর নিয়ে গিয়ে একটু হাসল।

আমি অনুরূপভাবে হাত তুললাম।

ও সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে গাড়ির মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়ে বিদ্যুৎ-গতিতে বেরিয়ে গেল। একটা জানোয়ার যেন প্রাণফাটা আর্তনাদ করতে করতে গভীর বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে মিঃ ভট্‌চায সম্বন্ধে অনুচ্চ গলায় কি যেন জিজ্ঞেস করল সেঁজুতি। সবটুকু বোঝা গেল না। তবে লোকটির স্পষ্ট উত্তর থেকে জানা গেল, রেঞ্জার সাহেব আজ দিনে কাজ শেষ করতে

না পারলে থলকোবাদের বাংলোতে থেকে যাবেন।

বুঝলাম, মিঃ ভট্টাচাযের আজ রাতে এ বাংলোয় ফেরা অনিশ্চিত।

শীত এখানে প্রবল। একে পাহাড় তার ওপর অরণ্য বহু জায়গায় বন্ধ করে রাখে সূর্যালোক প্রবেশের পথ।

সেঁজুতি বলল, এসো, আমার নরকবাসটা দেখে দু'চোখ সার্থক কর।

বললাম, এমন করে অতিথি আপ্যায়ন করলে কিন্তু এখান থেকেই ফিরে যেতে হবে।

ও হেসে বলল, এটা মহাভারতের চক্রব্যুহ। এখানে অভিমন্যুর প্রবেশের পথ আছে, কিন্তু বেরিয়ে যাবার পথ নেই।

বললাম, তোমার হাতে যখন পড়েছি তখন যেখানে নিয়ে যাবে আপাততঃ সেখানেই যেতে হবে।

আলো দেখিয়ে লোকটা পায়ে পায়ে এগোতে লাগল, আর সেঁজুতির সঙ্গে আমি একটা মোরাম ফেলা প্রান্তর পেরিয়ে এগিয়ে চললাম। বাঁদিকে লম্বা ইউক্যালিপ্টাস গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাজাকের আলোয় দীর্ঘ সাদা সাদা কাণ্ডগুলো অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

এবার বাংলো বাড়িটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। খড়ে ছাওয়া কাঠের সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো একখানা চমৎকার বাড়ি। বাংলোর সামনে এসে দেখলাম, চারদিক ঘিরে মরশুমী ফুলের বেড। আলোয় হরেক রকম রঙ ঝলমল করে উঠল।

আমরা বারান্দা পেরিয়ে একখানা বড় হল-ঘরে ঢুকে পড়লাম।

চমৎকার সাজানো। ছবি-ফুল-পাতায় ঘরটি দারুণ রকম আকর্ষণীয়। দেখলাম, ঘরের সব জায়গাতেই সেঁজুতির নিপুণ হাতের কারিকুরি।

ও আমাকে বসতে বলে ভেতরে চলে গেল।

আমি সারা ঘর খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম।

কাঠ কেটে বিরাট হাতীর দাঁতের মত একটি ধবধবে সাদা বসার আসন করা হয়েছে। তার গোড়ার কিছুটা অংশে ডানলোপিলোর ওপর টুকটুকে লাল কভার দেওয়া। সাদার ওপর সেই লালের কাজটুকু অত্যন্ত উজ্জ্বল আর সুন্দর মানিয়েছে।

এদিকে দেওয়ালের গায়ে একটি শুকনো বিশেষ ভঙ্গীর ডাল আটকানো। তার সরু সরু শাখাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে পিংক রঙের আঁকা ফুলগুলো বেশ জীবন্ত মনে হচ্ছে।

গাছের লম্বা কালো একটি কাণ্ড ঘরের কোণে টিপয়ের মত দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপর জাপানী পোর্সিলেনের একটি সাদা পাত্র বসানো। ঐ পাত্রটিতে মরশুমী হলিহক, সুইট সুলতান আর পিটুনিয়া বিশেষ ভঙ্গীতে সাজানো। মাঝে মাঝে বুনো কতকগুলো সবুজ পাতা গুঁজে দেওয়া হয়েছে। একটি চমৎকার ইকাবানার পরিকল্পনা।

ও ট্রেতে কফি নিয়ে এল।

বলল, রাত হয়েছে, খাবারও রেডী। এখন শীতের বন পেরিয়ে এসেছ, একটু গরম কফি খেয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নাও।

কফির কাপটা ট্রে থেকে তুলে নিয়ে বললাম, এতক্ষণ তোমার নরক নিবাসটা দু'চোখ ভরে দেখে নিলাম।

ও কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, নরকের বাইরের সাজসজ্জাটা স্বর্গের চেয়ে অনেক বেশী চকচকে। তাই মানুষের আকর্ষণ এদিকেই বেশী।

হঠাৎ বললাম, তুমি কি এ পরিবেশের সঙ্গে কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছ না?

ও মাথা নীচু করে শুধু কফিতে কয়েকবার চুমুক দিল। এক সময় মুখ তুলে বলল, উপায় কি বল। মানুষ মনে মনে যা ভাবে, সমাজ সংসার পরিবেশ পরিস্থিতি তাকে বানচাল করে দেয়। হাজারে একটি মানুষ হয়তো ভাগ্যের প্রসাদ পেয়ে যায়। আমি সে ভাগ্যবানের দলে নই অনির্বাণদা। তোমরা সবাই আমাকে ভুলে গেলে, তাই নিজের সান্ত্বনা নিজের কাছেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

আমি সেই চঞ্চল কিশোরী বুকুনি আর মখমলসবুজ পাতার মত লাবণ্যময়ী তরুণী সেঁজুতির পরিণতি দেখে মনে মনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

একসময় বললাম, সেঁজুতি, তোমাকে কোনদিন তোমার অনির্বাণদা ভোলেনি, হয়তো তার পক্ষে কোনদিন ভোলা সম্ভবও হবে না। তুমি জানবে, যেখানেই আমি থাকি না কেন, আমার মনের মধ্যে আর একটা মনকেও বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি একথা জানি, এটা তোমার কাছে হয়তো কোন আশ্বাস নয়, তবু যদি মনে কর যে তোমার দুঃখের একজন সঙ্গী আছে তাহলে হয়তো কিছুটা সান্ত্বনা পেলেও পেতে পারবে।

সেঁজুতি অমনি বলল, তাই তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি অনির্বাণদা।

বললাম, তোমার এ অবস্থার কথা বাবা-মাকে জানিয়েছ?

স্পষ্ট করে না জানলেও ওঁদের বুঝতে কোন অসুবিধে হয়নি। ওঁরা কিছুদিন মেয়ের কাছে কাটাতে এসেছিলেন। বুঝতে পেরেছেন সবই। মনের আগুনে জ্বলছেন দুজনেই।

বললাম, যে ক'টা দিন এখানে থাকব, তোমার স্বামীর প্রতিবাদ প্রবল না হলে তোমাকে আমি আবার ছবির জগতে নিয়ে যাব।

ও বলল, একটি বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার অনির্বাণদা। আমার স্বামী আর যাই করুক, কোনদিন বাধা দেয় না আমার কাজে। আর সত্যি বলতে কি স্ত্রী হয়ে ঐখানেই আমার প্রতিবাদ। উদাসীন স্বামীকে কোন স্ত্রী পছন্দ করে কিনা আমি জানি না, অন্ততঃ আমি করি না। ও যদি আমাকে সন্দেহ করত পদে পদে তাহলেও আমি গভীর তৃপ্তি পেতাম।

বললাম, তোমাকে হয়তো তিনি বিশ্বাস করেন সেঁজুতি, তাই তোমার সকল কাজে স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন।

সেঁজুতি বলল, তুমি জান না অনির্বাণদা ওর সম্পূর্ণ চরিত্রের খবর তাই

ও ধরনের মন্তব্য করছ। ওর এই নিস্পৃহ ঔদাসিন্যের পেছনে দুটো জিনিস কাজ করছে। এক, সুরা আর অন্য নারী।

বললাম, কি বলছ তুমি সেঁজুতি। ড্রিংক অনেকেই করে, কিন্তু তোমার মত স্ত্রীকে ফেলে অন্য মেয়েতে কেউ আসক্ত হতে পারে এ যে আমার ধারণার বাইরে।

এবার ম্লান হাসি ফুটল সেঁজুতির মুখে।

বলল, সুজন সিংকে দেখলে না? ওর ভালবাসার পাত্রীর ওপর তোমাদের রেঞ্জার সাহেবের খুব লোভ।

সুজন সিং জানে সে কথা?

হয়তো জানে, বলল সেঁজুতি, কিন্তু যেহেতু ও বনের ইজারাদার সেজন্যে রেঞ্জারকে ঘাঁটাতে চায় না।

এ ঘটনা কতদিনের পুরনো?

ও বলল, আমার বিয়ের আগে থেকেই চলছে।

তোমাকে এ খবর জানাল কে?

সেঁজুতি বলল, মদ।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, মদ! তার মানে?

ও বলল, মাতালদের চরিত্রই তাই। মদ খেলে দিলদরিয়া। মনের ভেতর জমে থাকা গোপন কথা তখন একটি একটি করে বেরিয়ে আসে।

বললাম, আশ্চর্য!

সেঁজুতি বলল, আশ্চর্যের কিছু নেই, এটাই স্বাভাবিক। মদ খেয়ে ও একদিন একা একা টেবিলে বসে সুজন সিংয়ের সঙ্গে লড়াই লাগিয়ে দিলে। ওর লড়াইয়ের কারণটা আমি জেনে নিলাম।

বললাম, আজকাল সুজন সিংয়ের সঙ্গে ব্যবহারটা কেমন করছে?

মদের নেশা কেটে গেলে ও তখন অন্য মানুষ। সুজন সিং তখন ওর সবচেয়ে বড় দোস্ত। একসঙ্গে বসে টাকার পাওনাগন্ডার হিসাব চলবে, একই জীপে কুপে কুপে ঘুরে বেড়াবে। লাঞ্চ, ডিনার একসঙ্গে খাবে। আবার একই মেয়ের জন্যে দুজনে লড়াইয়ের প্যাঁচ কষবে।

তার পর মদ পেটে পড়লেই মেজাজ যাবে বিগড়ে। গ্লাস ছুঁড়ে মারবে সুজন সিংকে লক্ষ্য করে। লাভের মধ্যে ভাঙবে কাচের শার্সি, না হয় দেয়াল স্নান করবে দামী মদে।

বুঝিয়ে কিছু বলার সুযোগ হয়নি তোমার কোনদিন?

সেঁজুতি হেসে বলল, মাতালরা তাদের বউদের গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে আর কোনদিন গিলবে না ঐ বিষগুলো। কিন্তু ঠিক সময়ে বউয়ের কাছে এসে মিনতি করে বলবে, কেবল আজকের দিনটার মত বোতলটা বের করে দাও, কাল কোন আহম্মক ছুঁয়েছে। তারপর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। দেখে দেখে হাল ছেড়ে দিয়েছি অনির্বাণদা। এখন নিজের হাতে বিষ ঢেলে দিয়ে দূরে বসে দেখি, একটা মানুষ কেমন করে তিলে-তিলে জাহান্নমে যাচ্ছে।

বললাম, তুমি দেখেছ সুজন সিংয়ের প্রেমিকাকে ?

ও বলল, তার চেয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞেস কর, আমি আমার সতীনকে দেখেছি কিনা !

বললাম, ও-কথা আমি কোনদিন মুখ ফুটে বলতে পারব না তোমাকে সেঁজুতি।

ও হেসে বলল, অপ্রিয় সত্যকে প্রকাশ করতে সকলের সাহসে কুলোয় না অনির্বাণদা।

তারপর কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, মেয়েটাকে দেখতে কিন্তু দারুণ। ছোটনাগরার হো-সর্দারের মেয়ে। চুলে করুঞ্জার তেল মেখে, একদিক হেলিয়ে আলগা খোঁপা বেঁধে, তাতে লাল ফুল গুঁজে ও যখন নিটোল সুন্দর দেহখানাকে বনের কোন গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড় করায়, অথবা হাসি ছড়াতে ছড়াতে হাটের পথে হেঁটে চলে যায় তখন, বিশ্বাস কর অনির্বাণদা, আমি ওর দিকে অবাক চোখ মেলে তাকিয়ে থাকি। আমার তখন একটুও ঈর্ষা হয় না ওর ওপর।

তুমি আজও মনে-প্রাণে শিল্পী রয়ে গেছ সেঁজুতি।

সেঁজুতি বলল, ঘড়িতে দশটা বাজে। এখন শীতের দিনে মাঝরাত বলতে পার। খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তাছাড়া রাঁধুনীকেও ছুটি দিতে হবে, এখন চল যাই আহার-পর্বটা চুকিয়ে ফেলি।

বললাম, মিঃ ভট্চায এসে পড়তেও তো পারেন, ওঁর জন্যে আর একটুখানি অপেক্ষা করলে হত না ?

সেঁজুতি দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, থলকোবাদের ডাকবাংলোয় তোমাদের রেঞ্জার সাহেব এতক্ষণে বনমোরগের রোস্ট খেয়ে শরীর গরম করছেন।

কথাগুলো বলেই সেঁজুতি ভেতরে উঠে গেল। আমি ওর তাৎপর্যে ভরা হাসির অর্থভেদের চেষ্টা করতে লাগলাম। বেশীক্ষণ ভাবতে হল না। একটা কালো পাথরে গড়া অপূর্ব মূর্তি আমার চোখের ওপর ফুটে উঠল। ঈষৎ হেলানো খোঁপা করুঞ্জার তেলে মসৃণ। খোঁপার ভেতর একটা কাঠের কাঁকই আধগোঁজা হয়ে রয়েছে। তার পাশ দিয়ে মাথা তুলে জেগে আছে সবুজ পাতা সমেত দুটো লাল ফুল। সেঁজুতির বনমোরগের ছবিটা কি এই রকমের ?

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ডাক দিল সেঁজুতি, উঠে এসো অনির্বাণদা।

খাবার টেবিলে বসে অনেক কিছু খেলাম।

শেষে ছানার পায়েস পরিবেশন করল সেঁজুতি। বলল, মায়ের হাতের তৈরী পায়েস একসঙ্গে বসে কাড়াকাড়ি করে খেয়েছি, আজ তাই তোমাকে খাওয়াতে গিয়ে পায়েসের কথা মনে পড়ল।

পায়েস মুখে দিয়ে বললাম, একেবারে মায়ের হাতে তৈরী পায়েসের স্বাদ কতদিন পরে পেলাম তোমার কাছে। মনে আছে সেঁজুতি মায়ের বাটির

শেষটুকু চেঁছেপুছে কে নেবে তাই নিয়ে দুজনের কত হুড়োহুড়ি ?

হঠাৎ সেঁজুতির চোখে জল এসে গেল। ও উঠে বেরিয়ে গেল ডাইনিং হল থেকে। কিছু পরে আবার ফিরে এসে বসল আমার পাশে। খাবার পাট আমাদের চুকে গিয়েছিল। আমিও মুখ ধুয়ে এসে বসলাম পাশাপাশি।

ও বলল, ড্রইংরুমটা বাইরের দিকে, তাই ঠাণ্ডা এখানকার চেয়ে বেশী। এখন খাবার ঘরে বসে বসেই কথাবার্তা বলা যাক।

অনেকক্ষণ থেকে কল কল একটা আওয়াজ কানে এসে বাজছিল। কথার ভেতর ডুবে ছিলাম তাই শব্দটা তেমন করে বাজেনি কানে।

সেদিকে কান পেতে আছি দেখে সেঁজুতি বলল, তোমার সব কৌতূহল এক দিনেই মিটিয়ে নিতে চাও ?

হেসে বলল, ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আমিও ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলাম।

ও বলল ওটি 'কারো'র ডাক।

বললাম, তোমাদের এই বনাঞ্চলে রাতে-ভিতে কেউ ডাকে নাকি ?

ডাকে বইকি, প্রবাহিনী 'কারো' ডাকে। বড় মিঠে সে ডাক। তার ঠাণ্ডা ছোঁয়ায় সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়। গরমের দিনে আমি প্রায় সারাক্ষণ ওকে ছুঁয়ে বসে থাকি।

বললাম, কারো নদীটা কি বাংলোর খুব কাছে ?

ও বলল, বাংলোর সীমানা ছুঁয়ে, পিটিস ঝোপের ডালে পাতায় নাড়া দিয়ে ও বয়ে চলে যাচ্ছে। বাংলোর নৈঋত কোণে দাঁড়িয়ে আছে যে শিমুলগাছ, ফাল্গুনে অজস্র লাল ফুল ফোটে তাতে। মাঝে মাঝে দশ বিশটা ফুল ও ফেলে দেয় দুষ্টু ঘর-পালানো মেয়েটার আঁচলে।
জান অনির্বাণদা, ওর দুষ্টুমির খেলা দেখতে দেখতে আমার দিন কেটে যায়। ও আমার চোখাচুখির সঙ্গী। যে-কোন ঘরের জানালা খুললেই আমি ওকে দেখতে পাই।

বললাম, দেখাবে না তোমার সখিকে ?

সেঁজুতি বলল, আমাকে কি ওর মত দস্যি পেলে যে ওকে আমার সখি বলছ ?

তুমি ওর চেয়েও দুষ্টু।

ও বলল, কখ্খনো নয়। তুমি বছর খানেক এখানে থেকে যাও, প্রতিটা ঋতুতে ওর কাণ্ডগুলো দেখতে পাবে। এখন ও শান্ত, কিন্তু পাহাড়ে এক পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে যাক, দেখবে দুরন্ত দস্যুতায় ও সবকিছু ভেঙ্গে-চুরে লুটেপুটে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

বললাম, এত লোভ দেখিও না, হয়তো এই বন পাহাড় আর নদীর দেশে সারাজীবন কাটিয়ে দেব।

তাহলে আমি বেঁচে যাই অনির্বাণদা। তুমি আমার কাছে থাকলে এ নরকও স্বর্গ হয়ে উঠবে।

হেসে বললাম, তা সম্ভব হলে আমার আনন্দ তোমার চেয়ে কম হত না সেঁজুতি। কিন্তু ইচ্ছাপূরণ যিনি করেন তিনি আমাদের মনের অনেক ইচ্ছাকেই অপূর্ণ রাখেন, কারণ, ইচ্ছা পূরণ হয়ে গেলে চাইবার আর কিছু থাকবে না বলে।

ভারী ঠাণ্ডা একটা হাওয়া হু হু করে বয়ে এল ঘরের ভেতর। আলোয়ান আর সার্জের পাঞ্জাবী ফুঁড়ে সে হাওয়ার করাত হাড়ে এসে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত কারোর খল খল দুষ্টুমির হাসিটা স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

সেঁজুতি উঠে গিয়ে হঠাৎ খুলে যাওয়া জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে এল।

সোফায় বসতে বসতেই বলল, আজ চাঁদনী রাত হলে এতক্ষণে তোমাকে টেনে নিয়ে যেতাম নদীর ধারে। শীতকে থোড়াই কেয়ার করতাম।

বললাম, মিঃ ভট্চায এ ধরণের নিশিবিহারে নিশ্চয়ই তোমাকে মাঝে মাঝে সঙ্গ দিয়ে থাকেন ?

সেঁজুতি বলল, আমার মুখ দিয়ে আর কত পতি-নিন্দা তুমি শুনতে চাও অনির্বাণদা ?

আমি সত্যি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। আমার অজ্ঞাতসারে ওকে যে আমি আঘাত দিয়ে ফেলেছি তা বুঝতে পারিনি।

বললাম, হালকাভাবে কথা বলেছি সেঁজুতি, তোমার মনে আঘাত দিতে কিন্তু চাইনি।

ও আগের কথার জের টেনে বলল, গোয়ালা যদি নিজের দুধ খেত তাহলে ভুলেও কোনদিন জল মেশাত না। তোমাদের রেঞ্জার সাহেব যদি তার বউয়ের হাত ধরে ঐ নদীর ধারে ভুলেও একদিন গিয়ে বসত তাহলে ভালবাসার সবটুকু মধু এমন উজাড় করে ঢেলে দিতে পারত না ঐ বুনো মেয়েটার ওপর।

কথাগুলো আবার সেঁজুতির ব্যথার জায়গাগুলোকে ছুঁয়ে যাচ্ছে দেখে প্রসঙ্গ পালটে বললাম, ওসব আলোচনা এখন থাক সেঁজুতি, কালকে আমাদের প্রোগ্রামটা কি হবে তাই বল ?

সেঁজুতি বলল, কাল দূরে কোথাও যাব না। এই নদী আর বাংলোর আশেপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াব। আমি বেশ জোরের সঙ্গে বলতে পারি তুমি হাঁপিয়ে উঠবে না। ছবি আঁকার অনেক কিছু হাতের সীমানার ভেতর পেয়ে যাবে।

আমরা এরপর হালকা টুকরো টুকরো কথার পাঁপড়িগুলো ছড়াতে লাগলাম। অনেক স্মৃতির গন্ধ মাখা সেই সব ছেঁড়া কথার টুকরো।

রাত যখন বারোটার ঘণ্টা বাজাল তখন আমার শোবার ঘরখানা দেখিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল সেঁজুতি।

আমি বিছানার আশ্রয়ে নিজেকে সঁপে দেওয়ামাত্র ঘুমের গভীরে ডুবে গেলাম।

ট্রেন-জার্নি তার শোধ তুলল। পরের দিন বেলা আটটার আগে বিছানা ছাড়তে পারলাম না।

বেশ খানিকটা লজ্জিত মুখে ঘর ছেড়ে বেরোলাম। বাইরের রোদ্দুর তখন ঘরের সংলগ্ন বারান্দায় এসে পড়েছে। হাত-মুখ ধুয়ে বেরোতে যাব, সেঁজুতি পাশে এসে দাঁড়াল।

হেসে বলল, এতক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হল কুম্ভকর্ণ মশায়ের? চল, মিঃ ভট্চায বাইরের ঘরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

বললাম, সেকি, উনি এত সকালেই এসে পড়েছেন?

সেঁজুতি বলল, না মশায়, রাত্তির ঠিক তিনটের সময় এসেছে। তুমি তখন ছিলে মগন গহন ঘুমের ঘোরে। অনেক হেডলাইটের আলো, অনেক হাঁকডাকের ভেতরেও তোমার ঘুম ভাঙেনি। তাই বলছিলাম, তুমি একালের কুম্ভকর্ণ।

একটু বিব্রত হয়েই বললাম, আমাকে ডেকেছিলে রাত্রে? সত্যি, আমি একটুও জানতে পারিনি। চল চল, মিঃ ভট্চায কি ভাবছেন।

ও বলল, তোমাকে ডাকব কেন, এমনি হাঁকডাক হচ্ছিল।

এত রাতে মিঃ ভট্চায এলেন কি ব্যাপার?

সেঁজুতি বলল, কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই ঘটেছিল। কারণ অবশ্য অজ্ঞাত!

আমি সেঁজুতিব সঙ্গে সঙ্গে ডাইনিং হলে এসে পেঁছিলাম।

মিঃ ভট্চায উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি হাতে হাত মেলালাম।

আমরা টেবিলে বসলে বেয়ারা চা দিয়ে গেল।

মিঃ ভট্চায যতক্ষণ চায়ের টেবিলে রইলেন ততক্ষণ একটা না একটা নিজের কথার ভেতরেই জড়িয়ে রইলেন।

আমাদের চা-পর্ব শেষ হবার আগেই উনি উঠে দাঁড়ালেন। একবার আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, রাতের বিশ্রামটা এখন করে নেব ভেবেছি। আপনার বান্ধবী রইল, আশা করি কিছু অসুবিধে হবে না।

মিঃ ভট্চায চলে গেলে আমি সেঁজুতিকে বললাম, একটু বাইরে ঘুরে-ফিরে সারান্দার সঙ্গে শুভদৃষ্টিটা সেরে আসি। তুমি ততক্ষণে দরকার মত স্বামী-সেবাটেবা কর। অথবা অতিথি-আপ্যায়নের কিছু আয়োজন।

ও বলল, বাংলোর কম্পাউণ্ড ছেড়ে বেশি দূরে যেও না যেন, কাছাকাছি থেকো, আমি তোমাকে খুঁজে নেব।

আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। ভোরের ঠাণ্ডা কাঁপা কাঁপা আলোয় চারদিকে তাকিয়ে মনে হল, এ জগৎ আমার সম্পূর্ণ অজানা। আমি যেন সমুদ্রে জাহাজ-ডুবির পর একটা অচেনা অরণ্য-অধ্যুষিত দ্বীপে ভেসে এসেছি।

মরশুমী ফুলের বেড সারা বাংলো ঘিরে রয়েছে একটা দামী শাড়ির পাড় আর আঁচলের মত। তাদের রঙের অভ্যর্থনার পর আমি রাতে অস্পষ্ট দেখা ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় এসে দাঁড়ালাম। দীর্ঘ গাছগুলো সাদা

সাদা কাণ্ড আর কিছু এলোমেলো পাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকাল বেলার বড় উপভোগ্য আলোয় চারদিকের গাছপালা স্নান করছিল। পাখিদের বহু বিচিত্র ডাক শুনতে শুনতে বাংলোর উঁচু কাঁটাতারের বেড়ার সীমা পেরিয়ে এলাম।

বাঁ দিকে ফিরতেই নদীটা চোখে পড়ল। নুড়িগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে তীর জুড়ে। দুপারে বন, মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে কান্তিময়ী কারো। শীতে শীর্ণ হয়েছে কায়া, কিন্তু আঁকা বাঁকা মন্থর চলনে ভারী সুন্দর একটা ছন্দ আছে।

আমি কতক্ষণ নদীটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার নীল জলধারা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট-বড় বিচিত্র আকারের নুড়ির রাশি, দুপারে যতদূর দেখা যায় বৃক্ষের ঘনবসতিপূর্ণ সংসার। সব মিলিয়ে কারো সত্যি একটা জাদুব জগৎ তৈরি করে রেখেছে।

আমি ভোরবেলাকার শীতের কামড় উপেক্ষা করে কারোর জলে পা ডোবালাম।

নদী আমাকে উত্তপ্ত অভ্যর্থনা জানাল না ঠিক, কিন্তু তার ছোঁয়ায় আমি যেন একটা তীব্র প্রাণের সাড়া পেলাম।

কারো নদীর নুড়ির ওপর দিয়ে কিছু পথ হেঁটে বেড়ালাম। ওপারের কয়েকটা গাছে শীত তার দোবাত্মের স্বাক্ষর রেখে গেছে। নিষ্পত্র বৃক্ষগুলি ডালপালা ছড়িয়ে যেন অদৃশ্য দেবতার কাছে যৌবন ফিরে পাবার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছে।

আমি গত রাত্রে সেঁজুতির মুখে শোনা সেই শিমুলগাছটার খোঁজ করতে লাগলাম। বাংলোর এক কোণে তাকে পাওয়া গেল। তার ছড়িয়ে পড়া. কয়েকটা শেকড়ে নাড়া দিয়ে চলেছে কারো নদীটা। দুষ্টুমি করে যেন বলছে আমার ফুল কই ফুল, টকটকে রাঙা ফুল!

পেছন থেকে কে যেন এসে আমার গায়ে ছোঁয়া দিয়ে বলে উঠল, এখুনি এত ভালবাসায় পড়ে গেলে আমাদের জন্যে কিছু রইবে তো?

সেঁজুতি কখন নিঃশব্দে এসেছে আমি জানতে পারিনি। ওর দিকে ফিরে হাসতে হাসতে বললাম, যেখানে লোকালয় সেখানে আমার ভালবাসা ফেরি করে বেড়িয়েছি, নেয়নি। তাই এখানে সারান্দা বনে যাচাই করে দেখছি কেউ নেয় কি না।

ও বলল, তেমন করে দিলে নেবার লোকের অভাব কি!

বললাম, এই জীবনটাতে ভেবেছি আর মানুষের ঘরে ভালবাসা নিয়ে যাব না। বনের পশুপাখি, পাহাড়, গাছপালা, ফুল আর নদীর বুকে ভালবাসা ছড়িয়ে দেব।

সেঁজুতির গলা ভারী হয়ে উঠল। ও আমার একখানা হাত খপ্ করে ধরে ফেলে বলল, বল, এমন কথা কেন বললে। আমার কাছে তুমি এমন করে বলতে পারলে কথাটা!

বললাম, কি পাগলামী করছ সেঁজুতি, হাত ছেড়ে দাও, বাংলোতে মিঃ ভট্চায রয়েছেন।

ও বলল, আগে উত্তর দাও তারপর ছাড়ব।

বললাম, আমার ঘাট হয়েছে সেঁজুতি, আর কোনদিন ভালবাসার কথা মুখে আনব না।

ও হেসে হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, ভীতু, ভীতু কোথাকার! ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ফয়সালা করে নিলে।

বললাম, বাঘের গুহায় বাস করতে করতে তার স্বভাব আর চালচলন সম্বন্ধে তুমি ওয়াকিবহাল হয়ে গেছ, কিন্তু আমি এখানে একেবারে আনাড়ী, তাই বিপদ আমার পায়ে পায়ে ফিরছে।

ও আবার হেসে বলল, বাঘকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি। এখন আমরা নিশ্চিন্তে ওর গুহার চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে পারি।

আমি হেসে বললাম, শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করে পরদ্রব্যে বড় বেশী লোভ দিয়ে ফেলছি। জান তো লোভের পরিণতি কি?

ও আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল, এসো বসি এই শিমুলগাছটার আড়ালে।

আমরা দুজনে বাংলোর পেছনে শিমুলগাছের আড়ালে বসে পড়লাম। নদীর দিকে আমাদের মুখ। কল-কল খল-খল খুশী ছড়িয়ে চলেছে কারো।

এবার অন্য প্রসঙ্গের উত্থাপন করলাম, সেঁজুতি, আমার কিন্তু এখুনি রঙ-তুলি নিয়ে বসে যেতে ইচ্ছে করছে।

ও বলল, দোহাই তোমার, আর দু'চারটে দিন পরে বোস, এখনই ছবিতে মাতলে আর তোমাকে পাব না।

বললাম, তোমার হাতে আমার হাত বাঁধা, যেমন চালাবে তেমনি চলব।

ও অমনি আমার ধরে থাকা হাতখানা ছেড়ে দিয়ে বলল, চাই না অমন করে বেঁধে রাখতে। ছেড়ে দিয়ে যাকে পাওয়া যায় তাকেই আমি পেতে চাই। জোর করে ধরে-বেঁধে যে পাওয়া তা নিজের শক্তির অপমান ছাড়া কিছু নয়।

আমি বললাম, তোমার ভালবাসার রঙ ঢেলেই তো আমি ছবি আঁকি। আমার সব সেরা ছবি কিন্তু এখনও অবধি তোমাকে নিয়েই।

সেঁজুতি মনে হল খুব খুশী হয়েছে আমার শেষের কথাটায়। ও মুখ নীচু করে গভীর আনন্দটুকু লুকোবার চেষ্টা করল। কিন্তু ওর নরম আঙুলগুলো আমার হাতের ওপর দিয়ে অকারণ খেলায় মেতে উঠল।

বললাম, আজ সকালে কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করনি তুমি।

সেঁজুতি আমার মুখের ওপর প্রশ্নের ভঙ্গীতে দুটো চোখ মেলে তাকাল

বললাম, মিঃ ভট্চায সকালে বললেন, আপনার বান্ধবী রইল, আশা করি কিছু অসুবিধে হবে না।

ও বলল, আমার কান দুটো তখন ঘুমিয়ে ছিল না অনির্বাণদা।

আমাদের সম্বন্ধে উনি কি ভাবেন সেঁজুতি?

ও বলল, আমরা বন্ধু, এই কথাই ভাবে। দুজন কয়েক বছর একই আস্তানায় কাটিয়েছি তাও ওর অজানা নয়। সুতরাং বন্ধুত্বের সম্পর্কটা যে নিবিড় সে ধারণা ওর আছে।

বললাম, এ নিয়ে মিঃ ভট্চায কোন ইংগিত তোমাকে করেন নি?

সেঁজুতি বলল, ও অনেক চালাক, তোমার আমার অথবা সুজন সিংয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কের ছোট্ট একটা কিছু ইংগিত করে ও থেমে যায়।

এর অর্থ?

সেঁজুতি বলল, ও যে সুজনের প্রেমিকা হো-মেয়েটার সঙ্গে মাখামাখি করছে সে সম্বন্ধে যেন আমি কোন কথা না তুলি।

আমি বললাম, তোমাকে ফেলে যাব ওপর আসক্ত হয়েছেন রেঞ্জার, নিশ্চয়ই সে মেযেটি অসাধারণ। আমি সেই অনন্যার ছবি আঁকতে চাই।

ও হেসে বলল, লড়াইটা তাহলে জমবে ভাল। ত্রিভুজ যুদ্ধ।

বললাম, যুদ্ধে জয় আমার অনিবার্য।

কি রকম?

বললাম, ওর একটা রঙীন ছবি এঁকে ওকে উপহার দিলেই যুদ্ধ-জয়।

সেঁজুতি হেসে গড়িয়ে পড়ল। হাসি থামলে বলল, তুমি কি সবাইকে তোমার সেঁজুতি পেলে যে ছবির যাদুতে বাঁধবে? হয়তো দেখবে, তোমাব দেওয়া ছবিখানা দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে ও একবার সুজন সিং আর একবার রেঞ্জাবকে দেখাচ্ছে।

আমি বললাম, তবু ওর ছবি আমাকে আঁকতেই হবে।

সেঁজুতি হঠাৎ বলল, আমার মত কেউ তোমার নির্জন ঘবে মডেল হয়ে বসবে না কিন্তু।

ওর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল ওর ভেতর একটি কাতর নারী জেগে উঠেছে। যে তার ভালবাসার মানুষের কাছে অন্য নারীর প্রতিষ্ঠা সইতে পারে না।

আমি বললাম, মডেল হতে গেলে যে মানসিক শক্তির দরকার তা সবার নেই। তাছাড়া সাহস থাকলেও তোমার মত কেউ কি পারবে প্রাণ ঢেলে দিতে?

ও খুশী হল। বলল, বেশ, লিজার ছবি আমরা দুজনে মিলেই আঁকব।

বললাম, লিজা কে?

ও বলল, যার ছবি তুমি আঁকতে চাইছ ও-ই তো লিজা কুই।

অবাক হলাম। বললাম, তুমি না বলেছিলে ও হো-দের মেয়ে? তবে লিজা নাম এল কি করে?

সেঁজুতি বলল, ছোট নাগরার হো-রা ফাদার বার্নার্ড-এর কাছে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। ফাদার আদর করে ওর নাম রেখেছেন লিজা। আর

হো-দের ভাষায় 'কুই' মানে মেয়ে।

বললাম, এত সব ব্যাপার! আচ্ছা, সেঁজুতি চল না একদিন চার্চ দেখে আসি ছোট নাগরায়।

ও বলল, খুব ভাল লাগবে তোমার। একটা উঁচু পাহাড়ের মাঝামাঝি সাদা ধবধবে চার্চের বাড়িখানা উঠে গেছে।

আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, কিছু এখন শুনব না আমি সেঁজুতি নিজের চোখে দেখব। দারুণ একটা থ্রিল।

ও বলল, আজই তোমাকে নিয়ে যেতাম, কিন্তু রেঞ্জার বেরিয়ে গেল নিজের ধান্দায়, এদিকে সুজন সিংটার পাত্তাই নেই। গাড়ি নইলে এত দূরে যাওয়া অসম্ভব।

বললাম, সুজন সিং তো কাল রাতেই পেঁৗছে দিয়ে গেলেন। তিনি কি আর কাজ ফেলে এত তাড়াতাড়ি আসবেন?

ও রোজ কয়েকবার করেই আসে, রেঞ্জার থাকুক আর না থাকুক। সামনের পথটাই ওর চলা ফেরার একমাত্র রাস্তা! প্রায়ই দেখবে সুজন সিংয়ের জীপ ছুটছে। বাংলোতে এসেই বলবে, কাঠ কাটাতে গিয়ে গলাটা কাঠ হইয়ে গেছে বহু রাণী, একটুখানি ভিজায়ে লিয়ে যাই।

বললাম, মাতলামি করে না?

ও বলল, কোনদিন দেখিনি। তবে বেশী মাত্রায় পড়ে গেলে গম্ভীর হয়ে যায়। কখনো-সখনো সাধারণ কথাগুলো জোরে বলে। হা হা করে ঐ তোমার পাখি-ওড়ানো হাসি হাসে।

আমার খাওয়ার পর লনে চেয়ার পেতে বসে গল্প করছিলাম। রোদ্দুরটা বড় মিঠে লাগছিল। উল বুনছিল ও। পায়ের কাছে উলের গোলাটা গড়িয়ে গড়িয়ে খেলায় মেতেছিল। এক একবার গোলাটা ছুটে গিয়ে পিটুনিয়ার লিকলিকে সরু দেহটাকে নাড়া দিয়ে আসছিল আবার সেঁজুতির পা ছুঁয়ে পড়েছিল শান্তশিষ্টের মত। বোনার হাত চললেই ওর দাপাদাপি। বোনা থামলেই ও একেবারে চুপ।

বললাম, উলের রঙটা কিন্তু ভারী সুন্দর।

ও বলল, পছন্দ হয়েছে তোমার?

বললাম, পছন্দ মানে, দারুণ ভাবে চোখে লাগার মত।

ও বলল, এটা তোমার জাম্পার তৈরী হচ্ছে।

অসম্ভব।

ওর বোনা থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উলের গোলাটার দুষ্টুমিও গেল থেমে।

ও বলল, কি অসম্ভব?

ওসব তো আমি পরি না।

ও একটুখানি বিষণ্ণ হল। এক সময় বলল, অনেক দূর থেকে তোমার জন্যে রঙের নমুনা দিয়ে এই উল আনিয়েছি। তোমার আসার খবর পেয়েই

সুজন সিংকে পাঠিয়ে আনিয়েছিলাম। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যে তুমি জাম্পার পরবে না।

ওকে আশ্বস্ত করবার জন্যে বললাম, জাম্পার গায়ে চড়ালে আমাকে কি রকম মানাবে বলে তুমি মনে কর ?

ও উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, সত্যি বলছি অনির্বাণদা, দারুণ মানাবে। এই দেখ, তোমার গায়ে রংটা চাপিয়ে দেখাচ্ছি।

ও উঠে এসে সামান্য বোনাটুকু আমার হাতের ওপর চেপে ধরে মুখখানাকে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে তারিফ করতে লেগে গেল।

তৈরী হয়ে যাক, তখন পরে দেখো কি স্মার্ট লাগবে তোমাকে।

বললাম, তোমার ভাল লাগলেই আমি পরব।

ও বলল, তার মানে ?

হেসে বললাম, আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা।

সেঁজুতি বলল, আমাকেই শুধু খুশী করবার জন্য তুমি পরবে ? তাহলে তোমাকে পরতে হবে না।

বললাম, তোমাকে খুশী করার জন্যে পরব না তো কি লিজা কুইকে মাতাল করার জন্যে পরব ?

ও হেসে বলল, তোমার ও চেহারার ওপর এ রঙের জাম্পারখানা চাপালে যে-কোন মেয়েকে তুমি ঘায়েল করতে পারবে।

বললাম, এমন মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত কথা বললে কিন্তু তোমার কষ্ট করে বোনা ঐ জাম্পার আমি গায়ে তুলতে পারব না।

বেশ, বলব না।

আমি বললাম, ওই জাম্পারখানা পরে যদি আমি একটি বিশেষ মেয়ের দুটি চোখের চাউনিকে কেড়ে নিতে পারি তাহলেই আমি দিগ্বিজয় করেছি বলে মনে করব।

ও ঠোঁটের ওপর উল বোনার একটা কাঁটা চেপে ধরে কি যেন ভাববার চেষ্টা করল, তারপর একসময়ে বলল, কি একটা বলব বলে খুব মনে হচ্ছিল, দূর ছাই ভুলে গেলাম।

আমি হেসে বললাম, সব কথা আমরা যদি বলতে পারতাম তাহলে মহাভারতের দশগুণ লেখা হয়ে যেত। ভাগ্যিস ভুলে যাই অনেক কিছু।

ও বলল, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে।

কথাটা আর বলা হল না, সামনের পথে দারুণ গর্জন তুলে একটা জীপ এগিয়ে এল। বাংলোর ভেতর ঢুকে আমাদের সামনে এসেই ব্রেক কষে দাঁড়াল জীপটা।

স্টিয়ারিং ধরে হাসছে সুজন সিং।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আরে আসুন, অনেকদিন বাঁচবেন। এই কিছুক্ষণ আগে আপনাকেই স্মরণ করছিলেন আপনার বহুরাণী।

স্টিয়ারিং ধরে বসে বসেই সুজন সিং বলল, বহুৎ সৌভাগ্য আমার।

সেঁজুতি বলল, গলা ভেজাতে নাকি ?

সুজন সিং নেমে এল, কি যে বল বহুরাণী! ভদ্রলোকের কাছে আমার মান বলে কিছু রাখলে নাই।

সেঁজুতি উঠে দাঁড়িয়ে বেয়ারাকে একখানা চেয়ার দিয়ে যেতে বলল। চেয়ার এলে তিনজনে পাশাপাশি বসলাম।

সেঁজুতি ছেলেমানুষের মত আবদারের সুরে বলল, আজ কি খুব ব্যস্ত আছ তুমি, খু-উ-ব ব্যস্ত ?

সুজন সিং ঘাডটা একটু কাত করে চোখের মণি ওপরে তুলে বলল, কিছু হুকুম আছে বহুরাণীর ? বলে ফেল চটপট, হাজির আছে বান্দা।

সেঁজুতি বলল, এমন করে কথা বললে আমি কিন্তু আর একটিও কথা বলব না।

সুজন সিং বলল, এইবারটা মাপ করে দিন। আর বলবে না এ বান্দা।

খিল খিল করে হেসে উঠল সেঁজুতি।

জানো অনির্বাণদা, সিং সাহেবের সঙ্গে বরাবর দুটি করে চাকর থাকে। কথা বলতে গেলেই ও-দুটিকে ও কাজে লাগাবেই। কখনো নোকর, কখনো বান্দা।

এবার আমরা সকলেই সেঁজুতির হাসিতে যোগ দিলাম।

একসময় উঠে পড়ল সেঁজুতি। সুজন সিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, এস আমার সঙ্গে। আগে তোমার ভেজাবার ব্যবস্থাটা করে দি, তারপর বলা যাবে আমার কথা।

সুজন সিং অতি বিনীত অনুচরের মত উঠে গেল সেঁজুতির পিছু পিছু ঘরের ভেতর।

একটু পরে একা সেঁজুতি বেরিয়ে এসে দাঁড়াল আমার চেয়ারের হাতলটা ধরে। বলল, কারণবারিতে ডুবিয়ে রেখে এসেছি, এরপর ওকে যা বলব ও তাই শুনবে।

বললাম, এমন করে মদ গিললে লোকটার লিভার না পচে যায়।

থোড়াই কেয়ার করে ওরা লিভারের। মদ ওদের রাজা বানায় আবার ঐ মদই ওদের খায়।

বললাম, কাজ করে কি করে ?

মদের ঘোরে। বলতে পার ওরই জোরে।

আমি বললাম, এক একটা জায়গা আছে যেখানে মদের চলন খুব বেশি। যেমন তোমাদের এই বন-পাহাড়ে, খনি-ফ্যাক্টরীতে। যেখানে বেশির ভাগ মানুষ কুলি-কামিনের কাজ করে।

ও বলল, কুলি-মজুর খাটাতে গিয়ে বাবুরা যত হিমসিম খাচ্ছে ততই মদ খাওয়ার মাত্রাও যাচ্ছে বেড়ে।

বললাম, শুনেছি একবার ও বস্তু ধরলে ছাড়া মুশকিল।

ও বলল, কথাটা মিথ্যে নয়। তোমাদের রেঞ্জারের মনটা ঐ লিজার কাছ

থেকে ছিনিয়ে আনবার জন্যে, আমি কিছুকাল ওর বোতলের সঙ্গী হয়েছিলাম।

ছড়লে কি করে?

অসীম মনের জোর আর একজনের ওপর ভালবাসা আমাকে একদিন মদ ছাড়তে সাহায্য করল।

বললাম, এত করেও রেঞ্জার সাহেবের মন ফেরাতে পারলে না?

সেঁজুতি বলল, যেই আমার ভুল ভাঙল অমনি আমি সর্বনাশের পথ থেকে পা-টা টেনে নিলাম।

বললাম, তোমার সেই ভালবাসার পাত্রটি কে সেঁজুতি, যে তোমাকে এমন বিপদ থেকে উদ্ধার করল?

ও অমনি বলল, যে আমাকে জীবনে সবচেয়ে বেশি কাঁদিয়েছে।

বললাম, তোমাকে যে কাঁদাতে পাবে সেঁজুতি তাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা কবতে পারতাম না।

ও হেসে বলল, নিজের হাতে নিজের শাস্তির ব্যবস্থা কর তাহলে!

বললাম, নিজেকে আমরা প্রতিদিন কতভাবেই তো শাস্তি দিই, কিন্তু প্রিয়জনের কাছ থেকে শাস্তি পাওয়া দারুণ একটা ভাগ্যের ব্যাপার।

সেঁজুতি বলল, অনেক শাস্তি তোমার পাওনা হযে আছে, একসঙ্গে সেগুলো যখন পড়বে তোমার ওপর, সইতে পারবে?

বললাম, সব তোমার ঐ শিমুলের ফুল হয়েই পড়বে। তোমার ভালবাসার মার আর কেউ পাবুক বা না-পারুক আমি ঠিক সইতে পারব সেঁজুতি।

আমাদের কথার ভেতর শক্ত বুটের আওয়াজ তুলে এসে দাঁড়াল সুজন সিং।

সেঁজুতি এবার ছোটনাগরায় যাবার কথাটা পাড়তেই ও যেন লাফিয়ে উঠল।

আলবাৎ যাবে। একটা খুবসুরৎ চিড়িয়া আছে ছোটনাগরায় চৌধুরীবাবু। ঐ চিড়িয়াটা ধরার সাধ আমার বহুৎ রোজ থেকে। চিড়িয়াটা খালি উড়ে বেড়ায়, তাই ওকে ধরবার সাধটা মাথায় চিড়িক দিয়ে ওঠে' ওকে ধরতে পারছি না বলেই তো ওর পেছনে পেছনে হররোজ কাজ-কাম ফেলে ছুটে বেড়াই। ও বহুৎ সুন্দর গানা গায়, আর হরেক কিসিমের ওড়ার খেলা দেখায়। ওহি চিড়িয়া মেরা, চলিয়ে বাবু ছোটনাগরা।

একটু থেমে বলল, শালার পাখিটা ধরতে না পারলে একদিন ছুরায় বিঁধে জান লিয়ে লেব, তবু কারো হাতে তুলে দিতে পারব নাই। হাঁ, সাচ্ বাৎ। সুজন সিং ভাল তো সাচ্চা দোস্ত, বিগড়াল তো জানী দুশমন।

আমরা গাড়িতে উঠলাম। শীতের বেলাটুকু বন-পাহাড় মুহূর্তে শুষে নেবে। তাই সেঁজুতি গাড়িতে উঠেই তাড়া লাগাল, সিধে চল ছোটনাগরার চার্চে, ওখানে বসেই আমরা সূর্যাস্ত দেখব। আর কোন স্পটে আজ গাড়ি

থামাবার দরকার নেই।

যো মর্জি বহুরাণী, বলে সুজন সিং তার জীপখানাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে। একটা ভোমরা যেন বোঁ-বোঁ আওয়াজ তুলে উড়ে চলল ফুলের সন্ধানে।

এ বন গভীর। সূর্যের আলো আর গাছের ছায়া বেদে মেয়ে-পুরুষের মত পথের ওপর পাশাপাশি লুটিয়ে আছে।

মনের খুশীতে গান ধরেছে সুজন সিং। অনেকদিন পরে প্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হতে চলেছে কোন উতলা-হৃদয় প্রেমিক। পথ যেন আর ফুরোয় না। সে একটি চিঠি পাঠিয়েছে পাখির মুখে, কিন্তু প্রিয়ার কোন খবর পায়নি সে।

মোটামুটি গানের এই ধরনের একটা বিষয়বস্তু উদ্ধার করা গেল। শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে কাঁপা কাঁপা সুরটা মন্দ লাগছিল না।

সেঁজুতি আমার কানে ফিস ফিস করে বলল, খোশ-মেজাজে আছে সিং সাহেব। পেটে রঙীন জল পড়েছে তাই গান-টান বেরিয়ে আসছে গলা ঠেলে।

আমরা কোথাও কোথাও নিবিড় বন পেরিয়ে এলাম। উপত্যকার উপর দিয়ে ছোট ছোট ঝোরা ছুটে চলেছে। আমাদের গাড়ি নুড়িপাথরের উপর দিয়ে শব্দ করতে করতে জল ছিটিয়ে পেরিয়ে এল। পাহাড়ের কোল বেয়ে আসার সময় নীচে গভীর খাদ দেখলাম। একটু বেচাল হলেই আরোহী-সমেত গাড়ি যাবে হারিয়ে ঐ বন আর পাহাড়ের গহন গভীরে।

পাহাড় পাহাড় পাহাড়, সংখ্যাতীত পাহাড়। সবুজ তরঙ্গের মত প্রবাহিত হয়ে গেছে। কত প্রাচীন বৃক্ষের সংসার ওর দেহে, কত পশুর জন্মমৃত্যুর লীলা ওর গুহায়, কত পাখি ওর দেহ-সংলগ্ন অরণ্যে সুপ্রাচীন শতাব্দী থেকে নীড় রচনা করে আসছে।

এ পাহাড় হিমালয়ের তুষারমৌলির মত উদ্ধত মহিমায় আকাশে মুকুট ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। এ পাহাড় নীল আকাশের বিরাট বিস্তৃত সূর্যোদয় সূর্যাস্তের পটে ঋতুতে ঋতুতে রঙ বদলায়। গরমের দিনে ওর দেহের লৌহ উপাদান দারুণ উত্তাপে মাঝে মাঝে ঠিকরে বেরিয়ে আসে। অমনি শিলায় শিলায় সংঘর্ষে আগুন জ্বলে ওঠে। শুকনো পাতা ঐ আগুনকে বয়ে নিয়ে চলে বন থেকে বনান্তে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন রাতের পাহাড়ে দীপাবলীর উৎসব শুরু হয়েছে।

শীত পড়লে রাশ রাশ পাতা ঝরে পড়ে পাহাড়ি পথের ওপর। প্রবল শীতেও এদের মাথায় প্রকৃতিদেবী পরিয়ে দেয় না বরফের মুকুট।

বসন্ত এখানে সত্যিই ঋতুপতি। ফুলে ফুলে অরণ্য-উৎসব চলে পুরো দুটি মাস। বিচিত্র গাছ-পালায় বিভিন্ন সবুজের সমারোহ। প্রজাপতি পাখি ফুল, সে যেন এক মহা-মহোৎসবের আয়োজন।

গাড়ি যখন চার্চের এলাকায় ঢুকল, বেলা তখন তিনটের ঘর ছুঁই-ছুঁই।

আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। সুজন সিং কিন্তু নামল না। ও বলল, ঠিক পাঁচটায় গাড়ি নিয়ে বান্দা হাজির থাকবে বহুরাণী।

সেঁজুতি চোখেমুখে একটা ইঙ্গিতভরা হাসি ফুটিয়ে নীচের দিকে আঙুল দেখাতেই সুজন সিং চোখ ছোট করে হাসল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ঘুরিয়ে সে নীচের দিকে নেমে গেল।

আমি এবার চার্চের দিকে তাকালাম। সত্যি স্থান নির্বাচনে দক্ষতা আছে বিদেশীদের।

পেছনে একটা পাহাড়, সামনে পাহাড়ের কোলে বেশ খানিকটা সমতল ভূমি। সাদা রঙের চার্চের চূড়ো পাহাড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের সমতলটুকু জুড়ে সবুজ ঘাসের লন। ক্যানা আর হরেকরকম মরশুমী ফুলের বাগান। লনের ঠিক মাঝখানে কয়েকটি শালগাছের জটলা। তার তলায় লাল সিমেণ্টে বাঁধানো বেদী। একটি বেদীর ওপর কাঠের ফ্রেমে ঝুলছে বিরাট আকারের এক ঘণ্টা।

সেঁজুতি আমাকে একটি বেদীর ওপর বসতে বলে নিজে পাশে বসল। আমাদের পেছনে রইল শালগাছের জটলা আর তার পেছনে চার্চ। আমরা এখন সামনের দিকে তাকিয়ে বসেছি। দু'পাশে পাহাড় জুড়ে গভীর বন। সামনে বিরাট এক উপত্যকা। উপত্যকার শেষ সীমায় পাহাড়ের রঙ অস্পষ্ট ধূসর। কিন্তু বাঁ দিকের একটা পাহাড় অনেক দূর থেকে ছুটে এসে উপত্যকার প্রায় মাঝামাঝি থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। সে পাহাড়ে বন তত ঘন নয়। কিন্তু তার গায়ে সূর্যের আলো পড়ে জায়গায় জায়গায় রুপোর পাতের মত ঝক্ ঝক্ করছে।

একটা ছোট নদী ঐ পাহাড়ের ধারে ধারে নেমে এসে উপত্যকার বুকের ওপর দিয়ে পৈতের মত চলে গেছে। সূর্যের আলো ঐ নদীর এক একটা জায়গায় ঝিলিক দিচ্ছে।

আমি এই বিস্তীর্ণ উপত্যকার দিকে তাকিয়ে রইলাম। উপত্যকার শেষ প্রান্ত থেকে একটি বনরেখা ঐ নদীর তীরে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসে থেমে গেছে।

উপত্যকার দক্ষিণে বিরাট বিরাট পাথর সারিবদ্ধভাবে চলে গেছে। মনে হচ্ছে যেন পাথর দিয়ে এককালে প্রাচীর তৈরী করা হয়েছিল।

সেঁজুতি যেন আমার মনের কথাটি জানতে পেরেছে। ও বলল, ঐ যে দূরে পাথর দিয়ে গড়া ভাঙা প্রাচীরের মত দেখছ, ওটার ভেতরে অনেকে মনে করে একটা দুর্গ এককালে কে বা কারা তৈরী করেছিল। সে দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও কিছু কিছু দেখা যায়। বাকী অংশ অনেকে অনুমান করে ভূমিকম্পের ফলে উপত্যকার তলায় চলে গেছে।

হো-রা বলে ওদেরই কোন রাজা অনেক বছর আগে এখানে রাজত্ব করত। তখন এই সমস্ত পাহাড় আর বন ছিল তারই রাজ্যের মধ্যে।

বললাম, সবই সম্ভব সেঁজুতি। কিন্তু আমি ভাবছি কি বিপুল সৌন্দর্যের ভাণ্ডার এই উপত্যকা। বন, পাহাড়, নদী, প্রান্তর সব মিলে এ এক অবিশ্বাস্য স্বপ্নের রাজ্য।

ও বলল, দূরে দেখছ নদীর তীর ঘেঁষে কিছুটা বন। ঐ বনের ভেতর আর আশে-পাশে হো-দের বসতি। ওরা ঐ নদীটা ব্যবহার করে। বনের গাছপালা লুকিয়ে-চুরিয়ে কাটে। কাছে-পিঠে উপত্যকায় সামান্য ফসল ফলায়। এই বনের এটাই ওদের কাছে সবচেয়ে দামী জায়গা।

বলতে বলতেই একটা ছবি ফুটে উঠল চোখের ওপর। একসার মোষ ডান দিকের ঐ ভাঙা পাথরের প্রাচীরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। দু'চারটে প্রায় উলঙ্গ ছেলে তাদের পিঠের ওপরে বসে আছে। হাতে তীর-ধনুক।

মোষগুলো সম্ভবতঃ চলতে চলতে এতদূর এসে পড়েছিল, তারপর রোদ্দুরে ঐ ভাঙা দুর্গ আর শালবনের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল, এখন ফিবে চলেছে গাঁয়ের দিকে। নদীর ধারে ধু-ধু প্রান্তরের বুকের ওপর দিয়ে ছবির মত ওরা এঁকে-বেঁকে চলল। কতক্ষণ আমরা ঐ দিকে তাকিয়ে রইলাম। শেষে কয়েকটা কালো কালো বিন্দুর মত ওরা দূরের অরণ্যে হারিয়ে গেল।

সেঁজুতিকে বললাম, অশ্চর্য সুন্দর একটা ভিউ পাওয়া যায় এখান থেকে উপত্যকা নদী আর পাহাড়ের। মাঝে মাঝে এখানে ছবি আঁকার জন্যে কি করে আসা যায় বল তো?

ও বলল, আমাকে ঘুষ কবুল কর তাহলে আসার বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।

বললাম, তোমাকে ঘুষ দেওয়া আমার মত লোকের পক্ষে কি সম্ভব হবে?

এত বেশী বেশী ভাবছ কেন, যৎকিঞ্চিৎ দিলেই আমি খুশী।

কি নেবে বল?

ও অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, যখন গতিশীল কোন কিছু তোমার কলমে বা তুলিতে ধরা পড়বে, তখন তারই দু'একটা স্কেচ আমার হাতে তুলে দিও।

বললাম, এ আর এমন কি কথা।

ও বলল, তোমার কাছে যা সামান্য অনির্বাণদা, আমার কাছে তাই অনেক বড়। জীবনটা একেবারে ঐ দূরের পাহাড়ের মত বদ্ধ অচল হয়ে গেছে। একটু গতি একটু চাঞ্চল্যের ছোঁয়া কোথাও পেলে মনে হয় অনেক পাওয়া।

আমার মনে হল ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠেছে সেঁজুতি। সারাদিন বাংলোর ভেতরে উল বুনতে বুনতে ও উলের একটা গোলার মত হয়ে গেছে। চঞ্চল ডানপিটে মেয়েটা একটা পঙ্গু বাতে ধরা পাখির মত খাঁচায় বন্দী হয়ে আছে।

বললাম, যে ক'টা দিন তোমার কাছে আছি সেঁজুতি, চেষ্টা করব তোমার পুরনো দিনগুলোকে মনে করিয়ে দিতে।

ও আমার হাত দুটো নিজের হাতের ভেতর নিয়ে বলল, হয় এখনি চলে যাও এ বন ছেড়ে নয়তো অনেক অনেক দিন থেকে যাও আমার কাছে।

বললাম, আজও তেমনি পাগল রয়ে গেছ সেঁজুতি।

ও বলল, জানো অনির্বাণদা, শুধু ড্রিংক করে বলেই যে আমি ওর ওপর বিরূপ তা নয়, ও বিয়ে করার পর থেকেই ভেবে নিয়েছে আমি ওর ঘরের রোজ

ব্যবহার করা কাপ-প্লেটের মত। যখন চাই তখনই ব্যবহারের জন্যে পাওয়া যাবে।

ওর মনটাকে হাল্কা করে দেবার জন্য বললাম, দেখ সেঁজুতি, হঠাৎ কোন একটা ঘটনা একটি মানুষের ভেতর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারে।

সেঁজুতি ম্লান হাসি হেসে বলল, সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা কর না অনির্বাণদা।

একটা ঘটনা বললেই তুমি ওর ছবিটা স্পষ্ট বুঝতে পারবে। ডিভিসনাল ফরেস্ট অফিসার এল একদিন ইন্সপেকশনে। ও তার গাড়িতে আমাকে তুলে দিয়ে বলল, স্যার, মিসেস ভট্চায আপনাকে যদি সিরিবুরুর বাংলোতে পেঁছে দেয় তাহলে কি খুব অসুবিধে হবে?

ওর হায়ার অফিসার বলল, ঠিক আছে মিঃ ভট্চায, ভাবনার কিছু নেই, আপনি এখানকার কাজ শেষ করে ধীরে-সুস্থে আসুন।

ও আমাব কানে কানে ফিস ফিস করে বললে, বাবুর্চি আছে ওখানে, গিয়েই ডিনারের অর্ডাব দিও। দেখো যেন অভ্যর্থনার এতটুকুও ত্রুটি না হয়।

আমি তখন প্রায় নতুন এসেছি ফরেস্টে, ওকে তখন চিনে উঠতে পারিনি। স্বামীর উদ্বেগটুকু দূর করার জন্যে মাথা নেড়ে বললাম, তুমি ভেবো না, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব। কাজ হয়ে গেলেই কিন্তু চলে এসো।

ও মাথা নাড়ল। আমি পরম নিশ্চিন্তে সিরিবুরুর বাংলোর দিকে রওনা দিলাম।

পথেই বুঝলাম, লোকটা ভীষণ রকম গায়ে-পড়া গোছের। আমি ওর কথার জবাব দিচ্ছিলাম, কিন্তু প্রায় সারাক্ষণই সিঁটিয়ে বসেছিলাম।

লোকটা বলল, মিসেস, বনে থাকলে কিন্তু শহরের সভ্যতা-ভব্যতাগুলো ছাড়তে হবে। এখানে পশুপাখিদের জীবনই প্রায় আমাদের জীবন! ওরা স্বাধীন, মুক্ত। ওরা আদিম জীবনের স্বাদ জানে।

একটু সন্ধ্যা নামতেই ও আমার গা ঘেঁষে বসার চেষ্টা করতে লাগল। গাড়ি সামান্য টাল নিলেই ও প্রায় হুড়মুড়িয়ে পড়ছিল আমার ওপর।

এক সময় বলল, আপনি সত্যি সুন্দর। যেমন ঘর সাজানোতে তেমনি নিজেকে সাজানোতে।

আমি ওর কথা শুনে তো ঘামছি। সামনে যে ড্রাইভার বসে আছে সেদিকে লোকটার খেয়ালই নেই।

শেষ পর্যন্ত বলল কি, মিঃ ভট্চায সত্যিই ভাগ্যবান। আপনাকে পেলে কোন পুরুষই না নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করে বলুন।

গাড়ি এসে পেঁছতেই আমি বাংলোতে গিয়ে চোখে-মুখে-মাথায় জল দিলাম। বাবুর্চিকে খাবার অর্ডার দিয়ে একটা ঘরে ঢুকে বিছানায় এলিয়ে পড়লাম। মাথাটা আমার ছিঁড়ে পড়ছিল।

লোকটা তখন বসেছিল বারান্দায় ইজিচেয়ারের ওপর।

কিছুক্ষণ পরে বাবুর্চি এসে বলল, মেমসাব চা তৈরী করেছি, সাহেবের সঙ্গে আপনি কি বাইরে খাবেন ?

বললাম, তুমি এখানেই আমাকে দাও। এ ঘরে আলো দিতে হবে না, সাহেবের কাছে আলো নিয়ে যাও। সাহেব জিজ্ঞেস করলে বোল আমার একটু মাথা ধরেছে।

ব্যস, আর যায় কোথা, ঐ অছিলায় লোকটা ঢুকে পড়ল আমার ঘরে। বলল, মিসেস ভট্চায, খুব খারাপ বোধ করছেন কি ? ওষুধবিষুধের কিছু ব্যবস্থা—বলতে বলতে আমার খাটের একেবারে গায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

ভাগ্যিস সে সময় বাবুর্চিটা আলো নিয়ে এল ঘরের ভেতর। সাহেব অন্ধকারে কিছু দেখতে পাবে না তাই বুদ্ধি করে ও আলো এনেছে। আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, কিন্তু ধমক খেল বাবুর্চি, বুড়বক কোথাকার, মেমসাবের মাথা ধরেছে আর তুমি একটা জ্বলজ্বলে আলো নিয়ে হাজির হলে!

আমি বিছানায় ইতিমধ্যেই উঠে বসেছিলাম। তাড়াতাড়ি বললাম, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি আবার অন্ধকার ঘরে একা থাকতে পারি না।

লোকটা অমনি বলে উঠল, ভয় করে বুঝি ? এই আমিই তো রয়েছি।

বললাম, বেয়ারা, আলো এখানে থাক, তুমি সাহেবের জন্যে একটা কুর্শি নিয়ে এসো বরং।

বেয়ারা-কাম-বাবুর্চি বেরিয়ে গেল।

ঠিক সেই সময় বাইরে একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। আমি যেন প্রাণ পেলাম অনির্বাণদা। নিশ্চয়ই মিঃ ভট্চায এসেছে মনে করে আমি প্রায় দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এসে দেখি গাড়ি থেকে নামল সুজন সিং।

এই লোকটা সম্বন্ধে তখন আমার বিশেষ কোন ধারণা গড়ে ওঠেনি। দু'চারবার আমাদের বাংলোতে এসে ওর সঙ্গে ড্রিংক করে গেছে মাত্র।

আমার সঙ্গে অত্যন্ত সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছে। সুতরাং মদ খেলেও সুজন সিংকে বদ লোক বলে ভাববার কোন কারণ ঘটেনি আমার।

সুজন সিংকে একা নামতে দেখে আমি একটু দমে গেলাম। মিঃ ভট্চায এল না দেখে আমার যেন কান্না পাচ্ছিল।

সুজন সিং বাইরে দাঁড়িয়েই বাবুর্চিকে ডাক দিল। বাবুর্চি এলে গাড়ির ভেতর থেকে মালগুলো নামিয়ে নিতে বলল।

ইতিমধ্যে ফরেস্ট অফিসার এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়। সুজন সিং লম্বা একটা সেলাম লাগাল। কোন রকমে আধখানা হাত তুলল অফিসারটি। বেশ বুঝলাম সুজন সিং আসাতে মেজাজটা তার গরম হয়ে উঠেছে। কিন্তু মেজাজ সরিফ হতে বেশী দেরী লাগল না যখন সুজন সিং কর্তার কাছে মদের তালিকাটা পেশ করল।

রান্না শেষ হবার আগেই একবার গ্লাস ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। তারপর ডিনার চুকলে দুজনে জমিয়ে বসল মদের বোতল নিয়ে।

মদের ঘোরে আমার হাত ধরে অফিসারটা তো টানাটানির যোগাড়। ওদের সঙ্গে বসে আমাকেও মদ গিলতে হবে। আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম।

সুজন সিং সামনে এসে দাঁড়াল। মাতাল অফিসারটার হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল গেলাসের সামনে। যখন লোকটা বেহুঁস মাতাল হয়ে পড়ল তখন তাকে বিছানায় ঠেলে শুইয়ে দিয়ে বারান্দায় আমার পাশে এসে দাঁড়াল সুজন সিং।

আমি ওকে দেখে ভয় পাচ্ছিলাম লক্ষ্য করে ও আমাকে বলল, বহিনজী, তোমার ইজ্জৎ লিয়ে শয়তান খেলা করবে এ আমার জান থাকতে হতে দিবে না। ডর না করে ঘর বন্ধ করে তুমি আরাম কর রাতভোর।

ওর মুখে এই আশ্বাসের কথা শুনে সে রাতে আমি প্রাণ ফিরে পেলাম।

পরে আরও অনেক ঘটনার ভেতর দিয়ে জানতে পেরেছিলাম, তোমাদের রেঞ্জার ওপরের অফিসারদের মন রাখার জন্য তার স্ত্রীর মান খোয়াতেও পেছ-পা নয়।

কিন্তু আমি অবাক হয়েছিলাম সেদিন মাতাল সুজন সিংয়ের কাণ্ড দেখে।

পরে ওর আগ্রহে আমি ওকে বাংলা শেখাই।

একদিন ঐ ভয়াবহ রাতের ঘটনা নিয়ে সুজন সিং আর আমার ভেতর কথা হচ্ছিল।

আমি বললাম, তুমি সে রাতে সিরিবুরুর বাংলোতে না গেলে আমাকে বোধহয় পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়তে হত।

সুজন সিং বন কাঁপিয়ে হাসল। হেসে বলল, একটা মাতালকে তুমি একা ঘায়েল করতে পারতে না বহুরাণী? একটা ধাক্কা দিলে ওহি তো খাদে গড়ায়ে পড়ত।

বললাম, তোমার কি সে রাতে বাংলোয় আসার কথা ছিল?

ও বলল, একদম না। আমি মিঃ ভট্চাযের সঙ্গে দেখা করতে এসে শুনলাম, তুমি আর ঐ অফিসারটা সিরিবুরুর বাংলোতে বেরিয়ে গেছ। কথায় কথায় আরও জানলাম মিঃ ভট্চায রাতে ও বাংলোতে আর যাবে নাই। বহুরাণী, বনে শিকার করতে বের হলে আমি দূর থেকে জানোয়ারের গন্ধ পাই। ঐ জানোয়ার অফিসারটাকে আমি চিনতাম। আমাকে একবার ঐ শুয়ার কা বাচ্চা হো-দের গাঁওতে লিয়ে যেতে বলেছিল। সেখানে ওর আঁখ দেখে মালুম হয়েছিল শালা মেয়েমানুষদেরকে গিলে খাচ্ছে। আমি আরও জানতাম ও হারামের বাচ্চা পাঁড় মাতাল আছে।

তাই একটা খারাপ গন্ধ আঁচ করে মিঃ ভট্চাযকে না বলে সে রাতে আমার টেণ্ট থেকে দামী দামী মদের বোতল নিয়ে সিরিবুরুর বাংলোতে গাড়ি ছুটায়ে গিয়েছিলাম।

ওকে বললাম, সে রাতে বনের দেবতার মত তুমি গিয়ে আমাকে রক্ষা করেছিলে।

ও দারুণ লজ্জা পেয়ে জিভ কেটে বলল, ছি ছি বহুরাণী, সুজন সিংকে দেবতা বলছ তুমি। ও একটা মাতাল আছে, শালা একদম বেহুঁশ মাতাল।

আবার সেই হা হা করে বন কাঁপানো পাখি ওড়ানো হাসি।

আমি সেদিন জেনেছিলাম আমার স্বামীর চেয়ে এই মাতাল ইজারাদার অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। আর এও জেনেছিলাম এই গভীর সারান্দা বনে একটি মাত্র খাঁটি মানুষ আছে, আর সব ক'টা জানোয়ার হয়ে গেছে। যদি কোনদিন মান নিয়ে টানাটানি পড়ে তাহলে ঐ মাতাল সুজন সিংই আমাকে রক্ষা করতে পারবে, আর কেউ নয়।

সেঁজুতির কথা শেষ হলে বললাম, আশ্চর্য মানুষ তো সুজন সিং। লোকটার ওপর মাতাল বলে যে খারাপ ধারণাটা ছিল তা উবে গিয়ে মনে হচ্ছে, দুনিয়ায় এমন মাতাল থাকলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

একঝাঁক পাখি মাথার ওপর দিয়ে শন শন শব্দে উড়ে যেতেই আমরা তাকালাম। পেছনের পাহাড়ে সূর্যাস্তের আয়োজন। শীতের শেষ বিকেলে পাহাড়ের পেছন থেকে আলোর রশ্মিগুলো আকাশের দিকে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছিল। এমন কোমল একটা সোনালী মধুর মত রঙ চড়াচ্ছিল যে তা ভোলার নয়।

পাখিগুলো এখন আমাদের সামনের উপত্যকার উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। গুণটানা ধনুকের ভঙ্গীতে উড়ে যাচ্ছে বিরাট ঝাঁকটা।

এতগুলো পাখি তবু কি অদ্ভুত শৃঙ্খলা ওদের ভেতর।

এবার ওরা একটা তীরের ফলার মত হয়ে গেল। কিছু সময়ের ভেতরে এক ছড়া গ্রন্থিহীন মালার মত ওরা নদীর তীর ধরে দুলতে দুলতে চলল। এরপর নীল নীল পাহাড় আর সবুজ সবুজ বন তাদের ডেকে নিল রাতের বিশ্রামের জন্যে।

বললাম, সেঁজুতি, এখানে না এলে আমার জীবনে অনেক কিছু অদেখা থেকে যেত।

ও হেসে বলল, আরও অনেক কিছু দেখতে পাবে, শুধু যাবার কথাটি মুখে এনো না।

আমিও ওর হাসিতে যোগ দিয়ে বললাম, বনের প্রেমে পড়ে গেলে তখন তাড়ালেও যাব না কিন্তু।

ও কিশোরীর মত আমার হাতে একটি চড় মেরে ধরে ফেলল হাতটা। বলল, আমার কাছে থেকে তুমি অন্যকে ভালবাসবে সে আমি সইতে পারব না।

বললাম, তোমার ঈর্ষাটাও যে এত মধুর তা আগে জানতাম না।

ও বলল, তুমি আমার কতটুকু জান অনির্বাণদা!

বললাম, তোমার যতটুকু জেনেছি তা সুন্দর, আর যা জানতে পারিনি তা আরও সুন্দর।

ও অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, কেন?

বললাম, তুমি যেখানে অচেনা সেখানে তোমাকে ঘিরে অজানা রহস্য। তোমার সে রহস্যের রূপ সুন্দরতর।

ও অন্যমনা হয়ে গেল। ভারী সুন্দর একটি গান এল ওর গলায়। প্রথমে ও সুর ভাঁজল কতক্ষণ। তারপর এক সময় বলল, জানো অনির্বাণদা আমি আর গান গাই না আজকাল। সব কথা ভুলে যাই।

ধীরে ধীরে ও গাইল:

বনে যদি ফুটল কুসুম নেই কেন সেই পাখি।
কোন্ সুদূরের আকাশ হতে আনব তারে ডাকি॥
হাওয়ায় হাওয়ায় মাতন জাগে,
পাতায় পাতায় নাচন লাগে গো—
এমন মধুর গানের বেলায় সেই শুধু রয় বাকি॥

এ পরিবেশে গান আপনিই এসে যায় গলায়।

গান শেষ হলে বললাম, সেঁজুতি, সেই যে স্কেচ করতে যেতাম কত দূরে দূরে বালিগঞ্জের ট্রেনে করে। তারপর নেমে পড়তাম কোন এক অখ্যাত স্টেশনে। পায়ে হেঁটে পেরিয়ে যেতাম মাঠ ঘাট। কোন কৃষ্ণচূড়া অথবা বট অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে যেতাম স্কেচ করতে, আর তুমি পাশে বসে একটার পর একটা গান গেয়ে শোনাতে। সেদিনগুলো মন থেকে মুছে ফেলি কি করে সেঁজুতি।

ও হঠাৎ বলল, আমরা এখানে নতুন করে ছবি আঁকা শুরু করব অনির্বাণদা।

বললাম, খুব রাজী। কেবল তোমার কর্তাটি গররাজী না হলেই বাঁচি।

ও বলল, রেঞ্জার নিজের খেলা নিয়ে এমনি মেতে রয়েছে যে আর কারো দিকে তাকাবার ফুরসতই তার নেই।

আমরা বসে বসে এমনি টুকরো টুকরো গল্প করছিলাম, হঠাৎ গীর্জায় প্রার্থনার ঘণ্টা বেজে উঠল। একটানা কতক্ষণ বেজে চলল সে ঘণ্টা। তারপর এক সময় থামল।

আমরা বসে বসে শুনতে পেলাম, চার্চের ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল। উপত্যকা থেকে মুখ সরিয়ে চার্চের দিকে ফিরে বসলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা ঘটনা ঘটল।

যারা চার্চের ভেতর প্রার্থনার জন্য ঢুকছিল তাদের থেকে একটি মেয়ে ছিটকে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। দূর থেকে মেয়েটিকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে সেঁজুতি।

দেখলাম মেয়েটি এ দেশীয় বটে। কিন্তু শিল্পের দিক থেকে এমন দেহগঠন সত্যি দুর্লভ। অতি পরিচ্ছন্ন একটি সাদা কাপড় এমনি আঁটসাঁট করে পরেছে যে দেহের সীমারেখাগুলো সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মাথার খোঁপা একদিকে এলিয়ে বাঁধা, সমুদ্রতীরের নুলিয়া মেয়েদের মত। ঐ খোঁপায় লাল আর সাদা ফুল গোঁজা।

মেয়েটি হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। কাছে এলে দেখলাম, সারল্যের সঙ্গে আশ্চর্য বুদ্ধির দীপ্তি মিশে আছে।

সেঁজুতিকে দেখে ও বলে উঠল, এখানে একা বসে আছ কেন?

সেঁজুতি বলল, একা কই, পাশেই তো আরো একজন রয়েছে।

ও আমার দিকে মুখখানা কাত করে অদ্ভুত ভঙ্গীতে হেসে তাকিয়ে রইল। মেয়েটির বয়েস অনুমান বিশ-বাইশের বেশি হবে না। ও দেহাতী হিন্দী আর টুকরো টুকরো ইংরাজী মিশিয়ে কথা বলছিল।

সেঁজুতির উত্তর দেবার পরে বেশ খানিকটা সময় আমাকে দেখতেই কেটে গেল মেয়েটির। তারপর আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সেঁজুতিকে বলল, তোমার মানুষটি কোথায়?

সেঁজুতি ঠিক আগের মতই বলল, এই তো আমার পাশেই রয়েছে।

ও মাথা নেড়ে নেড়ে অবিশ্বাসের হাসি হাসতে লাগল।

সেঁজুতি এবার পাল্টা প্রশ্ন করল, তোমার মানুষটি কোথায়?

ও প্রথমটা, একটু চমকে উঠল। তারপর হেসে বলল, কোন মানুষটার কথা বলছ?

সেঁজুতি অমনি বলে উঠল, আমি তোমার পয়লা নম্বরের মানুষটার কথাই বলছি।

মেয়েটার গায়ে সেঁজুতির সূক্ষ্ম কথার খোঁচাটা বিঁধল না।

ও বলল, সুজনের কথা বলছ, ও কি এসেছে এ তল্লাটে!

সেঁজুতি অবাক হয়ে বলল, সেকি, সে তো তোমার কাছেই গেছে, সেই তিনটে নাগাত!

সুন্দর মিষ্টি মুখখানায় একটুখানি মেঘছায়া রঙ লাগল।

ও বলল, কই না তো। তাহলে ও গেছে আমাদের সাসাংদার আস্তানায়। ও কি জানে না শুক্রবার আমি এই চার্চের এলাকায় থাকি? ছোট ছেলে মেয়েদের বাইবেলের গল্প শোনাতে হয়।

এবার আমি কথা বললাম, সিং সাহেবের আসার কিন্তু সময় হয়ে গেছে। এখুনি দেখা হয়ে যাবে।

মেয়েটি আর দাঁড়াল না। আমার কথা শেষ হতেই মিষ্টি একটা হাসি হেসে প্রায় দৌড়ে পালাল চার্চের দিকে।

সেঁজুতি আমার মুখের ওপর স্থিরদৃষ্টি ফেলে বলল, কেমন দেখলে?

হেসে বললাম, দেখলাম আর কই।

ও বলল, মিথ্যে কথাটি আর বোল না মশাই। দেখা শুধু নয়, দামী লেন্সে বুকের ভেতরের ফিল্মে ফটো তোলা পর্যন্ত হয়ে গেছে।

বললাম, তা যদি হয়ে থাকে তাহলে সে ছবি মাটি হয়ে গেছে।

ও বলল, কেন? ।

একই ফিল্মে দু' দু'বার ইমপ্রেশান পড়লে যা হয়।

কথাটা বুঝতে না পেরে মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে বলল সেঁজুতি, হেঁয়ালী

রাখ, বলত তোমার আসল কথাটা।

বললাম, ফিল্মে আর একটি মেয়ের ছবি আগেই পড়েছিল, এখন যদি এ মেয়েটির ছবিও পড়ে তার ওপর তাহলে অবস্থাটা কি হবে নিশ্চয়ই তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

বুঝেছি। তবে তুমি যে এত হিসেবী তা আমি জানতাম না।

বললাম, মেয়েটি এমন করে চলে গেল কেন?

তোমার বোকামীর জন্য।

আমি বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে ও আবার বলল, তুমি সোজাসুজি তার প্রেমিকের আসার খবরটা ঘোষণা করলে তাই ও লজ্জা পেয়ে সরে গেল।

বললাম, আমার যদি কিছু অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে বলব ও আবার ফিরে আসবে এখানে। আমার দেওয়া খবরটা পেয়ে যেমন এখানে থাকতে পারল না বেশিক্ষণ, তেমনি দূরেও সরে থাকতে পারবে না বেশিক্ষণ।

চার্চের ঘড়ির কাঁটা সাড়ে পাঁচটার ঘর ছুঁই ছুঁই এমন সময় সুজন সিং এসে গেল।

এসেই বলল, দোষ নিও না বহুরাণী, বহুৎ দেরী হয়ে গেল।

সেঁজুতি বলল, এমন কিছু দেরী হয়নি, আমরা গল্প করতে করতে সময়ের কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ তুমি যে জন্যে গাড়ি ছুটিয়ে গিয়েছিলে তার কি হল?

সুজন সিং শালগাছের কাণ্ডে দেহের ভর রেখে বলল, বহুরাণী, চিড়িয়া কোন্ বনে ফিরছে হদিস করতে পারলাম না।

সেঁজুতি গলায় বিস্ময় ঢেলে বলল, সে কি কথা সিং সাহেব, পোষমানা চিড়িয়া বুঝি এমন করে পালিয়ে বেড়ায়?

সুজন সিং বলল, বহুৎ ঢুঁড়েছি বহুরাণী। ঘরে কুলুপ লাগায়ে কোন বাজারে মুর্গীর লড়াই দেখতে গিয়ে থাকবে। আমি আসব জানলে বাহির হত না একদম।

সেঁজুতি বলল, এমনও তো হতে পারে, লিজার মিষ্টি হাসি অন্য কেউ চুরি করে দেখছে।

সুজন সিং হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে বলল, তাহলে সুজন সিং বেকার পাঁচ বরষ ধরে বক্সিং লড়েছে। বহুরাণী, লিজার হাসিটাতে আমি আর কাউকে ভাগ বসাতে দিতে পারব না। বরং ওর হাসিটা চিরদিনের মত বন্ধ করে দেব।

সেঁজুতি বলল, তুমি তো বড় সাংঘাতিক লোক দেখছি সিং সাহেব। এমন মিষ্টি হাসি তুমি ঘুষি মেরে বন্ধ করে দেবে!

হা হা করে হাসতে গিয়ে চার্চের কথা ভেবে থেমে গেল সুজন সিং।

বলল, তুমি কি সত্যি আমার কথা বিশোয়াস করলে বহুরাণী? ওকে আমি কি কখনো মারতে পারি!

সেঁজুতি বলল, তুমি সব পার, তোমাকে বিশ্বাস নেই সিংসাহেব, কোন কিছুতে বিশ্বাস নেই।

সুজন সিং হাতজোড় করে দেহটাকে একটুখানি সামনে ঝুঁকিয়ে বলল, মাপ কিজিয়ে বহুরাণী। বান্দা এ্যায়সা বাৎ আউর কভি নেহি বোলেঙ্গে।

সেঁজুতি হেসে বলল, বেশ বেশ, মাপ যখন চাইলে তখন আর শাস্তির কোন প্রশ্নই নেই। বোস এখানে, এবার আমি তোমাকে একঠো মিঠাই খিলাব। এ তল্লাটে সবসেরা মিঠাই।

বলেই সেঁজুতি পায়ে পায়ে চার্চের দিকে চলে গেল।

সুজন সিং আমার পাশে বসে বলল, বহুরাণীর দিল চৌধুরীবাবু একদম সাফ্। বহুরাণীর লিয়ে জান্ দিতে ভি আমি তৈয়ার।

বললাম, আপনার আজ মিঠাইয়ের যোগ আছে সিং সাহেব। দুর্ভোগের পর মিষ্টিযোগটা ভালই হয়।

সুজন সিং বলল, বহুৎ খেয়াল আছে বহুরাণীর। কত খাওয়ায়েছে।

বলেই মাথা নেড়ে নেড়ে হাসতে লাগল।

কতদিন এ বনে কাটল আপনার সিং সাহেব?

একটু ভেবে সুজন সিং বলল, তা ছ'সাত বরষ তো হইয়ে গেল।

আপনার দেশ কোথা সিংজী?

সুজন সিং বলল, একঠাই আমার কোন দেশ নেই চৌধুরীবাবু। আমি ক্ষেত্রী আছি। তিন-চার পুরুষ আগাড়ী দেশ ছিল আমার পাঞ্জাবে। তারপর জয়পুর। সেখান থেকে পিতাজী একটা মাইনের ম্যানাজার হয়ে সিংভূম জিলায় চলিয়ে এসেছিল। এখন আমরা বিহারের মানুষ বলতে পারেন।

বললাম, সংসারে কে আছে আপনার?

বাপের এক লেড়কা আছি আমি। মা আর বাপ—বলে সুজন সিং আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখালে।

বিয়ে করেন নি কেন?

সুজন সিং বলল, প্যার শেষ হল না চৌধুরীবাবু, সাদি করব কাকে?

বললাম, তা প্রেম করে বিয়ে-সাদি করা একদিক থেকে ভাল।

ও বলল, চিনলাম নাই, জানলাম নাই, খপ্ করে হাতখানা ধরে বললাম, চল আমার ঘর। ওতে দিল ভরবে নাই চৌধুরীবাবু। প্যার করলাম, পাবে কি না পাবে তাই লিয়ে কলিজাখান্ একদম টুটাফুটা হইয়ে গেল, হাঁ, সেই আওরৎ জনমভোর দিল খুশ্ করিয়ে দিবে চৌধুরীবাবু। দুখ দিয়েছে, তাই মালুম হবে, হাঁ, জিনে নিলাম বটে।

বললাম, এমন প্যারের খবর আছে নাকি?

সুজন সিং হাসল। ওকে এই প্রথম আওয়াজ না করে বিনীত একটা হাসি হাসতে দেখলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে পায়ের সাড়া পেয়ে পেছন ফিরে দেখি সেঁজুতি

ঐ মেয়েটির হাত ধরে টেনে আনছে।

মেয়েটি বাধা দেবার চেষ্টা করেও হার মানছে বার বার। টুকরো টুকরো হাসির লহর তুলে এসে দাঁড়াল আমাদের পাশে।

সুজন সিং বলল, আরে ব্যস, বহুরাণী, এ তো বহুৎ বড়া মিঠাই আছে।

সেঁজুতি বলল, দেখলে তো, আমি যা বলি তাই করি, মিথ্যে আশা কাউকে দিই না।

সুজন সিং বলল, একবার বেয়াদপি মাফ করতে হবে বহুরাণী। এক ঘণ্টা আউর ছুট্টি মঞ্জুর করিয়ে দাও।

সেঁজুতি বলল, যাচ্ছ যাও, তবে তুমি যে-রকম হুল্লোড়বাজ আছ, মেয়েটাকে যেন আবার কষ্ট দিও না।

বাজপাখির মত ছোঁ মেরে লিজাকে টেনে নিয়ে চলে গেল সুজন সিং। লিজার ক্ষীণ প্রতিবাদ বাজের দৃঢ় নখে বদ্ধ ঘুঘুর মত মনে হল।

একটু পরে গাড়ির গর্জন শোনা গেল, পরমুহূর্তে একটা আলো ঝিলিক দিয়ে অন্ধকার অরণ্যে হারিয়ে গেল।

আমরা সেই বেদীর ওপর আবছা অন্ধকারে পাশাপাশি বসে রইলাম।

বসে থাকতে থাকতে তরল একটা অন্ধকার শীতের বাতাসে ঢেউয়ের মত বইতে শুরু করল। আকাশের দিকে তাকালাম। অগণিত নক্ষত্র শীতের আকাশে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

আমার মনে হল, আমরা যে বেদীটার ওপর বসে আছি সেটা একটা চলমান নৌকো হয়ে গেছে! আমরা সামনের উপত্যকা ভরা অন্ধকারের অগাধ জলরাশি ঠেলে এগিয়ে চলেছি। আমার হাতে ধরা আছে সেঁজুতির হাতখানা। আমরা নির্বাক। এই আশ্চর্য অন্ধকার আমাদের অনেক নিবিড় করে দিয়েছে। আমরা হারিয়ে যাচ্ছি সবার চোখের আড়ালে এক দুস্তর দিকদিশাহীন সমুদ্রের অতল গভীরে।

অন্ধকারে হঠাৎ বেজে উঠল সেঁজুতির গলা। আমার সারা শরীরে রোমাঞ্চ দেখা দিল।

ও বলল, তোমার হাতটা এত গরম আর এমন থরথর করে কেঁপে উঠছে কেন অনির্বাণদা?

হাসির চেষ্টা করে বললাম, কই আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না সেঁজুতি।

তুমি নিজেকে একেবারেই বুঝতে পার না অনির্বাণদা, আমি কিন্তু তোমাকে অনেক বেশী বুঝতে পারি।

বললাম, তোমার কাছে আমার যা ধরা পড়ে, আমি জানি সেটাই আমার আসল পরিচয়।

সেঁজুতি আমার হাত ধরে তেমনি বসে রইল।

একসময় বলল, অনির্বাণদা, অন্ধকার যে এত গভীর, এমন করে বুক ভরে দেয় তা আজ এই নিবিড় বন, উপত্যকা আর আকাশের তলায় না বসলে

বুঝতে পারতাম না। আজ বেশ বুঝতে পারছি, আলো নয়, অন্ধকারই দুটি হৃদয়কে সবচেয়ে বেশী করে পরস্পরের কাছে চিনিয়ে দিতে পারে।

সেঁজুতি কথা বলছিল, আমি কিন্তু একটা ভয়কে আমার মনের ভেতর উঁকি-ঝুঁকি মারতে দেখলাম।

আমার মনের গভীর গহনে যে চিতাটা লুকিয়ে ছিল, সে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল একেবারে নাগালের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকা হরিণটার ওপর। কিন্তু এই রক্তক্ষরা দৃশ্যের ভাবনাটা আমাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলল যে আমি ভয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠছিলাম আর কি! না, গলা দিয়ে আওয়াজটা আর বেরোল না। শুধু সেঁজুতির হাতখানা আরও জোরে চেপে ধরে নিজেকে রক্ষা করলাম।

আমি একটা কথা পরে ভেবেছিলাম, সে রাতে সেঁজুতি আমার এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকেও কিন্তু একটুও সুযোগ কেন গ্রহণ করে নি। সে যে আমাকে সারা মন দিয়ে চায় তা তো আমার অজানা নয়। তবু সেঁজুতি সেই অন্ধকারের ক্ষুধিত মুহূর্তে নিজেকে সংযত রেখেছে। বোধহয় যাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসা যায় তার কাছে ক্ষুধার উলঙ্গ চেহারাটা তুলে ধরতে প্রাণ সায় দেয় না। সে আমার, এই অনুভূতির রোমাঞ্চটুকু দেহ ছাড়িয়ে অনেক গভীরে গিয়ে পেঁছয়।

সেদিন আমি আর সেঁজুতি অনেকক্ষণ বসেছিলাম সেখানে। কথা আমাদের ভেতর খুবই কম হয়েছিল। কিন্তু আমরা দুজনকে অনেক বেশী করে পেয়েছিলাম।

সেখানে বসে থাকতে থাকতে সেঁজুতি একসময় বলল, চার্চের দিকে তাকিয়ে দেখ, পাহাড়ের উঁচুতে যে ঘরখানায় ফাদার থাকেন সেটা থেকে ক্ষীণ একটা আলোর রশ্মি বেরিয়ে আসছে। উপত্যকার ওপার আর আশ-পাশের পাহাড়গুলো থেকেও ফাদারের ঘরের ঐ আলোটুকু দেখা যায়।

বললাম, চল না একবার ফাদারের সঙ্গে দেখা করে আসি।

সেঁজুতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, খুব ভাল মানুষ ফাদার বার্নার্ড। আশী বছরের বৃদ্ধ, মুখে হাসিটি লেগে আছে সারাক্ষণ।

আমরা পায়ে পায়ে চার্চের দিকে এগিয়ে চললাম। সেঁজুতি আগে আগে আমার হাত ধরে চলল তার চেনা পথে।

আমরা পাহাড়ের গায়ে কাটা সিঁড়ি বেয়ে অতি সাবধানে অনেক ওপরে উঠে এলাম। হাতল শক্ত না হলে সেই অন্ধকারে এত ওপরে ওঠা অসম্ভব হত।

ফাদারের ঘরের দরজা ভেজান ছিল। হাত লাগাতেই খুলে গেল। অমনি ঘরের ভেতরের আলোটা ছাড়া পাওয়া সোনালী ডানার চিলের মত উড়ে গিয়ে বসল পাশের ন্যাড়া পাহাড়ের একটা উঁচু খাঁজে।

ভেতরে ফাদার বসে আছেন। টেবিলের ওপর আলো, আলোর সামনে বিরাট আকারের একখানা বই খোলা। নিবিষ্ট মনে অশীতিপর এক বৃদ্ধ

আশ্চর্য মগ্নতায় ডুবে গেছেন। তাঁর পেছনের দেয়ালে যীশুখৃষ্টের ছবি। স্বল্প আলোয় মনে হচ্ছিল যীশু নিবিষ্ট ভক্তের দিকে করুণার দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন।

সেঁজুতি ফাদারের সামনে গিয়ে মাথা নত করে দাঁড়াল। আমিও তার দেখাদেখি তাই করলাম।

ফাদার পায়ের সাড়া পেয়েছিলেন। মুখ তুলে তাকালেন। কুঞ্চিত দুটি চোখের দৃষ্টি আমাদের ওপর ফেলে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

আমি তাকিয়েছিলাম তাঁর প্রশান্ত আনন্দময় মুখখানার দিকে।

সেঁজুতি বলল, আমি ফরেস্ট রেঞ্জার মিঃ ভট্চাযের স্ত্রী সেঁজুতি, ফাদার। কলকাতা থেকে আমার শিল্পী বন্ধুটি এসেছে, তাকে আপনার কাছে নিয়ে এলাম। ও আপনার আশীর্বাদ চায়।

ফাদার উঠে দাঁড়িয়ে হাতখানা আশীর্বাদের ভংগীতে একটুখানি তুললেন। তারপর আমাদের দুজনকে সামনের আসনে বসতে বললেন।

আমরা বসলে তিনি সেঁজুতির দিকে চেয়ে বললেন, মিঃ ভট্চাযের কুশল তো?

সেঁজুতি বলল, প্রভুর কৃপায় সব খবরই ভাল।

এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বল কেমন লাগছে?

বললাম, বন আমার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। আজ আপনার এখানে এসে বন, পাহাড়, নদী আর উপত্যকার ছবি একসঙ্গে দেখলাম। এ আমার জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা সন্দেহ নেই।

ফাদার বললেন, ঈশ্বর এখানে সহজেই প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেন। ভোরবেলা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাহাড় পেরিয়ে নেমে আসেন বনে। বনের সবুজ ছুঁয়ে পশুপাখি মানুষজনকে জাগিয়ে ঐ কারো নদীর স্রোতে স্নান করেন। আমি আমার জানালা খুলে ভোরের দেবতাকে দেখতে পাই।

উনি যখন কথা বলছিলেন আমি আশ্চর্য হয়ে ওঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল ফাদার এই যে তাঁর প্রভাতের অনুভূতিটুকু প্রকাশ করলেন, এখানেই দেবতার জন্ম হল। মানুষের শ্রেষ্ঠ অনুভূতিগুলিই দেবতার আকার নিয়ে আমাদের মনকে অভিভূত করে।

সেঁজুতি বলল, ফাদার, এত ওপরে উঠতে আবার প্রার্থনার ঘরে নামতে আপনার কষ্ট হয় না।

আশী বছরের বৃদ্ধ ফাদার হাসলেন। দন্তহীন মুখের নির্মল হাসি।

বললেন, আমার এই ঘর থেকে পঞ্চাশটি বছর ধরে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দেখছি। প্রভুর মহিমাকে আর কোথা থেকে এমন করে দেখতে পাব বল। চোখের আলো নেভার আগে পর্যন্ত আমি এখান থেকে ঐ উপত্যকা, বন, পাহাড়, নদী, সূর্যোদয় সূর্যাস্ত সব কিছু দেখে নিতে চাই।

একটু থেমে আবার বললেন, নীচে নামার কথা বলছ। ওখানে যে প্রার্থনার ঘর। প্রভুকে নীচে নেমে নত হয়ে প্রার্থনা জানাতে হয়। ওঠা

নামার কষ্টটুকু আমার আনন্দ দিয়ে ভরিয়ে তুলি।

সেঁজুতি বলল, কি পড়ছিলেন ফাদার ?

ফাদার একটু হেসে বললেন, এ কোন ধর্মগ্রন্থ নয়, এ বইখানা এক নাবিকের ডায়েরী। এই বইটি পড়েই আমি ঘর ছেড়েছিলাম। সঙ্গে অবশ্য বইটিকে আনতে ভুলিনি। প্রতিদিন এই বই-এর কয়েকটি করে পাতা আমি পড়ি।

বললাম, আপনার একটুখানি পড়ে শোনাতে কি খুব কষ্ট হবে ফাদার ?

বললেন, এটা আনন্দের ব্যাপার। আর যা কিছু মহৎ, যা কিছু প্রেরণা দেয় তা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়।

উনি একটুখানি পড়লেন নাবিকের ডায়েরী থেকে।

খৃষ্টাব্দ ১৮৬২, ৯ই জুন।

এইমাত্র ঝড় থেমে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের উদ্বেগও। একটি তরুণী মা তাব শিশুটিকে নিয়ে ডেকের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে আকাশ এতক্ষণ ভয় দেখাচ্ছিল সে এখন শান্ত। দুটো সমুদ্র সারস সাদা ডানা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছে। আগে যেখানে ছিল ভয়ংকর সেখানে এখন সুন্দর হাসছে। যেন সাজ খুলে ফেলে ভয়ংকর হয়েছে সুন্দর। ঢেউগুলো এখনও উত্তাল। যে দোলা দিয়েছিল সে ঝড়ের বাতাস থেমে গেছে, কিন্তু জলের বুকে এখনও স্মৃতির আলোড়ন থামেনি।

তরুণী মা বুকের শিশুটিকে নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। মাথা নত করে অভিবাদন জানাল।

ঝড়ের সময় মেয়েটি ভয়ংকর কিছু পরিণতির কথা ভেবেছিল নিশ্চয়ই, আর সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছিল তার শিশুপুত্রকে। আমি নিশ্চয় অনুমান করতে পারি শিশুটিকে স্পর্শ করে সে নিজের মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়েছিল। শুধু কাতর হয়ে পড়েছিল তার শিশুর কথা ভেবে।

মেয়েটি কৃতজ্ঞতার সুর ঢেলে বলল, ক্যাপটেন, আপনার চেষ্টা আর অভিজ্ঞতা আজ জাহাজের এতগুলি প্রাণকে রক্ষা করেছে।

বললাম, নোয়ার জাহাজকে ঈশ্বরই রক্ষা করেছিলেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাও।

আর তোমার বুকের শিশুটিকে দেখ, কত নিঃশংক। তুমি যখন প্রাণের ভয়ে কাতব হযে ওকে জড়িয়ে ধরেছিলে তখন তোমার ঐ শিশু তার মায়ের বুকে পরম নিশ্চিন্ততার আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল।

ভয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক আচরণ আর বুদ্ধিকে স্থির রাখতে পারলে অনেক সময় ভয়ংকর আমাদের তেমন করে ভয় দেখাতে পারেনা।

আরও অনেকে দল বেঁধে এলেন। আমাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলেন।

ওঁরা চলে গেলে ওদের দেওয়া সবটুকু কৃতজ্ঞতা আমি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে দিলাম।

আমার জাহাজের যাত্রীরা এখন বুক ভরে শান্ত বাতাস টেনে নিচ্ছে।

রোদ্দুরে স্নান করছে। আর নীল সমুদ্রের ঢেউ নিঃশঙ্ক মনে উপভোগ করছে।

খৃষ্টাব্দ ১৮৬২, ১৭ই জুলাই।

বন্দরে আজ তিনদিন আমার জাহাজ নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে ছিল। যাত্রীরা ওঠা নামা করেছে। যারা নেমে গেল এ বন্দরে, তাদের প্রিয়জনেরা জাহাজঘাটে খুশীতে জড়িয়ে ধরেছে তাদের। যারা নতুন যাত্রী তাদের বিদায় দেবার জন্য এসেছে অনেকে। জাহাজ ছাড়ার বাঁশী বাজলে ওদের অনেকেই রুমাল নাড়ছে, কেউ কেউ ঐ রুমালে মুছছে উদ্গত চোখের জল।

আমার বন্দরের বাঁধন খুলল। জাহাজ এগিয়ে চলেছে। দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে বন্দরের ছবি। মাছ ধরার নৌকোগুলো পালে বাতাস ভরে নিয়ে সমুদ্র চষে বেড়াচ্ছে।

জাহাজ এখন চলেছে কূলহারা সমুদ্রে। কিন্তু ঠিক এই সময়টিতে যখন সমুদ্রের ঢেউ-এর সঙ্গে আকাশের আলো হীরে-ছড়ানো খেলা খেলছে, তখন আমার মনে হচ্ছে, কেউ নেমে যায় না অথবা কেউ উঠে আসে না। যাত্রীদের এই ওঠা নামা, হাসি কান্না একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একটি আর একটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এই সমুদ্রের অগাধ কান্না আর আকাশের অফুরন্ত হাসির মিলনের মত।

যাত্রীরা বসে বসে দেখছে, হাঙর ঝাঁক বেঁধে চলেছে জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে তারা চলেছে। যাত্রীদের মনে ঐ হিংস্র হাঙরগুলো সম্বন্ধে কোন ভয় নেই। দূরত্ব তাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছে।

ভয় অথবা অন্যায় যা কিছু আমার মনকে আঘাত করে এমন বস্তু থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখতে পারলে আর কিছু ভাবনার থাকে না।

আমার এই জাহাজে অনেক অনেক যাত্রী রয়েছে। এদের কেউ ডাক্তার, কেউ শিক্ষক, কেউ চাকুরে, কেউ বা আবার ব্যবসায়ী। এদের বৃত্তি, মনের গঠন সবই আমরা আলাদা আলাদা বলে জানি। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে ওরা আলাদা নয়, ওরা যাত্রী। ওরা ঝড়ের সংকেত পেলে একই সঙ্গে প্রাণভয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে থাকে। আবার দিনটি সুন্দর আর উজ্জ্বল হলে একই সঙ্গে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানায়।

আমরা যখন নিজের ঘরে বা গ্রামে শহরে থাকি তখন আমরা নিজেদের মনটাকে ছোট ছোট ভাগে বিচ্ছিন্ন বিভক্ত করে কাজে লাগাই। কিন্তু যখন এই সমুদ্রের মত অনেক বড় জায়গায় এসে পড়ি তখন আমাদের ঐ টুকরো টুকরো মনগুলো এক হয়ে যায়।

তাই এই সমুদ্র, এই আকাশ, এই আলোহাওয়ার খেলায় আমি মেতে আছি। এখানে আমি প্রতিদিন ঈশ্বরের দেখা পাই। সব বিচ্ছিন্নতাকে তিনি এক করে দেন।

পর পর ডায়েরীর পাতা থেকে এ দুটি অংশ পড়ে বৃদ্ধ যাজক নীরব হলেন।

এক সময় মাথা তুলে বললেন, এমনি অজস্র অনুভূতিতে ভরা এই বই-এর পাতাগুলি। কেবল প্রকৃতির বিরাট রূপের কথাই যে এর ভেতর বলে গেছেন ক্যাপটেন তা নয়, ছোট ছোট অনেক ঘটনার ভেতর দিয়ে জীবনের বিচিত্র উপলব্ধির কথা নানাভাবে বলেছেন। একটি খৃষ্টান মিশন তার কর্মীদের, জীবন বা ঈশ্বর সম্বন্ধে যে শিক্ষা দিতে পারে না, এই ভেসে চলা জীবনের নাবিক তার এই সামান্য ডায়েরীতে তার চেয়ে অনেক মূল্যবান অনুভূতির কথা জানিয়েছেন। বাইবেলের পরেই আমার মনে এই বইখানি স্থান জুড়ে আছে।

আমরা একসময় ফাদারের কাছে বিদায় নিয়ে নীচে নেমে এলাম। নামতে নামতেই সুজন সিংয়ের জীপের আওয়াজ পেয়েছিলাম। হর্নটা পাহাড় আর বন কাঁপিয়ে বেজে উঠেছিল।

জীপের কাছে এগিয়ে যেতেই সুজন সিং সকৌতুকে বলল, তোমরা আমাকে ভাবনায় ফেলে দিয়েছিলে বহুরাণী। আঁধারে তোমাদের না দেখে ভাবলাম, রেঞ্জার সাহেব এসে হয়তো তোমাদের লিয়ে চলে গিয়ে থাকবে।

সেঁজুতি বলল, এসেছি তোমার সঙ্গে আর নিয়ে যাবে রেঞ্জার, এ কথা তুমি ভাবলে কি করে? এত মেহনত তোমাদের রেঞ্জার সাহেবের কি পোষাবে?

সুজন সিং বলল, আবার ভাবলাম বহুরাণীকে বাঘে লিয়ে যায় নাই তো?

সেঁজুতি হেসে বলল, আমাদের এই আর্টিস্ট বন্ধুটি বাঘ বশ করার মন্ত্র জানে। তাই ভয়ে বাঘ আর কাছে ঘেঁষবার সাহস পায় নি। কিন্তু লিজাকে যে বাঘটা ঘিরে ধরেছিল, তার হাত থেকে মেয়েটা ছাড়া পেয়েছে তো?

সুজন সিং বলল, সে বাঘটা বহুৎ লোভী না আছে বহুরাণী। সে মানুষ খায় না, মানুষ লিয়ে খেলা করে।

সেঁজুতি আর আমি সুজন সিংয়ের গাড়িতে উঠে পড়লাম। গাড়ি গর্জন করতে করতে বন-পাহাড় কাঁপিয়ে ছুটে চলল।

কত দূর পথ পার হয়ে এলাম তা বোঝার উপায় নেই। যেখানে আলো ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেখানে বনের নিবিড় গাছপালার ছবি ফুটে উঠছে। পেছনে তাকিয়ে থাকলে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

অনেক পথ পেরিয়ে, হাজার বাঁকের মুখে টাল সামলে আমরা একটা নদীর ধারে নেমে এলাম। শীতের নদী শীর্ণা। অগাধ নুড়ি বিছানো নদী। ঝির ঝির করে জলস্রোত বয়ে চলেছে। সুজন সিং নদীটার ওপর দিয়েই গাড়ি চালিয়ে দিল।

বলল, কালভার্টের ওপর দিয়ে যেতে হলে অনেক ঘুরে যেতে হবে, তাই নদীর ওপর দিয়ে শর্টকাট করে লিচ্ছি। বর্ষার দিন হলে উসুরিয়া নদী শের কা মাফিক লাফ মেরে চলত। শীতে একদম কাহিল, তোমার এ বান্দার

চেয়েও কাহিল বহুরাণী।

সেঁজুতি ফোঁস করে উঠল, সুজন সিং কাহিল, তাহলে সারান্দা বনের সবগুলো বাঘ বেড়াল হয়ে গেছে।

হা হা হা হা করে হাওয়া ফাটিয়ে হাসল সুজন সিং।

কিন্তু এ কি হল! সুজন সিংয়ের হাসি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

গাড়ি আর নড়ছে না। নদীর মাঝ বরাবর এসে একদম দাঁড়িয়ে গেল।

লাফ দিয়ে নেমে পড়ল সুজন সিং। হাত দিয়ে স্রোতের বেগ ঠাহর করে বলে উঠল, না ডর করবার কিছু নাই। কিন্তু বহুরাণী বিপদ ঘটল।

আমরা ভয় পেলাম। সেঁজুতি বলল, কি বিপদ? গাড়ি হঠাৎ থেমে গেল কেন?

নীচ থেকে সুজন সিং বলল, পেট্রোল খতম হইয়ে গেছে, গাড়ি আর চলবে নাই।

আতঙ্কে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সেঁজুতি, কি বলছ সিং, এখন উপায়?

সুজন সিং যা বলল তার মর্মার্থ হল, সে দরকার মত পেট্রোল নিয়েই বেরিয়েছিল, কিন্তু লাইটার জ্বালাবার জন্যে লিজার ঘরে সে পেট্রোলের টিনটা একবার নামিয়েছিল, গাড়িতে ওঠাবার কথা বেমালুম ভুলে গেছে।

এখন উপায়! সারারাত এই নির্জন জায়গায় অন্ধকারে অচল গাড়িখানা আগলে বসে থাকা! জন্তু-জানোয়ারের কথা ভাবলে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে বরফের মত।

সুজন সিং হেঁকে উঠল, কুছ ডর নেই বহুরাণী। থলকোবাদের বাংলো ইখান থেকে দো-মাইলটাক পথ আছে। ওখানে ভট্চায সাহেবের গাড়ির পেট্রোল আছে। আমি পাহাড় ডিঙায়ে যাবে আর আসবে ব্যস্। চৌধুরী-বাবু আছেন, মাৎ ডরো বহুরাণী।

জলের ওপর দিয়ে ছপ্ ছপ্ আওয়াজ করতে করতে সুজন সিং একটা বুনো জন্তুর মত উসুরিয়া নদীটা পার হয়ে গেল।

সুজন সিং আমাকে মহা সাহসী পুরুষ মনে করে সেঁজুতিকে রক্ষার ভার দিয়ে গেলেও আমি এ মহারণ্যে বহমান নদীর ওপর অসহায়ের মত বসে রইলাম।

দুজনের কারো মুখে কথা নেই। সেঁজুতি আমার গা ঘেঁষে বসে আছে।

এতক্ষণ গাড়ি চলছিল, কথা হচ্ছিল, তাই নদীর শব্দটাও তত স্পষ্ট ছিল না, এখন জলপ্রবাহের আওয়াজটা বেশ জোরাল হয়েই কানে বাজতে লাগল।

সেঁজুতি প্রথম কথা বলল, কি দুর্ভোগেই না পড়া গেল!

বললাম, দুর্ভোগ বলেই বা ভাবছ কেন, এটা একটা দারুণ রকম অ্যাডভেঞ্চার।

ও আর কোন কথা বলল না। আমার আরও কাছে ঘেঁষে বসল।

আমার মানসিক অবস্থা যে সেঁজুতির চেয়ে ভাল ছিল তা নয়, কিন্তু ওকে

সাহস দেবার জন্যেই কথাগুলো বললাম।

আমার দৈহিক শক্তি কিংবা মানসিক শক্তি কোনটারই ঘাটতি ছিল না, কিন্তু নৈশ প্রকৃতির এই ভয়াল আয়োজনের কাছে আমাদের সব আস্ফালনই নিষ্ফল।

ছপ্ ছপ্ আওয়াজ করতে করতে কারা সব যেন নদী পার হয়ে চলেছে। আমরা দুটিতে রুদ্ধশ্বাসে বসে আছি। বেশ খানিকক্ষণ ঐ শব্দটা শোনা গেল। বোধহয় কোনো জানোয়ারের একটি দল অন্ধকার এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চলেছে। পায়ের শব্দে বোঝা গেল খুব ছোটখাট কোন জন্তু নয়, ভারী কোন জানোয়ার।

সেংজুতির সমস্ত দেহখানা প্রায় আঠার মত জড়িয়ে আছে আমার দেহের সঙ্গে। ও যে বেশ ভয় পেয়েছে তা ওর নিশ্বাস থেকে আর আমাকে এমন করে জড়িয়ে ধরার ভঙ্গীটা থেকেই বুঝতে পারছি।

ওদের চলে যাবার পর আবার নদীটার কল কল ছল ছল শব্দ শোনা গেল।

সেংজুতি শুকিয়ে আসা গলার আওয়াজে বলল, কি সব পার হয়ে গেল অনির্বাণদা!

বললাম, এমন কিছু নয়, এই বাইসন টাইসন কিছু একটা হবে আর কি।

যেন বাইসন আমার ঘরের গোয়ালে বাঁধা পোষমানা শান্তশিষ্ট গরু, বড় বড় ডাগর চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। গলকম্বলে হাত দিলে গলাটা তুলে ধরে আরও আদরের আশায়।

ওকে সাহস দিতে গিয়ে আমি নিজেই যেন সাহসী হয়ে উঠলাম।

আবার বললাম, জন্তু-জানোয়ার থেকে ভয়ের কিছু নেই। ওদের না ঘাঁটালে ওরাও তোমাকে কিছু বলবে না। বাঘের বেলাতেও ঠিক তাই, তবে ম্যানইটার হলে আলাদা কথা।

মানুষখেকো বাঘের প্রসঙ্গে সেংজুতি যে একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছে তা বোঝা গেল ওর হাতের চাপ দেখে।

আমি বললাম, দেখ সেংজুতি, ভাগ্যিস আমাদের গাড়িখানা গভীর বনের ভেতর থেমে যায় নি, তাহলে বুনো জানোয়ারের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করাই দায় হত। এখানে ফাঁকা জায়গা, তার ওপর নদীর মাঝামাঝি রয়েছি। ভয় বলতে যা বুঝি, ভেবে দেখতে গেলে তার কিছুই প্রায় এখানে নেই।

সেংজুতি মনে হল একটু আশ্বস্ত হয়েছে। ও বলল, জলে যা ঠাণ্ডা, পা পড়লেই কাহিল। মনে হয় প্রয়োজনে নদী পার হলেও খুঁজে-পেতে কোন জানোয়ার আমাদের গাড়ির কাছে আসবে না।

বললাম, পাগল হয়েছ, শীতের ভয়টা কার নেই শুনি। আমরা দিব্যি নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারি।

ঠিক এমনি সময় একদল শেয়াল বিচ্ছিরি রকম হেঁকে হেঁকে ডাকতে লাগল। রাত্রির নিঝুম নৈঃশব্দের ভেতর ওদের ডাক বড় সাংঘাতিক রকম

বুকে এসে বাজতে লাগল। দুপুরে নদী পেরোবার সময় নদীর ধারে অজস্র বনঝাউ আর সাবাই ঘাসের জঙ্গল দেখেছিলাম। ওরা নিশ্চয়ই ঐসব ঝোপঝাড়ের ভেতরে অথবা নদীর ধারের বড় বড় পাথরের গর্তে থাকে। ওরা বনেই থাক আর লোকালয়েই থাক, ওদের প্রহরে প্রহরে ডাক বাঁধা বরাদ্দ।

আমরা কতক্ষণ এমনি আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম।

একঝাঁক জোনাকী একটু দূর দিয়ে ওপরে নীচে নাচের খেলা দেখাতে দেখাতে চলে গেল।

ওদের আজ কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হতে লাগল।

অনেক দূরে কি একটা জানোয়ার হঠাৎ ডেকে উঠল। তারপর আর কতকগুলো আর্ত চীৎকার শোনা যেতে লাগল। গায়ের রক্ত যেন জল হয়ে আসে।

সেঁজুতি এখন আমার একখানা হাতের ভেতর দিয়ে তার মাথাটা গলিয়ে নিয়ে ঐ হাতখানাই বুকে চেপে ধরে বসে আছে।

আমি এখন নির্বাক। একটু পরেই আবার ছপ্ ছপ্ শব্দ শুনে কান খাড়া করে রইলাম। বুকের ভেতর কে যেন দুর্মুশ করছে।

মনে হল এই ছপ্ ছপ্ আওয়াজটা এক একবার শোনা যাচ্ছে আবার থেমে যাচ্ছে। কখনও বা শব্দটা এলোমেলোভাবে কাছে দূরে বাজছে।

তাহলে কোন জানোয়ার কি গন্ধ পেয়েছে। মানুষের গায়ের বা রক্তের গন্ধ শুঁকে শুঁকে অনেক হিংস্র জন্তুকে শিকারীদের তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসতে শোনা যায়।

যে-কোন রকম পরিণতির কাছে আত্মসমর্পণের আগে একবার আঘাত হানার জন্যে একটা কিছু হাতিয়ার পাওয়া যায় কিনা হাতড়াতে লাগলাম।

সুজন সিংয়ের সীটের পাশ থেকে লোহার হ্যাণ্ডেলটা বেরুল। আমি যেন দারুণ একটা শক্তির সন্ধান পেয়েছি, এমন মনে হল আমার। শক্ত হাতে লোহার হ্যাণ্ডেলখানা চেপে ধরলাম।

ছপ্ ছপ্ শব্দটা ক্রমে এগিয়ে এল আমাদের গাড়ির দিকে। আমি সেঁজুতিকে বললাম, কোন ভয় নেই, আমাকে জড়িয়ে ধোরো না, আমার পেছনে বসে থাক।

জীপের পেছনে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, একটা নয়, কালো কালো দুটো জানোয়ার এগিয়ে আসছে।

জীপে বসে হাত ঘুরিয়ে ওদের আঘাত করা অসম্ভব ভেবে নিয়ে আমি জীপ থেকে নীচে নুড়িপাথরের ওপর নেমে পড়লাম। মুহূর্তে জীপের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম।

ফিস ফিস করে সেঁজুতিকে অভয় দিয়ে বললাম, চুপচাপ বসে থাক, কিছু ভেব না। ওরা ভেতরে থাবা অথবা মুখ বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওদের প্রচণ্ড বেগে আঘাত করব।

এক একটি মুহূর্ত আমি গুণে চলেছি। আমার হাতে যেন অসুরের

শক্তি নেমে এসেছে। মরবার আগে শেষ কামড় দিয়ে দেব।

ওরা গাড়ির সামনের দিকে এল। আমি মুহূর্তে লোহার ডাণ্ডা তুলে ঘুরে দাঁড়ালাম।

কথা বলে উঠল জানোয়ার দুটো, আর সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল সেঁজুতি। আমি হকচকিয়ে গেলাম।

অনির্বাণদা মেরো না মেরো না, এরা এই বনের লোক। এরা আমাদের খোঁজে এসেছে।

আমি প্রায় লাফ দিয়ে ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

অন্ধকারে এখন দেখা যাচ্ছে ওদের। দুজনের হাতেই তীর আর ধনুক। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। রাতের অন্ধকারে ভয়ানক কিছু একটা মনে হচ্ছে ওদের।

সেঁজুতি কলবলিয়ে কথা বলে চলল ওদের সঙ্গে। বলতে বলতে জীপ থেকে নীচে নেমে পড়ল।

আমি ওদের কথার একবর্ণ অর্থও উদ্ধার করতে পারলাম না।

ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সেঁজুতি এক সময় আমার দিকে ফিরে বলল, সুজন সিং থলকোবাদের বাংলোয় যাবার পথে এদের এখানে আমাদের দেখবার জন্য বলে দিয়ে গেছে।

বললাম, এরা কারা এবং কোথায় ছিল এত রাতে?

সেঁজুতি বলল, এরা হো। সামনে যে ডুংরি আছে তার কোলে এরা দু'তিন ঘর ঝোপড়া তুলে বসবাস করছে।

বললাম, সুজন সিং এত রাতে একাই বাংলোতে গেল, না আর কাউকে সঙ্গে নিয়েছে?

সেঁজুতি আবার ওদের সঙ্গে ওদের ভাষাতেই কথাবার্তা বলতে লাগল।

আমাকে এক সময় বলল, ডুংরি পেরিয়ে একাই গেছে ওপারের বাংলোতে।

বললাম, ডুংরিটা কি?

সেঁজুতি বলল, ছোট পাহাড়। খুব বেশি উঁচু নয়। তাহলেও ও পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে হিম্মতের দরকার! বিশেষ করে এই রাতের বেলা পাহাড়ী মানুষগুলোও দল বেঁধে পেরোতে পারে না।

হো-দের সঙ্গে সেঁজুতি আবার কথা বলল। বেশ কিছু সময় ধরে কথা চলল ওদের ভেতর।

এক সময় আমার দিকে ফিরল সেঁজুতি। বলল, এরা সুজনের সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু সুজন নাকি এদের পাত্তাই দেয়নি। এখানে এদের আসতে বলে সে পাহাড় ডিঙিয়ে চলে গেছে।

ভয় নাকি ডুংরির এপারে বিশেষ নেই, ওপারে খানিক পথ জঙ্গল হাতড়ে যেতে হবে।

সেঁজুতি ওদের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলল। ওরা দু'একটা কথা বলে নদী পেরিয়ে বেশ খানিকটা চলে গেল।

আমি বললাম, ওদের জীপের সামনে বসতে বললে না কেন ?

সেঁজুতি আমার হাত ধরে বলল, ঠাণ্ডা জলে পা দুটো যেন অসাড় হয়ে গেছে, চল উঠে বসি।

আমি আর একটিও কথা না বলে জীপের ওপর উঠে পড়লাম, সঙ্গে সঙ্গে সেঁজুতির হাত ধরে টেনে নিলাম।

জীপে উঠে বসে ও বলল, ওদের আমি বসতেই বলেছিলাম, কিন্তু রেঞ্জার সাহেবের বউয়ের পাশে ওরা বসবে কোন সাহসে। তাই একটু তফাতে থেকেই ওরা আমাদের পাহারা দেবে।

এখন আমরা নিশ্চিন্তে বসেছি, পরম নিশ্চিন্তে। ও আর এখন আমাকে জড়িয়ে বসে নেই, শুধু হাতটা তুলে নিয়েছে ওর হাতে।

এক সময় বলল, ভাগ্যিস চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, না হলে তোমার ঐ লোহার রডখানাতে ফেটে চৌচির হয়ে যেত ওদের মাথা।

হেসে বললাম, নিজের মাথা বাঁচাতে চিরদিন অন্যের মাথা ফাটাতে হয়। এটাই দুনিয়ার নিয়ম।

ও আমার হাতটা নাড়া দিতে দিতে বলল, খুব বীরপুরুষ হয়েছ যা হোক, খুব বীরপুরুষ হয়েছ।

বললাম, মরবার জন্যে আমি তৈরিই হয়েছিলাম সেঁজুতি। তবে মরার আগে যমদূতকে মারতে চেয়েছিলাম মোক্ষম ঘা।

সেঁজুতি বলল, খুব আফসোস থেকে গেল তো ? একদিন কোন রাতের অন্ধকারে আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব তোমার খোলা দরজার সামনে, তখন আমাকে মেরেই না হয় আজকের আক্ষেপটা মিটিও।

বললাম, তার আগে ঐ চেনা জন্তুটি আমাকে খেয়ে ফেলুক এই প্রার্থনাই জানাব বনের দেবতার কাছে।

ওর মুখে হাসির কলধ্বনি বেজে উঠল। উসুরিয়া নদীর জল-ছল-ছল শব্দের সঙ্গে তার কি অদ্ভুত মিল। আমার মনে হল, এ রাতের বুকে ও শুধু এক নারী নয়, একটি প্রবাহিনী নদী। দূরে তাকিয়ে দেখলাম নদীর তীরে লাল লাল দুটো চোখ দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। সেদিকে সেঁজুতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই ও একটুক্ষণ মুখটা বের করে দেখল। তারপর খিল খিল করে হেসে উঠে বলল, ওখানে রয়েল বিহার টাইগার কটমট করে আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে।

আমি তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি, তবে তার যে বিশেষ গুরুত্ব নেই তা বুঝতে পারলাম।

সেঁজুতি আমাকে ঠেলা দিয়ে বলল, সুজন সিংয়ের নিযুক্ত প্রহরীরা শীতের রাতে নদীর ধারে বসে শালপাতার চুট্টা টেনে গা গরম করছে।

রাতের ঘন অন্ধকারে ওদের ধূমপানের আগুন কোন অজ্ঞ মানুষকে যে বিভ্রান্ত করে দেবে তাতে সন্দেহ কি। সত্যি, লাল লাল দুটো চোখ দপ দপ করে জ্বলে জ্বলে উঠছে ঘোর অন্ধকারে।

বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল সুজন সিংয়ের ফিরে আসতে। আমরা গাড়িতে বসে বার বার তার কথাই বলছিলাম। মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম সুজন সিং যেন নিরাপদে ফিরে আসে।

ও এসেই প্রথমে ছুটি করে দিল ঐ দুটি প্রহরীর। সীটের নিভৃত স্থান থেকে একটি বোতল টেনে বের করে দিয়ে দিল ওদের পুরস্কার। ওরা খুশি হল কিনা অন্ধকারে মুখ দেখে বোঝা না গেলেও জলের ওপর দিয়ে যেভাবে দৌড়ে চলে গেল তাতে বুঝলাম, এ সুধা ওদের কাছে মহামূল্য ধন! প্রায় অপ্রাপ্যনীয় বস্তুর সামিল।

সুজন সিং এবার গাড়িতে পেট্রল ঢেলে উঠে বসল। গর্জন করে গাড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে নদী পার হয়ে গেল।

আমরা এতক্ষণ প্রায় কোন কথাই বলতে পারিনি ওর সঙ্গে। এখন ও নিজেই কথা বলল, আমার বেয়াকুবির ফলে আপনাদের বহুৎ তকলিফ পেতে হল চৌধুরীবাবু।

বললাম, এমন ভুল মানুষের হয়েই থাকে সিংজী। এ আর এমন কি ভুল, পরের বৌকে মানুষ ভুল করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে হরদম।

সুজন সিং হাসতে জানে যথাস্থানে। আবার সেই ঠা ঠা করে রাতের পশুপাখিদের ঘুম ভাঙানো হাসি।

সেঁজুতি বলল, অনির্বাণদার মুখে দেখছি কিছুই আটকায় না।

সুজন সিং বলল, গোসা করছ কেন বহুরাণী! চৌধুরীবাবু সাচ্ বাতই বলছে।

সেঁজুতি অন্ধকারে আমার হাতে একটা চিমটি কাটল।

আমি বললাম, এতক্ষণে সিংসাহেবকে ঠিক মুডটিতে পাওয়া গেল।

সুজন সিং বলল, হরবখত আমার দিল সাফ আছে চৌধুরীবাবু। কুছ ডর, কুছ তকলিফ আমার নাই। হাঁ, খালি এক ডর। লিজা হাত ছুট না হইয়ে যায়।

পুরো একটি মাস এ বনে আমার কেটে গেল। বেশ বুঝতে পারছি ধীরে ধীরে বন আমাকে গ্রাস করছে। এখন প্রায় প্রতিদিন ভোরের জলযোগের পর আমাদের বাংলোর সামনে এসে দাঁড়ায় সুজন সিংয়ের গাড়ি। আমি ঐ গাড়িতে উঠেই বেরিয়ে পড়ি বনের পথে। কখনো বা হাটে, কখনো বা নদীর ধারে।

সুজন সিং আমার খুশিমত জায়গায় আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। আমি আশ মিটিয়ে ছবি আঁকি। সেঁজুতি টিফিন কেরিয়ারে ভরে দেয় প্রচুর খাবার। একা একা, কোনদিন বা সুজন সিংকে সঙ্গে নিয়ে দুপুরে নদীর ধারে গাছতলায় বসে সে খাবারগুলো তারিয়ে তারিয়ে খাই। মাঝে-মধ্যে সেঁজুতি হয় আমাদের সঙ্গী। সেদিন দুজনেই ছবি আঁকি। সুজন সিং চোখ বড় বড় করে দেখে তার বহুরাণীর কৃতিত্ব।

এক একদিন পিকনিক চলে আমাদের। রান্নাবান্নায় মেতে উঠি আমরা।

পিকনিকের দিন খুশী হয়ে সব খরচ দেয় সুজন সিং। প্রতিবাদ করতে গেলেই অনাসৃষ্টি। সুজন বলে, আজ থেকে তোমার আমার দোস্তি খতম চৌধুরী!

ইতিমধ্যে আমরা ঘনিষ্ঠ হয়েছি। 'আপনি'র পোশাকী সাজটা খুলে ফেলে এখন 'তুমি'র আটপৌরে সাজটা দুজনেই তুলে নিয়েছি। যত সুজনের সান্নিধ্যে আসছি ওর চরিত্রের অদ্ভুত কতকগুলো দিক ততই আমার কাছে আশ্চর্যভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ও মদ খায়, মাত্রা ছাড়িয়ে মদ খায়, কিন্তু মাতাল হতে দেখিনি ওকে। আবার নতুন ইজারা নেবার জন্যে ও অফিসারদের পার্টি দেয়, প্রচুর টাকা ছড়ায়। এদিকে কুলি-কামিনদের ও দেবতা। তাদের সুযোগ-সুবিধার দিকে সুজনের কড়া নজর। শুধু কাজের ব্যাপারেই নয়, কাজের বাইরে ঘর-সংসারের ঝগড়াঝাটি মেটাতেও সুজনকে হাজির থাকতে হয়।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটল। একটি হো-মেয়ে কাজের শেষে রাতে ঘরে ফিরল না। তার স্বামী আগে কি একটা অসুখে মারা গিয়েছিল। একটিমাত্র মেয়ে ছিল তাদের। বছর দশেক বয়স তার। মেয়েটা কেঁদে কেটে হাঁটিতে হাঁটিতে সেই রাতেই সুজনের টেণ্টে হাজির।

সুজন সেই ছোট মেয়েটাকে তার তাঁবুতে রেখে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। সারা রাত ঢুঁড়ল বন আর হো-ওঁরাওদের আস্তানা। মেয়েটি একেবারে বেপাত্তা। প্রথমে সুজন মনে করেছিল মেয়েটা কারো সঙ্গে পালিয়েছে। কিন্তু যতদিন ও সুজনের কাছে কাজ করেছিল ওর আচরণে তেমন কোন চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া যায়নি। সারাদিন মুখ বুজেই ও কাজ করত। সঙ্গীদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করতে দেখা যায়নি ওকে। স্বামীটি মারা যাবার পর ও বড় বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। অন্যমনে পথ চলত। কোন পরবে যেত না। মেয়েটাকে নিয়েই পড়ে থাকত ঝোপড়িতে।

সুজন ভোরে ফিরে এসে বাংলোতে জানাল মেয়েটির নিখোঁজ হবার সংবাদ। আজ সে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না তাই জানাতে এসেছিল।

আমি বললাম, তুমি এখন কি করবে সিং? কাজের কাছে ফিরে যাবে না আর একবার দিনের আলোয় মেয়েটির খোঁজে বেরুবে?

ও খুব বিষণ্ণ মুখেই বলল, ওকে খুঁজে বার করতেই হবে আমাকে। ওর বছর দশেকের মেয়েটা আমার তাঁবুতে রাতভোর রুদছে।

বললাম, আপত্তি না থাকলে আমি তোমার সঙ্গে ঘুরতে পারি সিং।

ও বলল, চলো, তোমার তকলিফ না হলে আমার আপত্তির কি আছে বল।

সেঁজুতি যেতে চেয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ তার মনে পড়ল মিঃ ভট্চায গুয়ার এক ডাক্তার বন্ধুকে আজ লাঞ্চের নেমন্তন্ন করেছে। তাই দারুণ ইচ্ছা থাকলেও তাকে বাংলোতে থেকে যেতে হল।

আমি আর সুজন সিং বেরোলাম বনের পথে।

অনেক ঘুরে ফিরে আমরা বেলা প্রায় একটায় ঐ মেয়েটার ঝোপড়ির পথ

ধরে ফিরছিলাম, হঠাৎ একটা সাবাই ঘাসের জঙ্গলের পাশে শালগাছের জটলার ভেতর থেকে একটুকরো কাপড় দেখা গেল।

জীপ থামিয়ে ঝপ্ করে নেমে পড়ল সুজন। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় ও পথের ধারে একটা বড় ঝাঁকড়া পাঁইসার গাছে উঠে গেল। আমি জীপ থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, সুজন অনেক ওপরের এক। ঝাঁকড়া ডালে বসে ঐ সাবাই ঘাসের জঙ্গলের দিকে চেয়ে আছে।

কিছু পরে ও তেমনি দ্রুত নেমে এল। গাড়ি চালিয়ে তাঁবুর দিকে ফিরে যেতে যেতে বলল, শালার বাঘ মেয়েটার হাফ বডি খেয়ে সাবাড় করে দিয়েছে চৌধ্রী।

একটু থেমে বলল, আমিও শালাকে সাবাড় করব।

তাঁবুতে ফিরে এসেই সেদিনের কাজ বন্ধ করে দিলে সুজন সিং। কয়েকটা জোয়ান কুলিকে গাড়ি বোঝাই করে দুক্ষেপে নিয়ে গেল সেই জায়গাটার পাশে। ওরা হাঁক ডাক করে মেয়েটার কাছ অব্দি পেঁছিল। এত লোক আর হামলা শুনে বাঘটা নিশ্চয়ই দূরে সরে গিয়ে থাকবে। দূরে মানে, সাবাই ঘাসের জঙ্গলটা কিছুদূরে একটা পাহাড়ী ঝোরার কাছে এসে শেষ হয়ে গেছে। ওখানে একটা পাহাড়ী গুহার মত দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। হয়ত বাঘটা সেখানেই আশ্রয় নিয়েছে।

কয়েকটা লোক সুজনের নির্দেশে ঐ শালগাছের ওপর একটা মাচান তৈরী করে ফেলল। গাড়ি থেকে শেকল বের করে ঐ হতভাগ্য মেয়েটার আধখাওয়া দেহটাকে জড়িয়ে বাঁধল শালগাছের সঙ্গে। কাজ শেষ হলে সুজন বলল, চৌধ্রী ভাই, তুমি হেঁটে চলিয়ে যাও এই লোকগুলোর সাথে। আমি শয়তানটার খেল খতম করে তবে ফিরব। গাড়িখানা থাবল, কুছ ভাবনা নেই।

আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, আমি তোমার ঐ গাড়িতেই বসে থাকব সিং, তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে ফিরতে পারব না।

ও বলল, কেন দিগ্দারি করছ চৌধ্রী, রাত ভী হইয়ে যেতে পারে। ও শালা ডাকুকে আমি ছাড়ব নাই। শালা মানুষ খেকো আছে। এ তল্লাটের মানুষ জনকে আস্ত রাখবে নাই।

বললাম, আমাকে কেন ভাগিয়ে দিচ্ছ সিং। আমি তোমার শিকারে একটুও বিঘ্ন ঘটাবনা দেখো।

ও বলল, তাহলে ঐ নীচে জীপের ওপর বসে থাকা তোমার চলবে না। আমার সঙ্গে মাচানে উঠে আসতে হবে।

বললাম, রাজী আছি।

আমরা মাচানের ওপর উঠলাম। বেশ শক্ত করে মাচানটা তৈরি করা হয়েছে।

সুজন সিং প্রথমে চারদিক দেখে নিল, তারপর ইংগিতে লোকগুলোকে চলে যেতে বলল।

ওরা চলে গেলে পাশে জোড়ানলী রাইফেলটা রেখে বসে পড়ল সুজন সিং। আমি আগেই বসে পড়েছিলাম। একটা কাছির মত মোটা চিহড় লতা আমাদের মাচানের ওপর প্রকাণ্ড শালগাছগুলোকে জড়িয়ে বেঁধে রেখেছিল। ওটা মাচান বাঁধার কাজে বেশ সহায়ক হয়েছিল।

সুজন সিং-এর পাঁচ ব্যাটারী টর্চখানা ঝক্ ঝক্ করছে। অন্ধকার রাতে দরকার হতে পারে তারই আয়োজন।

সুজন সিং বলল, এটা চিতা, বাঘ নয়।

বললাম, কি করে বুঝলে?

ও বলল, শিকার ধরার তফাৎ থেকে। বাঘ ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে সামনের পায়ের থাবার ঘায়ে ঘাড়টা মটকে ভেঙে দেয়, আর চিতা ঘাড় বা গলায় কামড় দিয়ে শিকারটাকে পাকড়ে রাখে। শিকার মরে মাটির উপর পড়ে গেলে তবে সেটাকে ছাড়ে। আমি দেখলাম, চিতাটা মেয়েটার টুঁটি ছিঁড়ে ফুটা করে দিয়েছে।

একটু থেমে বলল, বাঘের থেকে বহুৎ শয়তান আছে চৌধ্‌রী। বিজ্‌লিকা মাফিক ওর চাল আছে। আমাদের বহুৎ হুঁসিয়ার থাকতে হবে। গাছে চড়তে এক নম্বর ওস্তাদ।

বললাম, আমার অনুমান চিতাটা ঐ সামনের পাহাড়ের কোন গুহায় গা ঢাকা দিয়ে আছে।

সুজন সিং বলল, সম্ভব। তবে ওরা আওয়াজ না তুলে চলতে পারে, দেখলে মনে হয় বিজলি চমক দিচ্ছে। ওদের শিকার করা সবসে কঠিন চৌধ্‌রী।

আমরা বসে বসে অতি ধীরে কথা বলছিলাম। রোদের রঙ পালটে গেল। ছায়া ঘনিয়ে উঠল বনের ভেতর। নীচে তাকিয়ে দেখলাম মেয়েটা আধখাওয়া মুর্তিতে গাছের সঙ্গে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কি বীভৎস সে দৃশ্য।

দেখতে দেখতে চারদিক থেকে সন্ধ্যার আয়োজন সম্পন্ন হল।

পাশের পাহাড়ের ওপর আরাবা গাছে উড়ে এসে বসল এক ঝাঁক টিয়া। ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ আওয়াজে কিছুক্ষণ কানে তালা লাগার জোগাড়।

ধীরে ধীরে সে শব্দটাও থেমে গেল। অমনি শুরু হল শেয়ালের ডাক। সমবেত গলায় রাতটাকে যেন কাঁপিয়ে দিলে। তারা থামলে ঝিঁঝিঁদের একটানা শব্দ উঠল। এ শব্দ উচ্চরোলে না হলেও রাতের বনকে যেন সূক্ষ্ম করাত চালিয়ে কেটে চলল।

কতক্ষণ এমনি বসেছিলাম, হঠাৎ সুজন সিং কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস্ ফিস্ করে বলল, এই নাও টর্চটা ধরে রাখ। আমি জিভে টোকা দিলেই তুমি ঐ টর্চটা মুর্দার উপর ফেলবে।

অতি ধীরে বললাম, এসেছে?

ও আমার চেয়েও আস্তে বলল, কান পাতলে শুনবে ও মাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। যখন হড্‌ডি চিবায়ে খাবে তখন তোমাকে টোকা দিয়ে জানান দেব।

আমি উৎকর্ণ হয়ে চিতার মাংস টেনে ছিঁড়ে খাবার শব্দটা শুনতে লাগলাম।

ও আবার ফিস্ ফিস্ করে বলল, অঙ্গার কী তর দুটো চোখ জ্বলতে আছে?

আমি দেখলাম, গাছের গোড়ায় দুটো আগুনের মার্বেল জ্বল্ জ্বল্ করছে।

দারুণ একটা টানাটানি হেঁচড়া হেঁচড়ি চলল কিছুক্ষণ। লোহার শেকলটা ঠক্ ঠক্ করে করে গাছের কাণ্ডে কয়েকবার বেজে উঠল।

একসময় টানাটানির শব্দটা থেমে গেল। কিছুক্ষণের ভেতরেই বুঝলাম, ও দেহ থেকে খানিকটা হাড় আর মাংস টেনে ছিঁড়ে নিয়েছে। এখন আরাম করে তাই চিবুচ্ছে।

ওপরে বসেই আমরা শব্দ পাচ্ছিলাম। কিন্তু ওর সেই আগুনজ্বলা চোখদুটো আর দেখতে পাচ্ছিলাম না।

হঠাৎ অনুভব করলাম সুজন রাইফেলটা তুলে নিয়েছে।

ও অতি ধীরে ধীরে বলল, টর্চ রেডি রাখ।

আমি টর্চটা হাতে ধরে রেখেই ছিলাম।

ও জিভ আর তালুতে একটা টোকা দিলেই আমি আলো ফেলব বাঘটার ওপর।

প্রতিটা মুহূর্ত আমার দারুণ উত্তেজনায় কেটে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কখন সংকেত আসে। ঠিক মত জায়গায় আলো ফেলতে পারব তো। মনকে শাসন করেছিলাম, নার্ভাস হলে চলবে না।

সংকেত এল। সামান্য সংকেত আমার কানে যেন একটা লোহার পাতের ওপর হাতুড়ী পেটার মত মনে হল!

আমি গাছের গুঁড়ি লক্ষ্য করে আলো ফেললাম। গভীর অন্ধকারের বুক চিরে তীক্ষ্ণ একটা আলো ছড়িয়ে পড়ল খানিকটা জায়গা জুড়ে।

আমি স্পষ্ট দেখলাম চিতাটা দুই থাবায় একটা কিছু ধরে আছে। আলো পড়ামাত্র সে যেন কেমন চোখ ধাঁধানো একটা অবস্থায় পড়ে গেল। মুহূর্ত মাত্র। গর্জে উঠল সুজন সিং-এর রাইফেল।

একটা বিদ্যুৎ তীব্রবেগে লাফিয়ে শালগাছের ওপর খানিকটা উঠে এল। তারপর সেখান থেকে সম্পূর্ণ চারটে পা ছেড়ে দিয়ে পড়ে গেল মাটির ওপর মুখ থুবড়ে। আর মাথা তুলল না।

আমি বললাম, এক গুলিতেই শেষ হয়ে গেছে, চল নেমে যাই।

ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, থামো চৌধ্রী, খানিক সময় তো দেখ দোস্ত। শয়তানকে কুছ্ বিশোয়াস নাই।

আমি তেমনি টর্চ ধরে রইলাম। একটা ছবি চোখে ভেসে উঠল। মেয়েটা শেকলে বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে আর তার আধখাওয়া একটা পায়ের কাছে মাথা থুবড়ে পড়ে আছে চিতাটা।

আর একবার রাইফেলের আওয়াজ হল। বুলেট বিদ্ধ হল যে জায়গায় সেখানটা সামান্য নেচে উঠল।

সুজন সিং বলল, এখন কোই ডর নাই, চল চৌধ্‌রী নীচে নামি।

আমরা সেদিন গাড়ীতে ফিরে এলাম সুজন সিং-এর ক্যাম্পে। ওর আস্তানায় গাড়ীটা বাঁক নিচ্ছে হঠাৎ আলোর সামনে চকিতে দেখা গেল একটা ছোট মেয়ে বনের দিকে চলেছে। গাড়ী সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে নেমে গেল সুজন সিং।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটার হাত ধরে গাড়ীতে এনে তুলল সুজন। মেয়েটা গাড়ীতে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, আর সুজন তার সঙ্গে অনর্গল হো-দের ভাষায় কথা বলে চলেছিল।

তাঁবুতে মেয়েটাকে কারো জিম্মায় রেখে এসে সুজন সিং বলল, এত রাতে তোমাকে বাংলোতে দিয়ে আসবার ইচ্ছা আমার ছিল না চৌধ্‌রী, কিন্তু সারারাতটা তোমার লেগে বহুরাণী ভাবনা করবে সে আমি হতে দেব না। চল, তোমাকে পেঁছায়ে আসি।

গাড়ী আবার বাংলোর দিকে চলল।

পথে যেতে যেতে ও বলল, ঐ মেয়েটার মাকে চিতায় মারল চৌধ্‌রী।

বললাম, মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে এত রাতে বনের পথে যাচ্ছিল কোথা ?

সুজন সিং বলল, ওর ঝোপ্‌ড়ীতে চলছিল মায়ের খোঁজ করে। যে লোকগুলো দেখে আসল ওর মাকে বাঘে খেয়েছে, তারা ওকে কথাটা বলতেই ও তো কেঁদে কেটে হাট বসালে। তখন ওরা ঝুট্‌ বাৎ বলল, তোর মা ঝোপড়ীতে আছে, কাঁদিস নাই।

ও অমনি সবাই নিদ গেলে তাঁবু থেকে একা একা ভাগ্‌ল।

বললাম, এখন কি করবে ওকে নিয়ে।

ও বলল, কি আর করব চৌধ্‌রী, ও আমার কাছেই থাকবে। ওকে পড়া লিখা শিখলাব। নেহি তো লিজার পাশে ভেজিয়ে দেব।

আমরা বাংলোতে এসে নামলাম রাত প্রায় এগারোটায়। শীতের রাত কালো কফিনের ভেতর শবের মত শুয়ে আছে। ঝিঁঝিঁর আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না। কয়েকটা জোনাকী ইউক্যালিপটাসের মাথায় জড়ো হয়েছে। অদ্ভুত কোমল নীলাভ আলো জ্বলছে আর নিভছে। মনে হল প্রাণহীন দেহ থেকে বেরিয়ে গিয়ে কতকগুলি আত্মা অন্ধকারের বুকে এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বসার ঘরে তখনও আলো জ্বলছিল। আমাদের গাড়ীর আওয়াজ শুনে কেউ বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল। আমি গাড়ী থেকে নেমে একটু এগিয়ে দেখলাম, সেঁজুতি। কালো একটা আলোয়ানে সারা গা ঢাকা। মাথায় ঐ আলোয়ানই ঘোমটার মত করে জড়িয়েছে।

বললাম, তুমি এখনও জেগে আছ সেঁজুতি। মিঃ ভট্‌চায কোথায়?

ও বলল, রেঞ্জার বনের বাইরে ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে গেছে। আজ রাতে ফিরবে না। দয়া করে তুমি যে এসেছ এতেই আমি খুশী।

বললাম, সে ভীষণ ব্যাপার, বলব এখন সব পরে।

ইতিমধ্যে গাড়ী থেকে নেমে এসেছে সুজন। সে বলল, দেখে নাও বহুরাণী আপনার আদমীকে। বাজায়ে দেখ, সব কুছ্‌ ঠিক আছে কি নাই।

সেঁজুতি বলল, ভেতরে এসো সব। বাইরে দাঁড়িয়ে শীতের ভেতর জমে যাচ্ছি।

সুজন বলল, মাফ্‌ কিজিয়ে বহুরাণী, আমি আর বসব নাই। কাল ব্রেক ফাস্ট তোমার কাছে খেতে আসব।

এগিয়ে গেল সেঁজুতি। এই প্রথম আমি ওকে সুজনের হাত ধরতে দেখলাম।

ও সুজনের হাত ধরে বাংলোর ভেতর টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, এত রাতে আবার তুমি যাবে ক্যাম্পে! আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়বনা। আমার অনেক রান্না আছে, রেঞ্জার ফরেস্ট গার্ডকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে সে আসবে না। কি হবে আমার এত রান্না।

'সুজন সিং ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, তোমার রান্না লিয়ে ভাবনা বহুরাণী। আমি তোমার সব খানা খেয়ে তারপর চলিয়ে যাব।

সেঁজুতি বলল, আমি তো রান্নার দুঃখে মরে যাচ্ছি আর কি। যদি না থাকবে তাহলে খেতে হবে না, চলে যাও।

সুজন সিং বলল, এ বহুরাণী, গুস্‌সা করো মাৎ। আমি তোমাকে বুঝায়ে বলব কেন এ রাত তোমার কাছে কাটাতে পারব নাই।

সেঁজুতি বলল, এসো সব খাবার ঘরে। ঠাণ্ডা খাবারগুলো খেয়ে নাও।

আমরা খেতে বসলাম। দেখলাম সেঁজুতিও আমাদের সঙ্গে বসল খেতে। ও এত রাত না খেয়ে উদ্বেগে আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছিল জেনে আমি মনে মনে সংকোচ বোধ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য তৃপ্তি সারা মনটাকে ভরিয়ে তুলল। আমার জন্যেও কেউ প্রতীক্ষা করার আছে। আমার কথা ভেবে ভেবে সে অস্থির হয়।

সুজন সিং বলল, বহুরাণী, একটা ছোটী লেড়্‌কী রাতভোর রোয়েগী, আমি তোমার বাংলোতে নিদ যেতে পারব নাই।

ব্যাপারটা বুঝতে পারল সেঁজুতি! ছোট মেয়েটা যে সুজন সিংএর তাঁবুতে আছে তা সে জানত। কিন্তু তার মাকে খুঁজে পাওয়া গেল কিনা সে খবর জানতনা।

খাওয়া শেষ হলে এবার সেঁজুতিই তাড়া দিল সুজনকে, বারোটা বেজেছে, আর এক মিনিটও নয়। গাড়ীতে উঠে পড় জল্‌দি।

সুজন সিং বাইরে বেরিয়ে যেতে যেতে হেসে বলল, আমাকে তাড়ায়ে দিলে বহুরাণী। কাল কিন্তু ব্রেক ফাস্টের টেবিলে এ বান্দা হাজির থাকবে।

সেঁজুতি কথা না বলে শীতের রাতে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। সুজন সিংএর গাড়ী অন্ধকার বনের পথে যতক্ষণ না মিলিয়ে গেল ততক্ষণ সে ঘরে ঢুকল না।

আমার কাছে এসে সেঁজুতি বলল, জানো অনির্বাণদা সান্না বনে ও একটা দুর্ধর্ষ ডাকাত। জানোয়াররা ওকে ভয় করে। ফরেস্ট গার্ডদের সঙ্গে কি নিয়ে একবার বিবাদ হয়েছিল, ও ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দুক কেড়ে নিয়ে দারুণ মার মেরেছিল। শেষে রেঞ্জার পরিস্থিতিটাকে সামলে নেয়। কুলি কামিনরা ওকে বাঘের মত ভয় করে, আবার প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। আশ্চর্য চরিত্র সুজনের।

দেখলেনা, মেয়েটা রাতে হয়তো হারানো মায়ের জন্য কাঁদবে তাই এমন শীতের রাতে আরাম ফেলে দেড় দু'ঘণ্টার পথ চলে গেল।

বললাম, শুধু তুমি আমার জন্যে ভাববে বলে সুজন এত রাতে আমাকে তোমার কাছে পেঁাছে দিয়ে গেছে।

সেঁজুতি বলল, সুজন সারান্দার সম্রাট। অসুরের মত শক্তি ওর, আর বিরাট একটা হৃদয় ওকে সবার থেকে আলাদা করে রেখেছে!

আমি সকালে বাংলো থেকে বেরিয়ে যাবার পর যা যা ঘটেছে তার একটা বিবরণ সেঁজুতিকে দিলাম।

শুনতে শুনতে ওর মুখের ছবি নানাভাবে পরিবর্তিত হতে লাগল।

কথা শেষ হলে ও বলল, আমাকে ছুঁয়ে বল কোনদিন আর এমন দুঃসাহসিক কাজে সুজন সিংএর সঙ্গে বেরোবেনা?

আমি বললাম, একথা কেন বলছ সেঁজুতি, সুজন অনেক হুঁশিয়ার। অন্ততঃ আজকের ঘটনায় সে আমাকে তার সঙ্গে একেবারেই রাখতে চায়নি। আমি জোর করেই একরকম তার সঙ্গে থেকেছি। তাছাড়া বাঘটি প্রথম গুলীতে মারা গেছে মনে করে নামতে চাইলে ও আমাকে বরং বাধাই দেয়।

সেঁজুতি বলল, সেই উসুরিয়া নদীর ওপর জীপটা থেমে যাবার কথা তুমি ভুলে গেলে! সুজন সে রাতে পাহাড় ডিঙিয়ে বন চিরে বেরিয়ে যায়নি? এমন ডাকাতের সঙ্গী হওয়াও যে বিপদের।

হেসে বললাম, কলকাতায় থাকি ভয়ে ভয়ে, সবদিক সামলে। এখানে বনে এসেছি, মনের ভেতর একটু সাহস ভরে নিয়ে যেতে দেবেনা?

ও বলল, তোমার ভেতরেও দেখছি সুজন সিংএর রোগে ধরেছে।

বললাম, রোগে যদি ধরেও তুমি থাকলে রোগ সারতে কতক্ষণ।

একদিন সেঁজুতি বলল, আজ দুপুরে লাঞ্চের সময় তোমার খোঁজ করছিল রেঞ্জার।

বললাম, সত্যি আমার দারুণ অন্যায় হয়ে যাচ্ছে। ব্রেকফাস্টের পর রোজই বেরিয়ে যাচ্ছি। রেঞ্জার সাহেব অনেক রাতে এ বাংলোতে আসেন আবার এলেও সকালে ওঠেন অনেক বেলায়। তাই দেখা-সাক্ষাৎ বড় একটা ঘটে উঠছে না।

সেঁজুতি বলল, সুজন সিংয়ের সঙ্গে রেঞ্জারের দোস্তিতে মনে হয় কোথাও চিড় ধরেছে, তাই তোমার খোঁজ পড়ছিল।

বললাম, মিঃ ভট্চায কি পছন্দ করছেন না সুজনের সঙ্গে আমার রোজ বেরিয়ে যাওয়া ?

সেঁজুতি বলল, সে রকম স্পষ্ট করে কোনদিন বলবে না ও। শুধু বলল, তোমার বন্ধুটি সুজন সিংয়ের প্রিয় হয়ে উঠেছে। সিং এখন কাজের কাছে যাচ্ছে কম, তোমার বন্ধুটিকে নিয়ে মেতে রয়েছে।

সেঁজুতির কথা শুনে নিজেকে কেমন যেন অপরাধী অপরাধী মনে হল।

বললাম, সামনের কয়েকটা দিন আর বাংলোর বাইরে যাব না সেঁজুতি।

ও বলল, তা কেন হবে, তুমি যেমন যাচ্ছ তেমনি যাবে। তুমি এসেছ এখানে আমার অতিথি হয়ে ছবি আঁকতে! বাংলোতে রাতদিন বসে বসে রেঞ্জারের বউয়ের সঙ্গে গল্প করতে নয়।

হেসে বললাম, রেঞ্জারের বউ আমার ছবির প্রেরণা। যখন ছবি আঁকতে আঁকতে টায়ার্ড হয়ে পড়ব তখন নতুন করে প্রেরণা পাবার জন্যে রেঞ্জারের বউয়ের কাছে দিনের পর দিন বসে থাকতে হবে বইকি।

সেঁজুতি বলল, শোন অনির্বাণদা, আমি যে তোমাকে লিখেছিলাম 'সাগরিকা' সিরিজের ছবিগুলো আনতে তা কি এনেছ ?

বললাম, তোমার চিঠি পেয়ে ভেবেছিলাম, আনব। কিন্তু আসার সময় ভাবলাম, ওগুলো তোমার এখানে নিয়ে আসা ঠিক হবে না। কখন কোন ফাঁকে ছবিগুলো মিঃ ভট্চাযের হাতে গিয়ে পড়বে, তাহলে অনর্থের আর শেষ থাকবে না।

সেঁজুতি বলল, আমার সম্বন্ধে ওর মনে একটুখানি ঈর্ষা জাগলে আমি তো বর্তে যেতাম।

একটু থেমে বলল, রাতের পর রাত একটি পূর্বপরিচিত বন্ধুর সঙ্গে একই বাংলোয় কাটাচ্ছি, তবু স্বামীর চৈতন্য নেই। তিনি রাত কাটাচ্ছেন কাজের অছিলায় অন্য বাংলোবাড়িতে একাধিক মেয়ের উত্তপ্ত সঙ্গে।

বললাম, তোমার ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাসই এতে প্রমাণিত হচ্ছে। অনুরূপ ভাবে তুমিও তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখ, মনে মনে হয়তো এটাই তিনি চান।

সেঁজুতি হেসে বলল, বলিহারি তোমার ব্যাখ্যা।

বললাম, আচ্ছা একটু আগে যে তুমি বলেছিলে সুজনের সঙ্গে আমাদের রেঞ্জারের কোথায় চিড় ধরেছে, এ কি তোমার অনুমান ?

ও বলল, চিড় ধরার কারণ লিজা। কিন্তু আগে একদিন তোমাকে বলেছিলাম, বন ইজারার ব্যাপারে ওদের একটা কমন স্বার্থ আছে। সে-জন্যে মনে ফাটল ধরলেও বাইরে তার প্রকাশ কম।

বললাম, এ তো অনেকদিন ধরেই চলছে, নতুন ভাঙন অনুমান করলে কি করে ?

সেঁজুতি বলল, ইতিমধ্যে নতুন একটি মুখের আবির্ভাব হয়েছিল। তার সঙ্গে ওর কথাবার্তা আড়াল থেকে শুনে যতটুকু বুঝলাম, সুজনকে সরিয়ে তাকে নতুন ইজারা দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। টেণ্ডারের কিছু কারচুপি চলছে!

বললাম, এতদিনের বাঁধন তাহলে ছিঁড়ে যেতে বসেছে বল?

ও বলল, এর ভেতর রেঞ্জারের অনেক খেলা আছে। ও অনেকদিন থেকে সুজন সিংকে সরাতে চাইছিল, কিন্তু মনের মত দ্বিতীয় লোক পায়নি বলে এতদিন ধরে রেখেছিল। এখন নতুন ইজারাদারের সঙ্গে একটি শর্ত করে নিয়েছে।

বললাম, কি রকম?

সেঁজুতি বলল, আমার যতদূর অনুমান লিজার বাবাকে কুলির কণ্ট্রাক্ট দেবার সর্তটা ও মৌখিক ভাবে করিয়ে নিয়েছে।

বললাম, এ কথার অর্থটা আমার কাছে খুব পরিষ্কার হল না।

ও বলল, সুজন সিং লিজাকে ভালবাসে ঠিক কিন্তু কতকগুলো নীতি ও মেনে চলে। পুরনো যে দলটি কাজ করছে তাদের ছাড়িয়ে ও লিজার বাবাকে কণ্ট্রাক্ট দিতে একেবারেই নারাজ। রেঞ্জার একবার অনুরোধও করেছিল কিন্তু কাজ হয়নি।

এদিকে আবার হো-দের ঐ দুটো দলে বিবাদ। লিজার বাবার দলের সঙ্গে সুজন সিংয়ের দলের লোকের মাঝে মাঝে দারুণ রকম মারামারিও হয়ে যায়।

বললাম, তাহলে সুজন সিংকে লিজার বাবা সহ্য করে কি করে?

সেঁজুতি বলল, দূর ভবিষ্যতে কণ্ট্রাক্ট পাবার আশা সে ছাড়েনি। তাছাড়া লিজা আর সুজন সিংয়ের দেখা-সাক্ষাৎ ঘরের চেয়ে বনেই বেশী হয়।

বললাম, লিজা কণ্ট্রাক্টের ব্যাপারে সুজনকে কিছু বলে না?

সেঁজুতি বলল, ওটা আমার অজানা। তবে এটুকু বলতে পারি, লিজা সুজনকে তার বাবার হয়ে কিছু যদি বলে তাহলে তা সহজে মেনে নেবে না সুজন। আর আমার মনে হয় লিজা ওকথা বললে বড় ছোট হয়ে যাবে সুজনের কাছে।

বললাম, আচ্ছা তুমি বলেছিলে রেঞ্জারও ভালবাসার অংশীদার, সেটা কিরকম? ভালবাসা তো এক তরফের হয় না, সেখানে লিজারও সম্মতি চাই।

সেঁজুতি বলল, এটা আমার কাছে রহস্য। এক এক সময় মনে হয় বাবার দিকে চেয়ে ও দু' তরফের মন জুগিয়ে চলেছে। আবার মনে হয় মেয়েটা রেঞ্জারের সঙ্গে হেসে গড়িয়ে আলাপ চালালেও সুজনকেই দিয়েছে তার সব কিছুর অধিকার।

বললাম, থাক ওসব কথা। মাথাটা কেমন গুলিয়ে ওঠে।

সেঁজুতি বলল, কিন্তু একটা কাজ তোমাকে করতে হবে।

বললাম, বল কি কাজ?

ও বলল, নতুন ইজারাদারের যে আবির্ভাব ঘটতে চলেছে এ বনে, সে খবরটুকু ওকে জানিয়ে দেওয়া। বলা বাহুল্য, আমাদের নাম সব সময়েই গোপন থাকবে।

বললাম, তাতে কাজ হবে কি? টেণ্ডারের কাগজ তো রেঞ্জারের হাতে। সুজন যত কম রেট দেবে, তার চেয়েও কমে নতুন ইজারাদারকে দিয়ে করিয়ে নেবেন রেঞ্জার।

ও বলল, টেণ্ডারগুলো রেঞ্জারের হাতে এলেও শেষ পর্যন্ত ফাইনাল ডিসিসান নেবেন কনজারভেটর।

বললাম, তাতেও বিশেষ কোন সুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে না।

ও বলল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা কিছু একটা করলাম এই তৃপ্তি, আর কিছু নয়। একটা লোককে কৌশল করে হটানোর চেষ্টা কি সংগত?

বললাম, এ ব্যাপারে আমাকে জড়িয়ে পড়তে হল, এই যা।

ও বলল, থাক্, আমি না হয় ইঙ্গিতে বলব।

আমি ওকে বাধা দিয়ে বললাম, তুমি সুজন সিংয়ের কাছে পরোক্ষে পতিনিন্দা করবে এটা আমি নিশ্চয়ই হতে দিতে পারি না। আমিই বলব ওকে।

ও হেসে বলল, তোমার আসার আগে থেকেই সুজন সিং জানে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি। সুতরাং কথাটা তুমি বললেও তার বুঝতে একটুও দেরী হবে না যে কোন উৎস থেকে কথাটা এসেছে।

বললাম, তবু আমিই বলব ওকে।

সেঁজুতি হেসে বলল, বেশ তাই বল।

পরের দিন ব্রেকফাস্টে সুজন সিং হাজির। চার চারটে ডিমের পুরু অমলেট খেতে খেতে ও বলল, বড় ভুক্কড়কী তর আমার খাবার অভ্যাস আছে চৌধুরী। বহুরাণীকে এত করে বলি, আমাকে কুছ সহবৎ শিখলাও, তা বহুরাণী বলে কি জানো?

সেঁজুতি বলল, কি বলি আমি বল?

সুজন সিং একটা চোখ বুজে মিঠি মিঠি হাসতে হাসতে বলল, আগে যে বনে রাক্ষস থাকত তা তোমাকে দেখলেই মালুম। আর মানুষের মত চালচলন রাক্ষস-খোক্কসদের মানাবে নাই।

সেঁজুতি খানিকটা পরিজ ওকে পরিবেশন করতে করতে বলল, ঠিকই তো বলেছি। মানুষের রাক্ষস হওয়া যেমন সাজে না, তেমনি রাক্ষসদেরও নিজেদের অরিজিনালিটি বিসর্জন দিয়ে মানুষ হবার চেষ্টা করা ঠিক নয়।

আবার সেই ঠা ঠা হাসি সুজন সিংয়ের। কারো পেরিয়ে একেবারে ওপারের বনে গিয়ে বাজল।

আমি আর সুজন সিং সেদিন বেরিয়ে গেলাম। বেশ কয়েকদিন যে ওর সঙ্গে থাকতে পারব না সে কথাটা জানাতে হবে। তাছাড়া টেণ্ডারের

রহস্যটাও ফাঁস করে দিতে হবে ওর কাছে।

বাংলো থেকে বেরিয়ে সুজন সিং বলল, আজ কোনদিকে তোমাকে নিয়ে যাব বল চৌধুরী?

বললাম, দিক তো ঠাহর করতে পারব না সিং, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই আঁকতে বসে যাব।

ও বলল, একটা মেয়ের ছবি আঁকিয়ে দিবে, খুবসুরৎ জেনানা?

বললাম, তোমারটি বুঝি?

ও হা হা করে হেসে আমার পিঠে একটা থাবা মেরে বলল, তুমি বহুৎ চালাক আছ চৌধুরী।

বললাম, এতে বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না। যে ভালবাসায় পড়ে সে তার ভালবাসার পাত্রীকে বিশ্ব সুন্দরী মনে করে।

সুজন সিং বলল, আগে দেখ তো দোস্ত, তারপর বলো বাৎ।

বললাম, ঐ যে চার্চে যেদিন বেড়াতে গেলাম, সেদিনই তো দেখলাম লিজাকে। হ্যাঁ, তোমার নজর আছে বলতে হবে।

সুজন সিং বলল, বহুৎ রোজ আমার মন বলছে কি, চৌধুরীকে দিয়ে একটা ছবি আঁকাব লিজার।

বললাম, একটা কেন, দশখানা ছবি এঁকে দেব তোমাকে।

ও বলল, দশঠো, আরে বাপ!

আমি বললাম, কিন্তু ও রাজী হবে তো?

সুজন সিং বলল, রাজী হবে না, কি বলছ চৌধুরী। ওর গর্দান পাকড়ে লিয়ে আসব।

আমার ভীষণ হাসি পেয়ে গেল। দৃশ্যটি মনে মনে কল্পনা করার মতই বটে। অনিচ্ছুক প্রেমিকার ঘাড়ে ধরে তার প্রেমিক এক শিল্পীর কাছে ছবি আঁকাতে নিয়ে আসছে।

বললাম, তার আর দরকার হবে না, এমনি হাত ধরে দুচারটে প্রেমের কথা বলতে বলতে নিয়ে এলেই চলবে।

ও বলল, তাহলে বলি চৌধুরী আসলী বাৎ, লিজা আমাকে বলছে, তোমাকে দিয়ে একটা ছবি আঁকায়ে দেবার কথা।

বললাম, লিজাকে বুঝি তুমি বলেছ, চৌধুরী একটা মস্তবড় আঁকনে-ওয়ালা।

ও বলল, আলবাৎ বলেছি, শালা গলা ফাটায়ে বলব। সাচ বাৎ বলতে ডর কাহেকা বোলো দোস্ত।

বললাম, সাসাংদায় যাবে?

ও বলল, ওখানে যাবে না। আজ ফ্রাইডে আছে না চৌধুরী। লিজা ছোট নাগরার চার্চের কোঠিতে বাচ্চালোককে লিখাপড়া শিখলাবে।

বললাম, ওখান থেকে বের করে আনতে পারবে ওকে?

সুজন সিং বলল, পারবে না কেন, আঁখ ইশারায় পাখি উড়ে আসবে।

এবার আমি অন্য কথা পাড়লাম, সিং, হয়তো তোমার সঙ্গে বেশ কিছুদিন আর ছবি আঁকার কাজে বেরোতে পারব না।

ও স্টীয়ারিং চেপে ধরে আমার দিকে তাকাল।

কেন চৌধ্‌রী, গুস্‌সা হল কিসে?

বললাম, না না, রাগের ব্যাপার নয়। আমার সঙ্গে রোজ বেরিয়ে তোমার কাজের অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।

ও একটু থেমে কি ভাবল। তারপর বলল, বহুরাণী বলেছে বুঝি?

বললাম, না না, সে'জুতি কেন বলতে যাবে। এই আমিই তো দেখছি।

ও একটা খাদের মুখের সংকীর্ণ বাঁক থেকে গাড়িখানাকে কসরৎ করে ঘুরিয়ে নিতে নিতে বলল, গোলি মার কামকো। আপ্‌সেহি কাম হইয়ে যাবে, বিশ রোজ বাদ হবে, কিন্তু চৌধ্‌রী চলিয়ে গেলে আর ফিরবে নাই।

বললাম, সিং, তোমাকে বন্ধু হিসেবে একটা কথা বলব। কোত্থেকে কথাটা জানলাম সে প্রশ্ন কোর না।

ও আমার দিকে চেয়ে বলল, লিজাকে লিয়ে কোন কথা বলবে চৌধ্‌রী?

বললাম, না, তোমার কারবারের সম্বন্ধে একটা গোপন খবর দিতে চাই। জানি না তাতে তোমার কিছু সুবিধে হবে কি না।

ও অবাক হয়ে বলল, কারবার লিয়ে কতদিন তুমি মাথা ঘামাচ্ছ চৌধ্‌রী?

বললাম, মাথা টাথা বড় একটা ঘামাই না। তবে যা শুনেছি তাই বলছি।

ও চুপচাপ সামনের পথের দিকে চেয়ে গাড়ি চালাতে লাগল।

আমি বললাম, এক নয়া আদমী এবার ইজারার ব্যাপারে টেণ্ডার দিয়েছে।

ও বলল, সে তো বহুৎ আদমী দিয়ে থাকে চৌধ্‌রী।

বললাম, না, এর সঙ্গে তাদের তফাৎ আছে। মনে হচ্ছে এই নতুন আদমী রেঞ্জারের প্যারের লোক।

মুহূর্তে দেখলাম, মুখখানা রেখায় ভরে উঠল সুজন সিংয়ের।

বললাম, লিজার বাবাকে ঐ নতুন লোকটা কুলির কণ্ট্রাক্ট দেবে এমন কথাও হয়েছে।

গ্রে-হাউণ্ডের মত একটা গলা বেজে উঠল, রেঞ্জার যদি বহুরাণীর হাজব্যাণ্ড না হত চৌধ্‌রী, তাহলে ও শালা শয়তানটার টুঁটি ছিঁড়ে লিতাম। বহুরাণীকে বলেছি চৌধ্‌রী সাগা বহিন, তাই শালা পার পাইয়ে গেল।

বললাম, উত্তেজিত হয়ো না সিং, উপায় বের কর।

ও বলল, শালা রেঞ্জার যদি কারচুপি করে চৌধ্‌রী, তাহলে কণ্ট্রাক্ট পাওয়া যে মুশকিল হইয়ে যাবে।

বললাম, ভাবনার কথা সিং। তবু চেষ্টা কর যদি কোন উপায় বের করতে পার।

গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবতে লাগল সুজন সিং।

একসময় বলল, রেঞ্জার লিজার বাপকে কব্জা করতে চায়। আমাকে বলেছিল, লিজার বাপের দলটাকে কাম দিতে আমি দি নাই। তুমি বল চৌধ্‌রী, পুরানা দলকে খারিজ করি কোন কানুনে? গরীব আদমী ভুখায় মরবে। আমি অন্যায় কাম করব নাই। তুমি কি বল চৌধ্‌রী?

বললাম, তোমার বহুরাণীর মুখে এসব কথা শুনেছি।

ও বলল, বহুরাণী কি বলে?

আমি গলায় জোর এনে বললাম, বহুরাণী তোমার বহিন তো, তাই ভাইয়ের যা কিছু সবই তার চোখে ভাল মনে হয়।

ও বলল, বহুরাণী আমাকে ভালবাসে, আপনার সাগা ভাইয়ের মত।

গাড়ি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে গেলে চার্চটা আমার চোখে পড়ল। গাড়ি থামিয়ে সুজন সিং বলল, তুমি অপেক্ষা কর চৌধ্‌রী, আমি লিজাকে লিয়ে আসছি।

ও প্রায় লাফাতে লাফাতে পাহাড়ের পাকদণ্ডীর পথটা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি কিছুটা দূর থেকে দেখতে পেলাম সাদারঙের চার্চটা ঠিক যেন তরল গলিত সোনার জলে স্নান করছে।

আমি যেখানে বসে আছি সেখান থেকে ভ্যালিটা পুরো দেখা যাচ্ছে না, নদীর কিছুটা অংশ দেখতে পাচ্ছি। সেখানে স্রোতের ওপর সূর্যের আলো পড়ে ভাঙা আয়নার ঝিকিমিকি টুকরোর মত মনে হচ্ছে।

কতক্ষণ পরে একটা চাপা হাসির আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি সুজন আর লিজা আমার একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমাকে তাকাতে দেখেই সুজন বলল, তুমি তো কবি আছ চৌধ্‌রী, খালি আর্টিস্ট নেহি। আর আমার বাৎ শোন ঃ

চোর কা নেশা চোরি
কবি কা নেশা নারী।

তোমার লিয়ে এই নারীটিকে আনলাম চৌধ্‌রী, দেখ, এর একটা ছবি বানাতে পার কি না?

গাড়ি থেকে নেমে হেসে বললাম, এমন কথা বললে কিন্তু ছবি আঁকতে পারব না সিং।

সুজন সিংয়ের মেজাজ শরিফ। বলল, খুবসুরৎ জেনানা আঁখের সামনে হাজির থাকলে ছবি আপসে হইয়ে যাবে।

মেয়েটি ভাঙা ভাঙা দেহাতি হিন্দীর সঙ্গে টুকরো টুকরো ইংরাজী মিশিয়ে বলল, আপনাকে একদিন সন্ধ্যায় চার্চের সামনের লনে দেখেছিলাম। সেদিন আপনার সঙ্গে ছিলেন রেঞ্জার সাহেবের বউ।

বললাম, আপনার কথাও আমার বেশ মনে আছে। আপনি আমার বন্ধুর গাড়িতে সেই যে গেলেন আর ফিরলেন না। একা বন্ধু অনেক রাত করে ফিরে এল।

সুজন সিং বলল, তোমরা দুজনে বাতচিত করবার বহুৎ টাইম পাবে চৌধুরী, চল তোমাদের স্পটে রাখিয়ে আসি।

আমরা গাড়িতে উঠতেই সুজন সিং পাহাড় থেকে গাড়ি নিয়ে নীচে নামতে লাগল। ঘুরে ঘুরে সে এল ঐ উপত্যকার কাছে

গাড়ি থামিয়ে সে বলল, এসো আমার সঙ্গে ঐ পড়ো দুর্গটার পাশে।

আমরা তিনজনে এগিয়ে গিয়ে সেদিনের দেখা দুর্গটার পূব প্রান্তে হাজির হলাম। বন থেকে, চার্চের ওপর থেকে এ জায়গাটা একেবারে দেখা যায় না, কিন্তু এর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য আমাকে অবাক করে দিল।

গোলাপী আর সাদা কাঞ্চন ফুলের গাছে রাশি রাশি ফুল ফুটে জায়গাটাকে নিভৃত প্রকৃতির লীলাকুঞ্জ করে রেখেছে। একটা শাল আর একটা শিমুলের গাছ নীল শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আর কোথাও কিছু নেই। কয়েকটা পাথরের অমসৃণ স্তূপ কারা যেন সাজিয়ে রেখে গেছে। উত্তর আর পূব দিক জুড়ে বিরাট শ্যামশোভাহীন প্রান্তর। শুধু নদীর জলপ্রবাহ আর ছোট-বড় নুড়ির ছড়িয়ে পড়ে থাকার ছবিটুকু চোখে পড়ে এখান থেকে।

সুজন সিং বলল, চৌধুরী আজ তোমাকে ছোটনাগরার দুর্গেশ্বর করে রেখে গেলাম। এ জায়গাটায় আগে ছিল কোন হো-রাজার রাজধানী।

বললাম, ভগ্নদুর্গের অধিশ্বর।

ও বলল, তুমি খুশীসে আমার প্যারীর ছবি আঁক। খানা খাও। বহুরাণীর হাতের বানানো বহুৎ বঢ়িয়া খানা।

বললাম, তুমি যাবে কোথা?

ও বলল, শয়তানির মোকাবিলা করতে।

বললাম, সর্বনাশ, এখুনি সব জানাজানি হয়ে যাবে। আমার যা হয় হোক্, তোমার বহুরাণীর বিপদের আর শেষ থাকবে না।

সুজন সিং বলল, তুমি চৌধুরী আমাকে বুড়বক ভাবছ কেন? আমার বহুরাণী আর তোমাকে বিপদে ফেলে আমি কি পালিয়ে যাব। আমার মোকাবিলা দোসরা কিসিমের। ডরো মাৎ দোস্ত্।

ও হাতখানা শূন্যে তুলে চলে গেল। গাড়ির কাছে পেঁছে ও বলল, আমি চার বাজে আসবে, তখন ছবি দেখবে।

আমি হেসে ওর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লাম। ও গাড়িখানা বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

এখন আমি আর লিজা। ও আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসছে।

বললাম, এই নির্জন উপত্যকার পরিত্যক্ত দুর্গে যে এমন ফুলের মেলা দেখতে পাব তা একেবারেই ভাবিনি।

ও বলল, আর ক'দিন পরে এই শিমুলগাছে ফুল ফুটবে, তখন আপনাকে নিয়ে আসব।

বললাম, তোমাদের দেশ যত দেখছি ততই নতুন করে আবিষ্কার করছি।

ও মুখটা নীচু করে বলল, অনেক দেখার আছে বাবুজী। বনকে যেমন দেখছেন, বনের মানুষগুলোকে তেমনি দেখুন। বড় গরীব আছে আমার দেশের মানুষগুলো।

হঠাৎ বললাম, তুমি ওদের কথা ভাব লিজা ?

বলেই বললাম, সুজন আমার বন্ধু, তাই তোমার নাম ধরেই ডাকছি, কিছু মনে করলে না তো ?

ও তেমন মিষ্টি হেসে বলল, আমি আপনার চেয়ে সবদিক থেকেই ছোট। নাম না ধরে ডাকলে মনে মনে দুঃখই পেতাম।

একটু থেমে আবার বলল, আমি ওদের কথা ভাবি কিনা জিজ্ঞেস করছিলেন না ? ভাবি, অনেক সময় বসে বসে ভাবি। কিন্তু কোনো কুলকিনারা পাই না। ওদের কষ্ট দেখলে আপনার চোখে জল আসবে।

বললাম, ওরা কোন কাজ পায় না ?

ও বলল, কত লোক, আর কতটুকুই বা কাজ। সরকারী কাজের জন্যে কণ্ট্রাক্টর সাহেবরা আছেন। তাঁদের কাজে এরা নিযুক্ত থাকে। কিন্তু সবাইকে তো আর কাজ দেওয়া যায় না। তাছাড়া যারা কুলির কণ্ট্রাক্ট নেয় তারা ওদের হপ্তার পাওনা থেকেও অনেকটা কেড়ে নেয়। দুঃখ ওদের ঘোচে না বাবুজী।

বললাম, এরা আর কোথাও কাজ করতে যায় না ?

লিজা বলল, যায়, তবে খুব কম। এরা সুখ-দুঃখে একসঙ্গে কাটানোটাই পছন্দ করে।

বললাম, তোমার দেশের লোকেরা বড় বেশী মদ খায় লিজা !

ও বলল, মহুয়া এখানে সহজেই মেলে। ছেলে-বুড়ো সবাই সকাল থেকে মহুয়ার ফুল কুড়িয়ে বেড়ায়। মহুয়া দিয়ে মদ তৈরি করে খায়। কাজ না পাবার দুঃখ ভোলে, কম পয়সা পাবার দুঃখ ভোলে, আর ভোলে ছেলেমেয়েদের না-খেতে দেবার দুঃখ। এত সহজে বাবুজী এতগুলো দুঃখ কে ভোলাতে পারে মহুয়া ছাড়া !

বললাম, সে কথা সত্যি। আচ্ছা লিজা, ওরা কি চাষবাস করে না ?

লিজা বলল, আজকাল কিছু কিছু করছে। মকাইয়ের চাষ চলেছে কোন কোনো অঞ্চলে। যারা মেটে আলু ছাড়া আর কোন খাবারের নাম জানত না তারা এখন মাঝে-মধ্যে মকাই খাচ্ছে।

বললাম, হাটে-বাজারে মুর্গীর লড়াইয়ের ছবি আঁকতে গিয়ে দেখেছি, ছোট ছোট ছেলেরা নাচ দেখিয়ে খাবার চায়। মুর্গীগুলো যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে যুদ্ধ করে, ঠিক তেমনি ছেলেগুলোও তাদের মত লাফিয়ে লাফিয়ে মারামারির অভিনয় করে। খেলা দেখিয়ে ওরা কিছু খেতে চায়। কতক্ষণ নাচে, কিন্তু এতটুকু খাবার পেলেই খুশি।

ও বলল, ওরা একটু বড় হলে নদীতে সারাদিন ঘুরে ঘুরে মাছ ধরবে। ঐ মাছগুলোকে শুঁটকি বানাবে। তাছাড়া দুপুরবেলা বনের এক একটা

জায়গায় দেখবেন বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা জোঁদার সন্ধান করছে। এক ধরনের পিঁপড়ের ডিম ওগুলো।

বললাম, তোমাদের ছেলেদের কাঁধে তীর-ধনুক দেখতে পাই, ওরা কি শিকার করে ?

বলল, পাখ-পাখালি মেরে বেড়ায়। তাছাড়া লুকিয়ে চুরিয়ে বনের গাছ-গাছালিও কাটে। টাঙ্গির আওয়াজ জোর বেজে উঠলেই ফরেস্ট গার্ড'রা ছুটে আসে। ধরে নিয়ে যায়। বিনা মাহিনায় ক'দিনভোর খাটিয়ে নেয়। পালাবার চেষ্টা করে ধরা পড়লে রক্ষে নেই। বেতের মার পড়তে থাকে পিঠে।

এবার বললাম, সুজন সিং কুলিদের ঠিকমত মাহিনা মিটিয়ে দেয় নিশ্চয়ই ?

ও বলল, যতটুকু জানি, ও কাউকে এক পয়সা ঠকাবে না। তবে ও কুলি-কামিনদের হপ্তা থেকে কিছু পয়সা কেটে রাখে। তার থেকে দরকার মত ওদের ঝোপড়িগুলো মেরামত করে দেয়। ও বলে, একটু ভাল থাকতে না পেলে কাজ করবে কি করে।

বললাম, সিং সাহেবের একটা নাকি কুলির দল আছে, তাদের দিয়েই সব কাজ করায় ? অন্যদলের লোক বড় একটা নিতে চায় না ?

ও বলল, কথাটা ঠিক। ও চায় না, কুলি আর কণ্ট্রাক্টরের মাঝখানে আর কেউ থাকে। তাই ও ঘুরে ঘুরে ওর পছন্দমত লোক বেছে নিয়েছে।

ওর লোকেদের বড় বড় সংসার, বাচ্চা-কাচ্চা মেলা। ওদের কাজ দিয়ে ও যতদূর সম্ভব ওদের সংসারের কিছু সুরাহা করে দিতে চায়। ওর দল বলতে আলাদা কিছু নেই বাবুজী।

বললাম, তুমি সুজনকে খুব ভালবাস, তাই না লিজা ?

ও ঠোঁটের দুটো প্রান্তে হাসির রেখা ফোটাল। চোখ দুটো ছোট হয়ে এল। মুখটা নামিয়ে নিল ও।

বললাম, বড় বেশী ড্রিংক করে সুজন। তুমি কিছু বলতে পার না? অবশ্য মাতলামি করতে ওকে কোনদিনই দেখিনি।

ও বড় বড় চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। বলল, অনেকদিন বলতে গিয়েছি বাবুজী, ও আমার মুখ হাত দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। আমার চোখ দিয়ে জল গড়ালে ও বলেছে, লিজা চারদিকে বহুৎ দুখ আছে, আমি দুখ ভুলবার লেগে মদ খাই। আমি বলি, তোমার কি দুখ আছে বল ? ও অমনি বলে, আমার প্যারকে আভিতক্ পেলাম না। ইস্‌সে বড় দুখ কিছু আছে নাই।

লিজার কথা শুনে বললাম, যদিও লিজা আজই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ তবু দু'একটা কথা তোমার কাছে জানতে চাই।

ও অসংকোচে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বললাম, তোমার সুজনের বিয়েতে বাধা কোথায় ?

ও বলল, বাধা আমার বাবা। তিনি রাজপুত। এ বনে আমার

ঠাকুরদাদা ফরেস্ট গার্ডের কাজ নিয়ে আসেন। বাবা তাঁর সঙ্গেই এসেছিলেন। এখানে থাকতে থাকতে আমার বাবা একটি হো-মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করেন। আমি তাঁদেরই একমাত্র মেয়ে। ঠাকুরদাদা বাবার ওপর প্রচণ্ড রেগে কাজ ছেড়ে চলে যান। বাবা মাকে নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে পড়েন। কোন কাজ জোটাতে পারেন না। শেষে মা ঐ চার্চের ফাদারের কাছে ঘরদোর পরিষ্কার করার একটা কাজ পেয়ে যান। আমি তখন খুব ছোট।

এই চার্চের লনেই খেলা করে বেড়িয়েছি। ফাদার আমাকে ছোট থেকে বড় হতে দেখেছেন। শুধু দেখেন নি, তিনি বড় হয়ে উঠতে নানা দিক থেকে সাহায্য করেছেন। আমি ওঁর কাছ থেকেই সামান্য যা কিছু লেখাপড়াও শিখেছি।

আমার মা অনেক আগেই মারা যান। আমি চার্চের প্রার্থনা ঘরটি সাজিয়ে রাখার কাজ পেয়ে যাই।

বাবা যখন দেখলেন, আমি লেখাপড়া শিখে বড় হয়েছি তখন তিনি আমাকে আর চার্চে রাখতে চাইলেন না। আমি দুঃখ পেয়েছিলাম, কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি বাবার আসল পরিকল্পনার কথা।

বাবা আমাকে কাছে নিয়ে গেলেন। বাবাকে দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখে আমার মন কেঁদে উঠল। আমি তাঁকে সহানুভূতির সঙ্গে সেবা-যত্ন করতে লাগলাম।

কিন্তু দিনের পর দিন দেখলাম বাবা আত্মসম্মান হারিয়ে সামান্য কাজ পাবার জন্যে আমাকে বড় বড় অফিসারের কাছে পাঠাচ্ছেন।

প্রথম প্রথম এ ব্যাপারে গুরুত্ব না দিয়েই গিয়েছি, কিন্তু দিনের পর দিন দেখেছি ওদের বীভৎস চেহারাগুলো।

শুধু ব্যতিক্রম ছিল একটি মানুষ। সে আপনার বন্ধু সুজন। তার কাছে বাবা আমাকে অনেকবার পাঠিয়েছেন। কয়েকবার যাতায়াতের পর আমাকে ওর ভাল লেগে যায়। আমিও ওকে দেখে মনের মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকি।

একদিন আমরা দুজনে একটা নদীর ধারে বসে পরস্পরকে ভালবাসার কথা জানাই।

উঠে যাবার সময় ও আমাকে বলল, লিজা তোমাকে আমি ভালবাসি, আর ঐ ভালবাসার জোরে একঠো বাৎ বলব, তোমার বাপকে আমি কুলিকামিনের কণ্ট্রাক্ট দিতে পারব নাই।

বললাম, সে তোমার মর্জি। আমার ভালবাসার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

বাবাকে একসময় বললাম, সুজন, কুলি আর কণ্ট্রাক্টরের ভেতরে আর কাউকে রাখতে নারাজ।

কথাটা শোনার পর থেকে বাবা মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু সুজনের সঙ্গে দেখা হলে কিছু বলতেন না। আজও কিছু বলেন না।

আমার মনে হয় এখনও বাবা আশা ছাড়েন নি একেবারে।

লিজার কথা শুনে বললাম, কিন্তু কিছু যদি মনে না কর তাহলে আর একটা প্রশ্ন তোমাকে করব।

লিজা বলল, সে প্রশ্নটা কি রেঞ্জার সাহেবকে নিয়ে?

আমি বললাম, তুমি কি মুখ দেখে বুঝতে পার নাকি লিজা?

ও বলল, বলুন না আমার অনুমান ঠিক কিনা?

বললাম, ঠিকই ধরেছ, এখন উত্তরটা তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

ও বলল, আজ আপনাকে যে কথাটা বলব তার সবটুকু সুজনকেও বলিনি আমি কোনদিন। শুধু অনুরোধ, এ বিষয়ে কোন কথা আপনি আপনার বন্ধুকে বলবেন না।

বললাম, কথা দিচ্ছি লিজা।

ও বলল, বাবা যখন দেখলেন সুজনকে সহজে হাত করা যাবে না, তখন রেঞ্জারকে ঘরে আমন্ত্রণ করে আনলেন। বাবার অনুরোধে রেঞ্জারকে আমি আতিথ্য দিলাম। সেদিন থেকে আমার ঘরে শুরু হল ওঁর ঘন ঘন যাতায়াত। আমি ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলতে পারলাম না। এখন তো ওঁর আচরণ দেখে আর কথাবার্তা শুনে মনে হয় উনি মিসেস ভট্চাযকে ভুলতে বসেছেন।

বললাম, এতটা পতনের সুযোগ তুমি ওঁকে নাও দিতে পারতে লিজা।

ও বলল, সে অনেক কথা বাবুজী। ইতিমধ্যে আমার বুড়ো বাবাকে রেঞ্জারসাহেব সামান্য একটা পিয়নের কাজ দিয়েছেন। আম ওঁকে এখুনি অনাদর করলে উনি আমার বাবাকে কাজে বরখাস্ত করে দিতে পারেন।

তাছাড়া বাবা যাই করুন না কেন আমার মাকে বড় ভালবাসতেন। আমি আমার বুড়ো বাবাকে নিয়ে বাইরে কোথাও চলে যেতে পারতাম, কিন্তু মায়ের স্মৃতিটুকু আগলে এখানেই পড়ে থাকতে চান বাবা। তাই আমার হয়েছে দুদিকের সংকট।

এদিকে আর একটি কথা। ড্রিংক করে যেদিন রেঞ্জার আসেন আমার ঘরে, সেদিন ওঁর মুখ থেকে সুজনের বিরুদ্ধে এমন সব পরিকল্পনার কথা জানতে পারি, যা সুজনকে সাবধান করার ব্যাপারে আমার কাজে লাগে।

বললাম, তুমি যে সুজনের এ রকম উপকার করছ তা কি ও জানে?

লিজা বলল, ওর হিতের জন্য যদি কিছু করেও থাকি তাহলে সে কথা কোনদিন আমার বুকের ভেতর থেকে বের হবে না বাবুজী।

বললাম, তোমার ঘরে যে রেঞ্জারের যাতায়াত আছে তা কি সুজন জানে না? যদি জানে তাহলে সে কি তোমাকে কিছু বলে না?

লিজা বলল, খুব জানে। তবে আমাকে কোন কথা বলে না। একদিন শুধু এই পলাশগাছটার পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিল, লিজা, মানুষ যাকে ভালবাসে তাকে সন্দেহ করতে নাই। সন্দেহ করলে সে আপনি জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে যায়।

আমি সেদিন শুধু ওর দিকে তাকিয়েছিলাম বাবুজী। কোন কথা

বলতে পারিনি। রাতে ঘরে শুয়ে যীশুর কাছে বলেছিলাম, আমি হয়তো অনেক পাপ করেছি প্রভু, তবে ওকে যে ভালবাসা দিয়েছি তাতে খাদ নেই এক ফোঁটা।

বললাম, সুজন তোমার পাশের ঐ শালগাছটার মতই সরল আর বলিষ্ঠ। তোমার মাথার ওপরের ঐ আকাশের মত ওর মনটা রোদ-ঝলমল। আবার হু হু করে ছুটে আসা ক্ষ্যাপা হাওয়ায় ফুটে ওঠে ওর রাগের ছবি।

লিজা বলল, আপনি ওর চরিত্রটা সুন্দর একটি কবিতা করে বললেন। কিন্তু আমিও জানি, এটাই ওর ঠিক ঠিক পরিচয়।

বললাম, সবচেয়ে যে জিনিসটা ওর আমাকে আকর্ষণ করে তা হল ওর মনের সোজাসুজি প্রকাশ। কথাগুলো সুজনের কখনো পাহাড়ী পথের মত এঁকে-বেঁকে অথবা উঁচু-নীচু হয়ে চলে না।

লিজা বলল, ইতিমধ্যে ও এক কাণ্ড করে বসেছে ভাইসাহেব।

লিজা হঠাৎ করে আমাকে ভাইসাহেব বলায় একটা খুশীর কদম ফুল ফুটে উঠল আমার মনে।

বললাম, তুমি আমাকে আজ ভাই বলে ডাকলে, এমন মন ভরানো ডাক শোনার সৌভাগ্য আমার আর কোনদিন হয়নি লিজা।

ও হেসে বলল, সৌভাগ্যটা আপনার চেয়ে আমার একটুও কম নয় ভাইসাহেব।

বললাম, এখন যা বলতে চাইছিলে বল। কি কাণ্ড আবার করে বসল সুজন ?

লিজা বলল, একদিন আমাকে খুঁজতে এসে ও কোথাও না পেয়ে একেবারে উঠে গেল ঐ ওপরে ফাদারের ঘরে।

ফাদার ওকে কোনদিন দেখেননি। কিন্তু তাতে কি আসে যায়। ও কিছুক্ষণের ভেতরই কথা বলে ফাদারের মন এমন জয় করে নিল যে ফাদার আমাকে চার্চের ঘর থেকে ডেকে পাঠালেন।

আমি ফাদারের কাছে গিয়ে ওকে দেখে তো অবাক। বিশ্বাস নেই, কথায় কথায় কি বলতে কি বলে ফেলেছে।

ঠিক তাই, ও যে আমাকে ভালবাসে তা বৃদ্ধ ফাদারকে ইতিমধ্যেই বলে বসে আছে।

আমাকে দেখেই ফাদার আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাতটি তুলে বললেন,

The Lovers are timeless, eternal.
The Lovers are young and beautiful.
The Lovers are as free and natural
as the sunlight, sand and sea.

আমি দারুণ লজ্জিত হলাম, কিন্তু মনে মনে খুশী হয়ে উঠলাম। ফাদারের ঐ কথাগুলো আয়নার ওপর ফুটে ওঠা আমাদের প্রতিবিম্ব বলে মনে হল।

ফাদার আমাদের জলযোগ করিয়ে বললেন, লিজা, তোমার এই বন্ধু নির্বাচনে আমি খুব খুশী হয়েছি। ক'দিন তোমরা ঘুরে বেড়াও। কাজ থেকে এ ক'দিন তোমার ছুটি।

আমি লিজাকে বললাম, তুমি কিংবা আর কেউ হলে ফাদারকে এত সহজে ভালবাসার কথা বলতে পারতে না। সুজন বলেই পেরেছে। ওর মনের ভেতর যে ঘর তার জানালা-দরজাগুলো সব সময় খোলা। সেখানে সারাক্ষণ আলো-হাওয়ার আমন্ত্রণ। ওর মনের মহলগুলোতে একটাও চোরাকুঠুরী নেই।

লিজা শালগাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনছিল। তার মন কিন্তু ঘুরছিল ঐ মানুষটার চারদিকে। আমি লিজার চোখের চাহনি থেকেই বুঝলাম, ও অন্য জগতে হারিয়ে গেছে।

খুব ভাল লাগল ওর হারিয়ে যাবার এই ছবিখানা।

আমি ক্যানভাসে স্কেচ করতে লেগে গেলাম।

মুখের মিষ্টি আদল আর ভাসা ভাসা চোখের হারানো ছবিটা ক্যানভাসে ফুটে উঠতেই আমি বললাম, তুমি যার কথা ভাবছিলে সে তোমার এ ছবি দেখে নিশ্চয়ই খুশী হবে।

লিজা বলল, আপনি কিন্তু আমাকে একটুও প্রস্তুত হতে দিলেন না।

বললাম, প্রস্তুত হতে গেলেই ছবি হয়ে থাকত, ছবিতে লাইফ আসত না।

ওকে এবার বললাম, তুমি ঐ পিংক রঙের কাঞ্চনফুল খোঁপায় গুঁজে দাঁড়াও তো দেখি।

ও সামনের বনে চলে গেল।

আমি ওর সুন্দর দেহভঙ্গিমার স্কেচ করতে লাগলাম।

লিজা কাঞ্চন ফুলের বন থেকে চেঁচিয়ে বলল, ভাইসাহেব ফুল তো তুললাম, কিন্তু কেমন করে খোঁপায় দেব একটু বলে দেবে?

ছবি থেকে মুখ না তুলেই বললাম, তুমি ঠিক যেমন করে ফুল দাও খোঁপায় তেমনি করেই দেবে।

ও এসে দাঁড়াল সেই শালগাছের পাশে। আমার স্কেচ দেখতে লাগল।

স্কেচ শেষ হলে আমি মুখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। ভারী সুন্দর মানিয়েছে ওকে। একপাশ করে বাঁধা বাঁকা খোঁপায় গোলাপী রঙের কাঞ্চনফুল দুটি ছোট ছোট সবুজ পাতা নিয়ে জেগে আছে।

হেসে বললাম, আমি চেষ্টা করলেও লিজা তোমার মত ঠিক জায়গায় ঠিকভাবে ফুলটি লাগাতে পারতাম না।

ও বলল, এমন করে বলবেন না ভাইসাব, আপনি হলেন আর্টিস্ট।

বললাম, তোমরা হলে সবসেরা আর্টিস্ট। সুন্দর করে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে তোমাদের স্বাভাবিক দক্ষতা। সেখানে অনেক বড় আর্টিস্টও হার মেনে যায়।

ও এবার পাথরের একটা স্তূপে বসে পড়ল। আমি স্কেচের ওপর রঙ-

তুলির কাজ করে চললাম। ও নিবিষ্ট আগ্রহে দু-চোখ পেতে দেখতে লাগল আমার কাজ।

বেশ বেলা অবধি ছবি আঁকলাম। সামান্য কাজ বাকী রেখেই উঠে পড়লাম। খাবার বেলা পেরিয়ে যাচ্ছিল। একটানা রঙের কাজ করতে করতে কাজের ঔজ্জ্বল্য চোখের ওপর অস্পষ্ট হয়ে আসছিল। ছবি আঁকতে গেলে এমনি হয় অনেক সময়। কিছুক্ষণ বিরতির পর নতুন রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে ছবি।

লিজা আমার টিফিন ক্যারিয়ার থেকে খাবার বের করতে গিয়ে বলল, বহুরাণী অনেক খাবার দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু। আমরা তিনজন খেলেও শেষ করতে পারতাম না।

হেসে বললাম, সুজনের জন্যে নিশ্চয়ই তোমার মন কেমন করছে, তাই না?

ও বলল, তা কেন। ও নিজের মর্জিতেই চলে। খাবার জন্যে সাধলেও খায় না। আবার যেদিন ইচ্ছে হয় লোভীর মত এটা ওটা চেয়ে-চিন্তে খেয়ে যায়।

আমরা খাবার পরে ঐ পড়ো দুর্গটার ভেতর ঘুরেঘুরে দেখতে লাগলাম। মাঝে মাঝে নানা ধরনের ছোট ছোট ঝোপঝাড় দেখা গেল। অসংখ্য প্রজাপতির যেন মেলা বসে গেছে। পাহাড়ী ফুলের মধু খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা।

ওদিকে পরিত্যক্ত দুর্গের প্রাকার ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার মনে হল, আমি যেন সম্ভ্রান্ত অতিথির মত বিচরণ করছি অতীতের কোন প্রাসাদের অভ্যন্তরে। অজস্র সুবেশা তরুণী প্রজাপতির মত নাচতে নাচতে আমাকে নিয়ে চলেছে রাজপুরীর গোপন অন্তঃপুরে।

আমার বুক কি এক আনন্দ আর উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। শৈলপুরীর নৃপতি হয়তো এখুনি তাঁর কন্যার হাত ধরে উপস্থিত হবেন আমার সামনে। বলবেন, শিল্পী, তুমি আজ আমার এ প্রাসাদপুরীর সবচেয়ে সম্মানীয় অতিথি। আমার এ কন্যাকে দিলাম তোমার হাতে সামান্য সম্মান-দক্ষিণারূপে। তুমি একে গ্রহণ করে আমার এ শৈলসাম্রাজ্যকে ধন্য কর।

আমি যেন হাত ধরলাম নতমুখী কম্পিত কন্যার।

সহসা কেঁপে উঠল পায়ের তলার প্রস্তর। হঠাৎ সমস্ত প্রাসাদ, দুর্গ, নগরী ধীরে ধীরে নেমে গেল কোন অতলে।

আমি চীৎকার করে উঠতে গেলাম। গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরুল না।

স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতেই দেখলাম, আমি একটা উঁচু পাথরের স্তম্ভের মত কিছু ধরে রয়েছি। প্রজাপতিগুলো উড়ছে।

আমার মুখের হয়তো কিছু অস্বাভাবিক ছবি লিজার চোখে পড়ে থাকবে। ও আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, ভাই সাহেব, আপনি কি কোন

রকম অস্বস্তি বোধ করছেন ?

আমি হেসে উঠে বললাম, না না, একটুও না। শুধু মনে হচ্ছে এই বিচিত্র রঙের প্রজাপতিগুলো হয়তো লুপ্ত শৈলনগরীর রাজনর্তকী ছিল।

লিজা হেসে বলল, আপনি সত্যিই কবি, ভাইসাহেব।

এবার ফিরে এলাম আমার ছবির সামনে। এ কে দাঁড়িয়ে আছে! একটা মগ্ন মাধুরীর আশ্চর্য সুন্দর ছবি। মনে হল, শকুন্তলা কি এমনি করে তাকিয়েছিল নিজের মনের গভীরে প্রিয়তমের সন্ধানে! ক্রুদ্ধ দুর্বাশার অভিশাপও তার মগ্ন চেতনাকে জাগ্রত করতে পারেনি।

বললাম, লিজা, এ তোমার জীবনের এক অক্ষয় মুহূর্ত। আমার কথা শুনতে শুনতে তুমি যখন সুজনের চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলে, তোমার তখনকার সেই সুন্দর মগ্নতাটুকু ধরে রাখার চেষ্টা করেছি এই ছবিতে।

লিজা বলল, আপনার তুলিতে সব কিছু সুন্দর হয়ে ওঠে।

বললাম, তুমি সুন্দর না হলে সাধ্য কি আমার তুলির তোমাকে সুন্দর করে তোলা। দেখ লিজা, তোমার বহুরাণী কিন্তু তোমার রূপের অনেক তারিফ করেছিল আমার কাছে।

লিজা বলল, বহুরাণী আমাকে ভালবাসেন নিশ্চয়ই, তাই আমার খারাপ কিছু তিনি দেখতে পান না। তাছাড়া আমাদের বহুরাণী নিজে সুন্দর তাই তিনি সবাইকে সুন্দর দেখেন।

বললাম, তোমার বহুরাণী আমার ছবির প্রেরণা লিজা।

ও মিষ্টি হেসে ভ্যালির দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, আমি জানি, বহুরাণী আপনাকে খু-উ-ব ভালবাসেন।

আমি এর কোন উত্তর দিলাম না। সুজনের কাছ থেকে লিজা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে।

বললাম, এবার তোমার ছবির কাজটুকু তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে হবে, না হলে সুজন এলে কি কৈফিয়ৎ দেব তার কাছে।

আমি সামান্য যা বাকী ছিল তাই শেষ করার কাজে লেগে গেলাম।

আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ও দেখতে লাগল নিজের ছবি।

আমরা দুজনেই অল্প সময়ের ভেতরে মগ্ন হয়ে গেলাম। একজন আঁকার কাজে, আর অন্যজন দেখার কাজে।

ছবিতে শেষ তুলির টান দিয়ে চোখ তুলতেই সামনে একটা দীর্ঘ ছায়া দেখতে পেলাম। ছায়া অনুসরণ করে গিয়ে যাকে ধরলাম সে কতক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে আছে তা জানতে না পেরে বললাম, তুমি এমন নিঃশব্দে এলে যে, মনে হচ্ছে এই দুর্গ ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছ।

আমার কথা শুনে চমকে তাকাল লিজা। তার চোখে-মুখে বিস্ময়। সে এতক্ষণ ছবির ভেতর ডুবে গিয়েছিল।

সুজন সিং বলল, বহুৎ তারিফ করবার মত ছবি এঁকেছ তুমি চৌধুরী।

আমি অমনি বললাম, এতদূরে দাঁড়িয়ে থেকে কিই বা দেখলে ছবির যে

এমন করে তারিফ করছ ?

সুজন বলল, যার ছবি তাকেই আমি দেখতে আছি এতক্ষণ। লিজা তো একদম মশগুল হইয়ে আছে। পানি 'পর আপনা ছায়া দেখতে আছে কমল। ইস্‌সে বড়া সার্টিফিকেট কোথাও মিলবে নাই চৌধুরী।

বললাম, ভাল মন্দ বুঝি না, তোমার পছন্দ হলেই আমি খুশী।

সুজন এবার এগিয়ে এসে আমার আঁকা ছবিখানা তুলে ধরে দেখতে লাগল। তার চোখে-মুখে তারিফ যেন উপচে পড়ছিল।

এক সময় ছবিখানা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, একটু সিধা করিয়ে ছবিখানা পাকড়ায়ে রাখ তো চৌধুরী।

আমি তাই করলাম।

হঠাৎ সুজন এক কাণ্ড করে বসল। দুহাতে লিজাকে তুলে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল আমার পাশে।

তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে পিছু হটতে হটতে বলল, এখন মিলিয়ে দেখতে আছি কোন জন সেরা আছে। ছবির লিজা, না আসলি লিজা।

আমি হেসে বললাম, চিরদিন তোমার আসল লিজাই তোমার চোখে সেরা হয়ে থাক এই কামনাই করব।

লিজা অমনি আমার হাত থেকে ছবিখানা কেড়ে নিয়ে বলল, এ ছবি আমি কাউকে দেব না ভাইসাহেব। এ ছবি কাছে পেলে তোমার দোস্ত বিলকুল আমাকে ভুলে যাবে।

সুজন সিং আবার সেই হা হা হা হা হাসিতে ভ্যালির বাতাসে ঢেউ তুলতে লাগল।

সেদিন আমরা আর বেশী সময় থাকি নি সেখানে। গাড়িতে ওঠার আগে সুজন একহাতে আমার ছবি আর অন্যহাতে লিজাকে ধরে নিয়ে এল। লিজার মুক্তির জন্যে ক্ষীণ প্রতিবাদ সুজনের বলিষ্ঠ বাহুর বাঁধনে চাপা পড়ে গেল।

গাড়িতে আসতে আসতে সুজন বলল, কাল রাঁচী যাচ্ছি চৌধুরী।

বললাম, হঠাৎ রাঁচী, কি ব্যাপার ?

ও বলল, ফিরে এসে বলব।

প্রায় দু'সপ্তাহ কেটে গেছে, সুজন সিংয়ের দেখা নেই। আমি আর সেংজুতি মাঝে মাঝে কাছে পিঠে ঘুরে বেড়াই। কখনো মর্জি হলে রেঞ্জারসাহেব আমাকে তাঁর গাড়িতে নিয়ে যান এদিক ওদিক।

একদিন আমি আর মিঃ ভট্‌চায জীপে করে গেলাম পোসাং। সেখানে এক টিম্বার মার্চেন্টের অফিস। টিনের ছাউনি দেওয়া অফিস ঘরটি এবং তার সংলগ্ন বাগান দেখে খুব ভাল লাগল। চেষ্টা করলেও বোধহয় এমন সুন্দর একটি ছবি তুলি দিয়ে আঁকা সম্ভব হবে না। প্রকৃতি সেখানে শুধু রূপ ঢেলেই চুপ করে বসে নেই, পাখিদের পাঠিয়েছে সুর-বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য।

হলুদ রঙের থোকা থোকা টেকোমা ফুল ফুটে আছে। তিলাই গাছে ফুটেছে ছোট ছোট সাদা ফুল। তেউড়ির লতা ঝুলছে বারম গাছের থেকে। নীলে সাদায় মেশা ফুল ফুটেছে লতায়।

কেলাউন্দার ঝোপ থেকে দুটো ফুটফুটে হলুদ পাখি বেরিয়ে এল। টিউ টিউ কিচ্ কিচ্ গান আর লাফিয়ে লাফিয়ে নাচ। বাংলো বাড়ির পেছনে ছোট্ট পাহাড়। হেসেল, বীজা আর শিমুলের বন। সাংকারলা লতায় সাদা সাদা ফুল ফুটিয়ে বনের হো-মেয়েরা যেন হাসছে ; হলুদ রঙের কেশর দুলছে হাওয়ায়।

এক ঝাঁক টিয়া ট্যাঁ ট্যাঁ করতে করতে সবুজ পাতার মত আকাশ থেকে ঝরে পড়ল কৃষ্ণচূড়া গাছের ওপর।

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম নির্জন প্রকৃতিলোকের এই আনন্দ আয়োজন। দুখানা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। পাশে কাঠ চেরাইয়ের ঘর। ট্রাকের ওপর তিনটে কুলি ঘুমোচ্ছে। একটু পরে কাঠ বোঝাই হবে। সারারাত বন পেরিয়ে গাঁ গঞ্জ পেরিয়ে ট্রাক বোঝাই কাঠ যাবে কোন দূর স্টেশানে। ওয়াগন বোঝাই হয়ে সে কাঠ গিয়ে পেঁছিবে বড় বড় শহর নগরের ব্যবসা কেন্দ্রে।

রাতের বন পাহাড় পেরিয়ে যখন ট্রাক চলবে তখন পাশের বন আলোয় ফুটে উঠে মুহূর্তে পিছলে যাবে অন্ধকারের সমুদ্রে। বাঁকের মুখে হর্ণ বাজলে ঘুম ভেঙে পাখা ঝাপটাবে বনের পাখি।

ট্রাকে বসে ঘুম তাড়ানি গান গাইবে কুলিগুলো। কচিৎ কখনো গরুর গাড়ি পথে পড়লে ড্রাইভার থেকে সবকটা কুলি চুটিয়ে গাল পাড়বে। যে গালমন্দের ভাষা সভ্যসমাজে একেবারে অশ্রুত। একান্ত ওদেরই নিজস্ব শব্দ আর ভাষায় শ্রীমণ্ডিত। মহুয়ার মদ খেয়ে যাবে ওরা। ক্লান্তিহরা উত্তেজনায় কাটিয়ে দেবে এই পথচলার দীর্ঘ রাত।

আমি ঘুরে ঘুরে দেখছি বাংলোর চারদিক, আর আমার হাতে মুখে জামাকাপড়ে গড়িয়ে পড়ছে অপরাহ্নের সোনালী মধু-রঙের রোদ। আমি ছোট ছোট ছবি দেখছি আর তার এক একটিকে ধরে মনে মনে রঙে রসে জাল বুনে চলেছি।

মিঃ ভট্চায এতক্ষণ অফিস ঘরের ভেতর টিম্বার মার্চেণ্টের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ভেতর থেকে যে দু'এক টুকরো কথা ভেসে আসছিল তাতে গোপন কাঠ লেনদেনের কিছু গন্ধ ছিল।

একসময় কথা শেষ করে বেরিয়ে এলেন রেঞ্জারসাহেব।

আমাকে সামনে দেখেই বললেন, চলুন, কইনা নদীটার কাছ থেকে আপনাকে একটু ঘুরিয়ে আনি।

বললাম, দারুণ সুন্দর জায়গায় আজ আপনার সঙ্গে এসে পড়লাম।

মিঃ ভট্চায গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়েই বললেন, বন হল রত্নের আকর মিঃ চৌধুরী। কেউ বা ফলের শোভায় মশগুল হয়, আবার কেউ বা ফল

সংগ্রহের কাজেই ব্যস্ত থাকে। কবিরা কাব্য লিখেই আনন্দ পায়, আর আপনাদের প্রকাশকেরা তাই বেচে দু'পয়সা ঘরে তোলে।

হেসে বললাম, মিঃ ভট্‌চায, দু'একজন ভাগ্যবান কবি ছাড়া প্রকাশকের নেক নজরে বড় একটা কেউ পড়েনা।

এবার আমি অন্য কথা পাড়লাম, আচ্ছা মিঃ ভট্‌চায, আপনি যে এত বনে বনে ঘুরে বেড়ান, বন ছেড়ে যেদিন চলে যাবেন সেদিন মন কেমন করবে না?

মিঃ ভট্‌চায বললেন, নিশ্চয়ই করবে। তবে আপনাদের মত বনের শোভা না দেখতে পেয়ে আমার মন এতটুকুও কেমন করবে না, তার রসটুকু আর নিঙড়ে নিতে পারব না বলেই মন মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে।

আমরা টুকরো টুকরো কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলেছিলাম। রেঞ্জারসাহেব আজ একেবারে দিল দরিয়া। একটু আগেই টিম্বার মার্চেন্ট ওর গলাটা হয়ত ভিজিয়ে দিয়েছে। তাই কথাবার্তা পিছল পথে বাধাহীন বেরিয়ে আসছে।

নদীর ধারে গাড়ি থামিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কি যেন দেখলেন রেঞ্জার।

একসময় বললেন, এখান থেকে ছ'সাত মাইল সারান্দার দূরত্ব। এটাকে বলতে পারেন নো ম্যান্‌স্‌ ল্যান্ড। এখানকার চাল চলনে খবরদারি করবার কোন এক্তিয়ার আমাদের নেই। ফরেস্টের মূল্যবান জিনিস পাচার হয় এই পথে।

বললাম, ফরেস্ট গার্ডরা রয়েছে বনের সম্পত্তি রক্ষার জন্যে।

রেঞ্জারসাহেব বললেন, গার্ডদের রক্ষার জন্যে আবার আছে এইসব চোরাচালানকারীরা।

বললাম, এটা দারুণ অন্যায়। যাদের হাতে রক্ষণের ভার তারাই করছে ভক্ষণ।

রেঞ্জারসাহেব হেসে উঠলেন। বললেন, আপনি তো দেখছি মশায় ভীষণ নীতিবাগীশ। কষ্ট আছে আপনার কপালে।

বললাম, নীতির কথা নয়, আমার ওপর দেওয়া কর্তব্যটুকু আমি করব না!

মিঃ ভট্‌চায বললেন, বলুন, আমার দেশের কোন্‌ মানুষটা তার কর্তব্য ঠিক ঠিক পালন করে চলেছে। স্বামী স্ত্রীর কর্তব্য, ছাত্র শিক্ষকের কর্তব্য, দেশ আর দেশসেবকের কর্তব্য কি পালিত হচ্ছে? কর্মীরা কি কাজে ফাঁকি দিচ্ছে না? মালিক কি বঞ্চিত করছে না তাদের? মন্ত্রীরা কি ভদ্রলোকের কথা দিয়ে হামেশা কথার খেলাপ করছেন না? বলুন মিঃ চৌধুরী, তাহলে আমরা এই কটা বনের প্রাণী সততার সঙ্গে কর্তব্য করে গেলে ধরায় কোন্‌ স্বর্গ নেমে আসবে?

আমি শুধু মাথা নাড়লাম। এখানে প্রতিবাদ করা বৃথা। রেঞ্জারের প্রতিটি কথাই সত্য। কিন্তু তার চেয়েও সত্য আছে, সে সত্য হল, প্রতিটি

মানুষ সততার সঙ্গে কাজ করলে দেশের এই হাল একদিন পাল্টাবেই।

আমার বিশ্বাসের কথা রেঞ্জারকে আর কিছু বললাম না।

রেঞ্জার বললেন, এই মেয়ে পুরুষের কথাই ধরুন না। স্বামী অথবা স্ত্রী মনে মনে ব্যভিচার করলে দোষ হয় না, কেবল প্রকাশ্যে করলেই যত অপরাধ। আচ্ছা, মিঃ চৌধুরী আপনি কাউকে কাছে পেতে চাইলে সেটা অন্যায় হবে কেন? ক্ষিদে পেলে যদি আমরা সবার সামনে খেতে পারি তাহলে দেহ বা মনের ক্ষুধায় লুকিয়ে খাব কেন? এইজন্যে আমি পশুদের যথেচ্ছ মেলামেশা পছন্দ করি। তাদের ভেতর লুকোচুরির ব্যাপারটা নেই।

হেসে বললাম, তাদেরও কিন্তু সংসার আছে। তারাও মেয়ে-পুরুষ সন্তান-সন্ততি নিয়েই বাস করে। তাদের মেয়ে পুরুষের ভেতর ভালবাসা কম নয়।

রেঞ্জার বললেন, বহু পশুই তাদের নিজস্ব সংসার জীবন থাকলেও একাধিক পশুতে স্বাভাবিকভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে। আমাদের বেলায় তাহলে এত অকারণ আবরণ কেন?

বললাম, এ রুচি আর পছন্দের ব্যাপার মিঃ ভট্চায। অনেকে মনে করেন আবরণটা সৌন্দর্যেরই একটা অঙ্গ।

মিঃ ভট্চায বললেন, আপনারা আর্টিস্ট মানুষ মশাই, আপনাদের সঙ্গে এখানেই আমাদের গরমিল।

বাহা পরবের সময় হো-মেয়েরা যখন নাচে তখন আমরা যে নাচ দেখে মেতে যাই সেটা ওদের সঙ্গ লাভের ইচ্ছায়। আপনারাই তো বলেন মশাই, বসন্ত নাকি মিলনের ঋতু। এই বসন্তে ওরা যখন দেহে ঢেউ তুলে নাচে তখন তার ভেতর পুরুষকে ডেকে নেবারই ইংগিত থাকে। এরপর মহুয়া খাবার পালা। দেখবেন, সারা পূর্ণিমার রাত ওরা মহুয়া খেয়ে বনের ভেতর মেয়ে পুরুষে লুটোপুটি করছে।

হঠাৎ মিঃ ভট্চায কথা থামিয়ে গাড়ির পাশে দৌড়ে গিয়ে ব্যাগ থেকে বাইনাকুলারটা টেনে নিয়ে চোখে লাগিয়ে দূরে কি যেন দেখতে লাগলেন।

আমাকে কাছে ডেকে বাইনাকুলারটা হাতে দিয়ে বললেন, দেখুন মিঃ চৌধুরী কাঠ পাচার হচ্ছে কি রেটে।

আমি চোখে বস্তুটি লাগাতেই কয়েকখানা কাঠ বোঝাই সারিবদ্ধ ট্রাককে আমার একেবারে সামনে দিয়ে নদী পার হয়ে যেতে দেখলাম।

বাইনাকুলার নামিয়ে মিঃ ভট্চাযের হাতে দিতেই, সেটিকে ব্যাগে রাখতে রাখতে বললেন, উঠুন তাড়াতাড়ি, দেখি একবার শালাদের।

জীপ নিয়ে আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছবার আগেই দেখি কয়েকখানা গাড়ি প্রাণফাটা আর্তনাদ তুলে কইনা নদী পার হয়ে গেছে।

শেষের দুটি গাড়ির সামনে আমাদের জীপ দাঁড়িয়ে গেল। আমার মনে হল, ইচ্ছে করলে ঐ বিরাট আকারের মজবুত শক্ত লরিটা এক ধাক্কায় আমাদের দেশলাই বাক্সের মত জীপটাকে কইনা নদীতে উল্টে ঠেলে ফেলে দিতে পারে।

কিন্তু তা করল না। আমি দেখলাম, রেঞ্জারও নামলেন না গাড়ি থেকে। যার গরজ সেই আসবে আগে।

শেষে একখানা বোঝাই লরি থেকে নেমে এল একটি লোক। পাক্কা ব্যবসাদারের মত মাথাটি হেঁট করে একফালি হেসে নমস্কার জানাল।

রেঞ্জার হাত বাড়িয়ে বললেন, দেখি কখানা বোঝাই।

লোকটা পকেট থেকে কাগজ বের করে রেঞ্জারের হাতে দিয়ে বলল, আজ্ঞে চার লরি স্যার।

চার লরি!

খিঁচিয়ে উঠলেন রেঞ্জার।

লোকটা থতমত খেয়ে বলল, দুটো পার হয়ে গেছে স্যার, আর আপনার পেছনে দুটো।

আবার ঝুট বলছো। আমার আসার আগে কখানা গেছে মালুম নেই। আমি দূর থেকে সাতখানা গুণে দেখেছি।

দেখলাম লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত। সে সঙ্গে সঙ্গে হেসে রেঞ্জারকে বলল, ন'খানা স্যার, ধর্মসাক্ষী করে বলছি।

আমি জানি এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়, তবুও রেঞ্জার কি ভেবে গাড়ি দুটো ছেড়ে দিলেন।

লোকটা তার গাড়িতে উঠে আবার নেমে এল। আমাদের কাছে এসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে মিঃ ভট্চাযের হাতে এক তাড়া নোট গুঁজে দিলে।

আমাদের জীপ আবার ফিরে এল সেই টিম্বার মার্চেণ্টের বাংলোতে।

পথে শুধু একটি কথা শুনলাম রেঞ্জারের মুখে, অনেস্টি কোথাও নেই মিঃ চৌধুরী। আমার লোকেরাও আমাকে ঠকাচ্ছে। আমি অফিসে গেলেই ওরা বলবে, স্যার আজ এই চারখানা লরির টাকা পেয়েছি। আমাকে ঐ চারখানার ওপরেই ভাগ করে দিতে হবে সবাইকে। কিন্তু আমাকে ফাঁকি দিয়ে মারল ওরা আরও পাঁচ সাতখানা লরির টাকা।

একটু থেমে বললেন, আজকাল নিজের লোকের ওপরেও ভরসা রাখা দায়, মিঃ চৌধুরী। শালারা ভাগের ওপরেও ভাগ বসায়।

আমরা পোসাং-এর বাংলোতে সে রাতে থেকে গেলাম।

সারা রাত প্রায় রুইনা নদীর ঢেউ বইল বাংলোর সামনের লনে। জনা চারেক মানুষ প্রায় ডজনখানেক দামী বোতল ওড়াল।

আমাকে রেঞ্জার খুব টানাটানি করেছিলেন, আমি অক্ষমতা জানিয়ে ওদের পাশে বসে একটি কোল্ড ড্রিংক খেয়েছিলাম।

রেঞ্জার সাহেব হলাহল মুখে ঢেলে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন, মেয়েমানুষেও এমন অনাসক্তি নাকি মশাই? না ঐ কোল্ড ড্রিংকের মত কোল্ড মেয়েতেই আপনার আসক্তি?

আমি হেসে বললাম, মেয়েদের সম্বন্ধে আমি উদাস না হলেও আসক্তি

আমার ছবিতেই বেশী। বলতে পারেন মেয়েরা আমার কাছে প্রেরণা।

কয়েক পেগ গলায় ঢেলে দিয়ে রেঞ্জার আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে এক সময় বললেন, থাকেন কি করে মশাই। ঐসব নিরামিশ প্রেরণা ফ্রেরণার কথা শুনলে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মনে হয় কেউ যেন হাত পা বেঁধে বরফের চাঁই-এর ওপর ফেলে দিয়েছে।

আমি আর কোন কথা না বলে হাসতে লাগলাম।

এরপর সারান্দা বনের ইতিহাসের পাতা মাতাল চৈতী হাওয়ায় দ্রুত উড়ে চলল।

শিমুল তার শাখায় শুধু লাল ফুলে জমাট রক্তবেদনার ছবি ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পলাশ সারি সারি প্রদীপ জ্বালল তার ডালে ডালে। কৃষ্ণচূড়ার সবুজ পাতা দক্ষিণ থেকে বয়ে আসা হাওয়ায় চামরের মত দুলতে লাগল। ডালে ডালে, লালে হলুদে, ফোটা আর অফোটা কুঁড়িতে শ্রীকৃষ্ণের মাথার শত শত মুকুট তৈরী হতে লাগল। আরাবা গাছে উঁকি দিচ্ছে লাল লাল ফল। হাঁলকা বেগুনী আভার জীরহুল ফুল ঝোপের ভেতর ফুটি ফুটি করছে। শালগাছে এসেছে মাখন রঙের ফুল।

ময়ুর দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বনের পথে যেতে যেতে হঠাৎ শোনা যাচ্ছে বনমোরগের ডাক। তিতিরগুলো ঝাঁক বেঁধে সোজা নীচু হয়ে তির্ তির্ করে উড়ে চলেছে। আকাশে চাঁদ, মহুয়ায় মদ, আর সারান্দার তামাম মেয়ে পুরুষের গলায় বাহা পরবের গান। কাজ করতে করতে গান বেজে উঠছে, হঠাৎ হঠাৎ উছলে ওঠা ভেঙে পড়া ঢেউয়ের মত।

শুধু বসন্ত আসেনি ফরেস্ট বাংলোয়। একটা জমাট বাঁধা শোক-সন্ধ্যার মত মন্থর নিঃশ্বাসে কেটে যাচ্ছে এখানকার দিন।

আমি কলকাতায় ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম, পাশে এসে দাঁড়াল সেঁজুতি।

বলল, তোমার চলে যাওয়াটাই হবে আমার সবচেয়ে বড় অপমান।

বললাম, এ কথা কেন সেঁজুতি?

ও কান্নার সঙ্গে উত্তেজনার সুর মিশিয়ে বলল, রেঞ্জার তোমাকে এখানে আমন্ত্রণ করে আনেনি, সুতরাং তার কথায় তুমি চলে যেতে পার না।

হেসে বললাম, এ বাংলো সরকার বাহাদুর রেঞ্জারের নামেই অ্যালট করেছে, সুতরাং এখানে তোমার অধিকার থাকলেও আমার নেই।

ও বলল, তুমি অমন করে হেসে ব্যাপারটাকে লঘু করে দিও না অনির্বাণদা।

বললাম, ঠিক কথাই তো রেঞ্জার বলেছেন, এ বনে মেয়েদের ছবি আঁকা বারণ। তাদের সম্ভ্রমহানি হয়। নিশ্চয়ই আমার আঁকা লিজার ছবি ওঁর চোখে পড়ে থাকবে। তাই আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছেন।

ও ধমকে উঠল, থামো তুমি, আর সাফাই গাইতে হবে না রেঞ্জারের।

ও নিজে যখন রাতের অন্ধকারে শেয়ালের মত হাঁসগুলো ধরবার জন্য ঝোপড়িতে ঝোপড়িতে ঘুরে বেড়ায় তখন মেয়েদের ইজ্জত খুব বজায় থাকে, তাই না ?

বললাম, এটা রেঞ্জারের রাজ্য। নিজের রাজ্যে নৃপতির যা খুশি করার অধিকার আছে। তাবলে আমার মত একটা উটকো লোকের রাজ-আচরণ শোভা পায় না।

ও বলল, রাখ তোমার রসিকতা, রেঞ্জার এখন ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে গেছে। সুজন ওর হাত থেকে যেই ছিনিয়ে নিয়েছে কণ্ট্রাক্ট অমনি ঘা খাওয়া সাপের মত ও ক্রমাগত ফুঁসছে আর বৃথা আক্রোশে চারদিকের মাটিতে ছোবল মারছে।

ও একটু থেমে বলল, তোমাকে বারণ করেছে সুজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে, তুমি আর বাংলোর বাইরে যেও না, ব্যস। বাহা পরব চুকে যাক, আমি নিজে তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব। সে যাওয়া হবে তোমার আমার দুজনেরই সম্মানের। এখন চলে গেলে আমি রেঞ্জারের কাছে হেরে যাব অনির্বাণদা, তুমি আমার মুখ রাখতে এইটুকু দয়া কর। ক'টা দিন থেকে যাও !

ওকে কথা দিলাম আমি থাকব।

বাংলোয় বসে থাকি। বাইরে যাই না আজকাল। খরা প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। দিনের বেলা দূরের পাহাড়ের দিকে তাকানো যায় না। ন্যাড়া পাহাড়ের খাঁজগুলো থেকে যেন আগুনে হাওয়ার হলকা বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

শুকনো পাতা রাশি রাশি ঝরে পড়ে আছে গাছের তলায়। হাওয়ার ঘুর্ণি পাহাড় থেকে বনে ঢুকে পড়েই ওড়াতে থাকে পাতা-পত্তর। অনেক সময় মনে হয় যেন একটা পাগলী মেয়ে বনের ভেতর বোঁ বোঁ আওয়াজ তুলে শুকনো পাতার ছেঁড়াখোঁড়া কাপড় পরে ছুটে বেড়াচ্ছে।

রাতটা কষ্ট দেয়। হাওয়ায় দারুণ একটা মন কেমনের ভাব থাকে। চাঁদটা দিনের পর দিন আশ্চর্য রকমের মাদক হয়ে উঠছে।

রেঞ্জার প্রায় রাতেই থাকেন না আজকাল বাংলোতে। এখন তাঁর গতিবিধি ক্রিয়াকলাপের ভেতর কেমন যেন অস্বাভাবিকতার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

সেঁজুতি এসে বলল, এবার বাহা পরব খুব জমজমাট হয়ে উঠল।

বললাম, ভালই তো।

ও রাগ করে বলল, তুমি কিছু না বুঝেই অমনি ভাল বলে দিলে।

আমি নিজের বুদ্ধিহীন মন্তব্যের জন্যে লজ্জিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

ও বলল, এই সারান্দা বনের হো-রা দু দলে ভাগ হয়ে গেছে। লিজার বাবা এক দলের লিডার, তাকে মদৎ যোগাচ্ছে রেঞ্জার। তাই ঘটা করে উৎসব আর খানাপিনার আয়োজন।

বললাম, অন্য দলের লিডারটি কে ?

ও বলল, তোমার সুজন বন্ধু, আবার কে ? সে তার দলের কুলি-কামিন-দের প্রচুর সাজপোশাক আর টাকা পয়সা দিয়েছে।

বললাম, সেঁজুতি, বেশ বোঝা যাচ্ছে নতুন কণ্ট্রাক্ট ছিনিয়ে নিয়েছে সুজন, কিন্তু কেমন করে রেঞ্জারের হাত এড়িয়ে এটা সম্ভব হল বল তো ? এবার যে জোর লড়াই লাগবে। বনের অধিকার নিয়ে আপাততঃ লড়াই জিতল সুজন সিং, কিন্তু লিজার দখল নিয়ে এবার লড়াই দারুণ জমবে বলে মনে হচ্ছে। কারণ ইতিমধ্যেই রেঞ্জার লিজার বাড়িতে বাহা পরবের আলোচনা বৈঠক বসিয়ে দিয়েছেন।

সেঁজুতি বলল, আমার এসব ভাবনা নেই অনির্বাণদা। শুধু তুমি চলে যাবে এ খবরটা দুপুরের হু হু করে বয়ে আসা গরম ঘূর্ণির মত আমার বুকের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমাকে যদি দেখাতে পারতাম তাহলে দেখতে ঐ হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে জ্বলে জ্বলে পুড়ছে আমার মন। সেই আমাদের বাউল বলেছে না, 'বন পোড়া তো সবাই দেখে, আমার মন পোড়ে হায় কেউ দেখে না'।

বললাম, দুঃখ কোর না সেঁজুতি, আমার এ জীবনে যদি কোন নারী এসে থাকে, তাহলে সে তুমি। ঘর না বাঁধার দুঃখটা তোলা থাক আমাদের দুজনের জন্যে। সেই দুঃখটুকুই হবে আমাদের নিঃসঙ্গ দিনের ভাবনার সবচেয়ে বড় সম্বল।

দু'চার দিন পরের খবর। বসেছিলাম দুপুরের খাবার পরে ড্রইংরুমে। অনেকদিনের আঁকা অনেকগুলো ছবি সেঁজুতি মেঝের কার্পেটে মেলে দিয়ে দেখছিল। আমি কোন ছবি সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করলে ও প্রতিবাদ করে উঠে বলেছিল, হোক খারাপ, এ সব ছবি আমার।

আমি ওর প্রতিবাদের ভঙ্গী দেখে মনে মনে হাসছিলাম।

হঠাৎ বাইরে নজর পড়তেই একটি মেয়েকে সরে যেতে দেখলাম। আর তাকে জানালা দিয়ে দেখা গেল না।

সেঁজুতিকে বলতেই ও বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে একটি বছর দশ-বারো বয়েসের হো-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল ও।

বলল, চিঠি পাঠিয়েছে সুজন।

বললাম, এইটি তার দূত বুঝি ?

সেঁজুতি বলল, হ্যাঁ, সেই মা-মরা মেয়েটি, যে এখন সুজন সিংয়ের তাঁবুতে থাকে।

বললাম, চিঠি তোমার না আমার ?

ও বলল, দুজনের।

চিঠিখানা পড়তে বলতেই সেঁজুতি জোরে জোরে পড়তে লাগল।

বহুরাণী, সারান্দা বনের এডমিনিস্ট্রেটার বাহাদুরের হুকুম নেই বাংলোতে যাবার, তাই এ বান্দা এত্না রোজ গরহাজির। আগামী পূর্ণিমার চাঁদনি রাতে তোমাদের দুজনার আসা চাই আমার ডেরায়। এখানে বাহা

পরবের গানা আউর নাচ হবে। রেঞ্জার সাহাব কোঠীতে থাকলে তোমাদের আসা চলবে না জানি। কিন্তু যতদূর খবর আছে বাহা পরবের দু'রোজ আগাড়ী রেঞ্জার সাহাব রাঁচীতে বড়াসাহেবের কাছে চলিয়ে যাবে। তোমাদের আসা চাই।

হাঁ, আউর এক বাৎ। এই লেড়্‌কির সাথে চৌধ্‌রীসাবকে একবার বাহার আনে বল। আমি মোলাকাৎ করব। কুছ বাৎ আছে। রেঞ্জার সাহাব এখন ছোটনাগরায় আছে। কুছ্‌ ডর নেই।—সুজন সিং।

সেঁজুতি বলল, একটু বস আমি আসছি।

ও বেরিয়ে গেল ড্রইংরুম থেকে। আমি মেয়েটিকে কাছে পেয়ে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে দু'একটা কথা বলার চেষ্টা করলাম। মেয়েটি আমার কথা শুনে আমার দিকে চেয়ে রইল।

আবার হিন্দীতে চেষ্টা চালাতে যাচ্ছি দেখে মেয়েটি কি ভাবল কি জানি, জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বাইরের বনের দিকে ইংগিত করল।

ইতিমধ্যে সেঁজুতি একটা ডায়েরী হাতে নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ঘরে ঢুকল।

মুখ না তুলেই বলল, আশ্চর্য, ঠিক খবরটা কোত্থেকে পেল সুজন! ডায়েরীতে রেঞ্জারের রাঁচী যাবার স্থির আছে বাহা পরবের দুদিন আগেই। ফেরার সম্ভাব্য তারিখ পরব মিটে যাবার তিন-চারদিন পর।

ও ডায়েরীটা হাতে নিয়ে ভাবতে লাগল।

বললাম, এতে এত চিন্তার কি আছে সেঁজুতি? অফিসের কাজে কাকে কখন কোথায় থাকতে হয় তার কি কোন ঠিক আছে?

ও বলল, সে কথা সকলেই জানে। কিন্তু নিজে যে বাহা উৎসব করে বাহাদুরী নেবার প্ল্যান করেছে, সে হঠাৎ সরে যাচ্ছে উৎসবের মঞ্চ থেকে, এইটিই ভাবনার কথা।

বললাম, যাক্‌ গে, যার ভাবনা তাকে ভাবতে দাও। এখন বল তো দেখি, সুজনের ডাকে আমি বাইরে যাব কিনা?

সেঁজুতি অমনি বলে উঠল, এ তোমার ভাবনা, তুমিই ভেবে নাও।

বললাম, নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়ে হার মানছি সেঁজুতি। এখন দয়া করে যাব কিনা বলে দাও।

ও বলল, নিশ্চয়ই যাবে, এতে ভাবনার আর কি আছে। মানুষটা এতদিন আমাদের দেখতে না পেয়ে একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে।

আমি ঐ ছোট মেয়েটির সঙ্গে বাংলো থেকে বেরিয়ে এলাম। খানিক পথ এসে একটা পাহাড়ী বাঁক ঘুরতেই দেখলাম সুজন সিংয়ের জীপখানা দাঁড়িয়ে আছে। কাছে এগিয়ে দেখলাম, দুপুরের দারুণ আগুনের ঝলকে সুজন স্টিয়ারিংয়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

• ওর পাশে গিয়ে ডাকলাম, সুজন ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?

ও আস্তে আস্তে স্টিয়ারিংয়ের ওপর থেকে মাথা তুলে তাকাল। চোখ দুটো ওর গরমে আর ঘুমের দরুণ লাল হয়ে উঠেছে।

এক মুহূর্ত পরেই ও স্বাভাবিক হয়ে গেল। লাফ দিয়ে নেমে এল গাড়ি থেকে। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, দোস্ত্ তুমি তাহলে এলে!

বললাম, তুমি ডাকলে আমি আসব না, এ কি করে হতে পারে সিং ?

সুজন বলল, এখানে বহুৎ ধুপ, ওঠ জীপে, চল আমার ক্যাম্পে।

বললাম, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে, যাব সেখানে।

ও জীপ চালিয়ে দিল পাহাড়ী পথে।

এ পথে আমি সুজনের গাড়ীতে কতবার যাতায়াত করেছি, সুন্দর কোন স্পট্ পেলেই ওকে বলেছি গাড়ি থামাতে। কোন সন্ধ্যায় ফেরার পথে দূরের দুটি পাহাড়েব ফাঁকে চাঁদ উঠেছে। আমি কতক্ষণ জীপে বসে সেই চাঁদকে দেখেছি। এ-পারের গাছের মাথায় সে আলো এসে পড়েছে। আমি না বলা পর্যন্ত সুজন চুপচাপ স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে। সুজন কবি নয়, শিল্পী নয়, সুজন এই আদিম অরণ্য প্রকৃতির একটি অংশ। ও আশ্চর্য সহজাত ক্ষমতার বলে একেবারে প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন হয়ে মিশে গেছে। যেখানে আমরা পৃথক হয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছি, সেখানে ও প্রকৃতির আলো-অন্ধকার, ঋতুপর্বের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গিয়ে তাকে অনুভব করছে।

সুজনেব ক্যাম্পে এসে গাড়ি থামল। এ ছাউনি নতুন ফেলা হচ্ছে। বনের নতুন জায়গায় শুরু হয়েছে কাজ। অনেকগুলো ট্রাক বোঝাই হয়েছে কাঠে। মেয়েরা ডালপালা পাতাপত্তর একদিকে সাজিয়ে রাখছে। পুরুষ কুলিরা টাঙ্গী চালাচ্ছে গাছে। ঠক্ ঠক্ আওয়াজ উঠছে চারদিকে। কড়্ কড়্ মড়্ মড়্ শব্দে ভেঙে পড়ছে গাছ। অমনি হুঁশিয়ারীর আওয়াজ তুলছে কুলিরা।

দূরে পথের ধারে গাছের ছায়ায় বসে আছে দুটি খাকি পোশাক পরা লোক। মনে হল তারা ঝিমুচ্ছে।

সুজনকে ওদের দেখিয়ে বললাম, ওরা কারা সুজন ?

সুজন বলল, রেঞ্জার সাহেবের আদমী আছে। ফরেস্ট গার্ড। আগে থাকত নাই। হালফিল বহুৎ চেকিং হচ্ছে।

বললাম, কিসের উপর নজর রাখছে ওরা ?

সুজন বলল, ছোটা ছোটা পেড় কাটতে মানা। সরকারী কণ্ট্রাক্ট মাফিক কাম হতে আছে কি নেহি, এ সব তদারকী লিয়ে দু' আদমী হাজির আছে।

হেসে বললাম, ভাল ব্যবস্থা করেছেন রেঞ্জার সাহেব। তোমার ফাঁকি আর চলবে না সিং।

ও বলল, ঘুষ ভি নেহি। এ কাম আচ্ছা। দেনা-লেনা কো কই বাৎ নেহি।

আমরা ক্যাম্পের ভেতর বসলাম। অনেকগুলো বড় বড় গাছের জটলায়

সুজন সিংয়ের তাঁবু। ঘন ছায়ার জন্যে গরম কম।

সুজন বলল, লস্যি পিও। তোমার লেগে লস্যি বানালাম চৌধ্‌রী।

মেয়েটি সুজন সিংয়ের ইঙ্গিতে দু গ্লাস লস্যি দুজনের হাতে দিয়ে গেল।

লস্যিতে চুমুক দিয়ে কথা হচ্ছিল আমাদের।

সুজন বলল, বহুৎ রোজ দেখি নাই, দিলটা ফাঁকা ফাঁকা লাগল চৌধ্‌রী।

বললাম, আমি, তোমার বহুরাণী রোজ তোমার কথা বলি।

ও গ্লাস সমেত হাতখানা মাথায় ঠেকিয়ে বলল, তোমাদের ভুলতে পারব নাই চৌধ্‌রী। আমার রক্তের সাথে তোমরা এক হইয়ে আছ।

বললাম, একটা কথা বলবে সিং, কেমন করে রেঞ্জারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি কণ্ট্রাক্টটা ছিনিয়ে নিলে ?

ও বলল, হাজার বার বলবে। তোমাকে বলব না তো কাকে বলব দোস্ত। তবে শোন বাৎ। তোমার কাছে কথাটা শুনে আমি ছুটলাম রাঁচী। ওখানে দেখা করলাম কনজারভেটর সাহেবের সাথে। বললাম সব কুছ বাৎ, একদম দিল সাফ্ করে। সাহেবকে কানুন-মাফিক ঘুষ সাধলাম।

কনজারভেটর সাহেব গুস্‌সা করলেন নাই। তিনি খালি বললেন, আমি জানি সরকারী কামে বহুৎ আদমী ঘুষ খায়। কিন্তু আমার মাতাজীকী বাৎ থী, ঘুষ খানা তো মাকো খুন পিনা। ব্যস্, জীবনভোর ঘুষ নেহী লিয়া। তুম যদি ঘুষ কা বাৎ একদম ছোড়্ দো তব্ জরুর কাম মিলে গা।

ব্যস্ কসম লিয়ে নিলাম। কোভি ঘুষের কারবার সুজন সিং করবে নাই।

বললাম, জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ লাগালে সিং!

ও বলল, চোরাই কাম করবে নাই, ঘুষ দিবে নাই, ব্যস সুজন সিং কোই শালাকো পরোয়া ভি করবে নাই।

বললাম, লিজার খবর কি ?

ও বলল, বহুৎ গড়বড় হইয়ে গেছে চৌধ্‌রী, ওর বাপ হারামী, লেড়্‌কী কো বহুৎ দুখ দিতে আছে। ঘর সে বাহার যানে মানা। খালি দিন রাত ভোর বাৎ চালাও রেঞ্জার কো সাথ।

বললাম, এত কথা জানলে কি করে ?

বলল সুজন, ফ্রাইডে চার্চে ওর সাথে লুকায়ে দেখা করি। ও বহুৎ কষ্টে আছে চৌধ্‌রী। আমি কাম না করলে লিজাকে লিয়ে ভাগতাম বহুৎ আগাড়ী। ও রুদছে আর আমার ছাতি টুটাফুটা হইয়ে গেল!

এই আমি প্রথম সুজন সিংয়ের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলাম।

সেদিন সুজন সিংয়ের সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ কথা হল। লিজার প্রসঙ্গই ছিল বেশী সময় জুড়ে। ওর পরিকল্পনা শুনলাম, এই কাজের পর এ বনে ও আর কাজ করবে না। লিজাকে চার্চে বিয়ে করে ও সঙ্গে নিয়ে বন ছেড়ে চলে যাবে।

বললাম, তোমার জেদও বজায় রইল, এদিকে লিজাও রইল এই শয়তানের ঘাঁটির বাইরে। বেশ সুষ্ঠু পরিকল্পনা তোমার সিং।

সুজন বলল, তোমার আর বহুরাণীর শুভ কামনা চাই চৌধুরী। বললাম, এ বনের বাইরে তুমি আর লিজা থাকবে আমার এই বুকের মধ্যে সিং। সারাক্ষণ জানাব আমাদের ভালবাসা আর শুভ কামনা।

বেলা-শেষের আগে সুজন আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল বাংলোর সামনে।

ফিরে যাবার সময় বলল, আমি জানতে পেরেছি চৌধুরী, রেঞ্জার বাহা পরবে থাকবে নাই। ওদের ক্লার্ক আমাকে গোপনে খবর জানায়েছে। তুমি বহুরাণীকে বলবে আমার সব বাত। আমি আপনি গিয়ে লিয়ে আসব তোমাদের আমার এ গরীবখানায়।

বললাম, ঠিকই আসব সিং, তোমার ডাকে না এসে পারব না।

আজকাল প্রায়ই রেঞ্জার লাঞ্চ অথবা ডিনারে হাজির থাকেন। রান্না খারাপ হোক আর না হোক কুকের ওপর এক পশলা শিলাবৃষ্টি বর্ষিত হয়। সে সময় চুপ করে থাকে সেঁজুতি।

কোন কোন দিন রান্নার কদর্যতা সম্বন্ধে আমার মতামত আহ্বান করলেই বিপদে পড়ে যাই। নিশ্চয়ই আরও ভাল হতে পারত, এমনি ধরনের একটা উত্তর দিয়ে আত্মরক্ষা করি।

যে রাতে রেঞ্জার বাংলোতে থাকেন, সে রাত আমাদের কাছে হয়ে ওঠে নিদ্রাহারা। প্রথমে কুক আর বেয়ারার ভাগ্যে জোটে অশ্রাব্য গালি। পরে শয্যাগৃহে চলে স্ত্রীর ওপর কটুবাক্যে বিক্রম প্রকাশ। এ যুগে সতীত্ব নামক বস্তুটি যে একেবারে বদ্ধ জলাশয়ের মত অপেয়, ব্যবহারের অযোগ্য, এ তথ্য অত্যন্ত জোরের সঙ্গে প্রচার করতে থাকেন।

কবে কোন দিন ওপরওয়ালাকে সামান্য একটু সঙ্গ দিলেই কার্যোদ্ধার হয়ে যেত অথচ সেদিন রূঢ় ব্যবহার করে আখের মাটি করেছে সেঁজুতি তার হিসেব স্থান কাল পাত্র উল্লেখ করে বলে যান রেঞ্জার।

এরপর শুরু হয় দীর্ঘরাত্রি কারণবারি পান। সে সময় দামী বিলিতি অনেকগুলি পানপাত্র ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়। এ সময় যার উদ্দেশ্যে গালি বর্ষিত হয় সে হয়তো অরণ্যবৃক্ষের তলায় পাথরের ওপর বসে কল্পনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তার প্রেমিকার সঙ্গে।

কখনও বা রেঞ্জার চীৎকার করে ওঠেন—

লিজা লিজা সুইট ডারলিং
কাম অ্যাণ্ড এমব্রেস দ্য ফরেস্ট-কিং

সেঁজুতির গলা শোনা যায়, শান্ত অথচ দৃঢ়, দয়া করে দুএকটা রাত এখানে না এলেও তো পার। যারা বনের রাজার গান শুনতে চায় তারা প্রাণভরে শোনার সুযোগ পাবে।

ইউ শাট্ আপ্।

পায়ের দাপাদাপি, দুএকটা কাঁচের বস্তু ভাঙার শব্দ ওঠে।

শেষে সেঁজুতির সাহায্যে শয্যায় এলিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা। আর

সে নিদ্রা ভাঙাতে সূর্যদেবকে অনেক কড়া হতে হয়।

রেঞ্জার বেরিয়ে গেলে সেঁজুতি এসে বসে আমার পাশটিতে। কোন কোনদিন দাঁড়িয়ে থাকে আমার পেছনে চেয়ারের পিঠে ঠেস দিয়ে।

চুপচাপ বসে বা দাঁড়িয়ে থাকে কতক্ষণ। নিজের মনে মনে সে সময়টুকুতে কতকিছু ভাবতে থাকে।

কোন এক সময় কথা বলে ওঠে, অনির্বাণদা তোমাকে এখানে আসতে না লিখলেই বুঝি ভাল হত।

বলি, এ কথা কেন সেঁজুতি।

ও বলে, এটা আনন্দের রাজ্য যে নয় তা তুমি হয়তো এতদিনে ভাল করেই বুঝেছ।

বলি, তোমার সঙ্গে কিছু কিছু দুঃখ অনুভব করলাম, এর চেয়ে সুখ আমার নেই সেঁজুতি।

ও আর বেশী কথা বলে না। কখনো বা শুধু চেয়ে থাকে আমার মুখের দিকে। চোখ দুটো ভিজে উঠলেই উঠে যায় ঘরের ভেতর।

আমি বসে বসে ভাবি, কোন সমাধান কি নেই সেঁজুতির জীবনে? ও কি এমন করে ব্যবহার না করা রঙের মত পড়ে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে একদিন জমে কঠিন হয়ে যাবে। যাকে নিয়ে আর কোনদিন কোন রঙীন ছবি আঁকা যাবে না।

এক এক সময় মনে হয়, আমি কি ওকে এই বিরাট আকাশের তলায় বিশ্বভুবনের মাঝখানে কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারি না। আবার মনে হয়, লুকিয়ে কেন রাখব, যাকে ভালবাসি তাকে সবার চোখের সামনে তুলে ধরতে লজ্জা বা ভয় কিসের?

মনে মনেই ভাবি। মনের এ খবর ওকে দিতে পারি না।

ও হয়তো আমার মতই কল্পনা করে, কিন্তু মুখে ওর বেজে ওঠে না মনের ভাষা।

কোন কোনদিন বরং বলে, তুমি জাত-শিল্পী অনির্বাণদা, বিয়ে করা তোমার চলবে না।

হেসে বলি, কেন? নিজেও তো শিল্পী, তবু বিয়ে করতে তো আটকায়নি।

ও বলে, বিয়ে করে ছবি ছেড়েছি, বিয়ে করলে তোমারও সে দশা ঘটতে পারে।

বলি, আগে তো বিয়ে করি তারপর ছবি ছাড়ার কথা ভেবে দেখব।

ও বলে, তুমি যদি সত্যি বিয়ে করতে চাও অনির্বাণদা, তাহলে আমি তোমার মেয়ে নির্বাচন করে দেব।

অমনি বলে উঠি, তুমি করবে আমার মেয়ে নির্বাচন, তাহলে আর বিয়ে হয়েছে আমার।

ও বলে, কথা দাও, তুমি বিয়ে করবে অনির্বাণদা, তাহলে ঠিক খুঁজে

দেব তোমার মেয়ে।

বলি, কথা ঠিকই দেব, তবে একটি শর্তে।

ও তাকিয়ে থাকে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দুটি চোখ মেলে।

বলি, মেয়েটির চোখ-মুখ দেহের গঠন সারান্দার রেঞ্জার সাহেবের বউয়ের মত অবিকল হওয়া চাই। আর তার থাকা চাই ছবি আঁকার প্রতিভা, ঠিক প্রিন্সিপাল চক্রবর্তীর মেয়ের মত।

ও বলে, পাগল, তুমি একটা পাগল। শুধু নিজে পাগল নয়, অন্যকেও পাগল করে দেবার জাদু আছে তোমার।

আবার কোনদিন ওঠে লিজা আর সুজনের কথা। এখন সেঁজুতি বিশ্বাস করে লিজা একমাত্র সুজনকেই ভালবাসে। রেঞ্জার যত চেষ্টাই করুক লিজা তার কাছে দিগন্তছোঁয়া আকাশ হয়ে থাকবে। সারা জীবন তাকে ধরার চেষ্টা করলেও সে থাকবে সমান দূরত্বে।

কিন্তু আমি ভাবি, এ কথা সেঁজুতি জানতে পারলেও তার লাভ কোথায়। রেঞ্জার লিজাকে না পেলে স্ত্রী হিসেবে সেঁজুতির মনের ভারটা লঘু হয়ে যাবার কথা, কিন্তু যে পুরুষ সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই, তার ভাল-মন্দের খবরে সেঁজুতির কি যায়-আসে।

বলি, সেঁজুতি, ঐ দুর্ধর্ষ শালগাছের কাণ্ডের মত সুজন সিং লিজাকে ভালবেসে একেবারে কবি হয়ে গেছে।

সেঁজুতি হেসে বলে, সুজনের কবিতা নিশ্চয়ই অসাধারণ।

বলি, অসাধারণ বইকি, শুনবে ওর কাব্য ?

সেঁজুতি থুতনীর ওপর হাতের তেলো চেপে ধরে মিষ্টি হেসে আমার মুখের দিকে তাকায়।

বলি, একদিন ঘুরছিলুম সুজনের সঙ্গে বনের পথে। হঠাৎ চাঁদ উঠল পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটা শালগাছের মাথায়।

সুজন তার গাড়ি থামিয়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে। বলল, ঐ পাহাড়ের তলায় গাঁ-টা হল লিজাদের। জানো চৌধুরী, ঐ মহল্লার হো-দের বিশোয়াস, ঐ পাহাড়টার ওপর যে পেঁড় আছে, ওখানে দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখলে আর কোই আদমি ফিরবে নাই। ইসি লিয়ে ঐ পাহাড় 'পর কভ্‌ভি আদমী নেহি চড়্‌তা।

বললাম, এটা পাহাড়ীদের একটা বিশ্বাস।

ও বলল, আমি ও বিশোয়াস ভাঙবে। আমি সাদি হইয়ে গেলে লিজাকে ঐ পাহাড় প'র লিয়ে যাবে। পেঁড়কো নীচে বসবে। আর চাঁদ দেখবে। চাঁদকা রোশনীমে নাহানা শুরু করবে। আর ঐ আসমান 'পর চাঁদিয়া, মেরা বুক 'পর লিজা।

সেঁজুতি বলে, ও লিজার ভালবাসায় পাগল হয়ে গেছে।

মেতে উঠল বন-বনান্ত। বসন্ত-উৎসব বাহা পরব। আমি আর সেঁজুতি

কাছে-পিঠে বেড়াতে গেলেই শুনতে পাই গানের কলি বাতাসে ভাসছে। কাজের শেষে যে-সব মেয়ে-পুরুষ ঘরে ফিরছে তাদের মুখের হাসি যেন আর থামতেই চায় না। গড়িয়ে পড়ছে এ ওর গায়ে।

বন, শিমুল পলাশ কৃষ্ণচূড়ার মাথায় মাথায় রঙের আগুন জ্বেলেছে। সারা সারান্দা বনে গাছে গাছে, মনে মনে চৈতি আগুন লেগেছে।

ফিরে আসতে আসতে সেঁজুতি দাঁড়ায় বাংলোর কোণে কারো নদীর তীরে, পলাশ গাছটার তলায়।

বলে, ঠিক যেন ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের 'রুথ' কবিতার ছবি ঃ

> Flowers that with one scarlet gleam
> Cover a hundred leagues, and seem
> To set the hills on fire.

আর আঙুলে গোনা চারটে দিন বাকী উৎসবের। চৈত্র দিনে মাতাল কালবোশেখীর একটা হাওয়া প্রায় রোজ ছুটে আসছে সারান্দা বনে। আজকাল শেষ রাতের দিকে, যখন পাহাড় থেকে সারাদিনের অসহ্য গরম হাওয়াগুলো ঝলকে ঝলকে বেরুতে থাকে তখন শুরু হয়ে যায় ঝড়। মুহূর্তে একটা দিগন্তজোড়া আওয়াজ ওঠে। বনের গাছ-গাছালির মাথার জটা ধরে বেশ কিছুক্ষণ কে যেন নেড়ে দিয়ে যায়। কিন্তু ভোরের মুহূর্তটিতে সব থেমে আসে। বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি, শুকনো পাতা, ভাঙা ডালপালার ওপর ছড়িয়ে পড়ে আছে অগুণতি শিমুল ফুলের শব।

এক রাত শেষে ঝড়ের এলোমেলো দাপটে ঘুম ভেঙে গেল আমার। হঠাৎ পাশের ঘরে একটা ক্রুদ্ধ গলার আওয়াজ পেলাম। রেঞ্জারের গলা।

না, ঐ শয়তানের বাচ্চার ওখানে বাহা পরব দেখতে তুমি যাবে না।

সেঁজুতির গলা বেজে উঠল, তোমার অনেক কথা আমি শুনেছি, কিন্তু আর নয়। আদেশ যে করে তার অধিকার থাকা চাই।

কি বললে, আমার বারণ করার অধিকার নেই?

সেঁজুতি অমনি বলে উঠল, তোমার বারণ তখনই আমি শুনব যখন দেখব আমার বারণও তুমি শুনছ।

খিঁচিয়ে উঠলেন রেঞ্জার, তোমার বারণ! কি বারণ শুনি?

সেঁজুতি বলল, কেন যাও সাসাংদায়? কেন লিজার পায়ে জোঁকের মত লেগে আছ? বন্ধ করতে পার না ওখানে যাওয়া?

রেঞ্জারের ক্রোধ চরমে উঠেছে বলে মনে হল, কৈফিয়ৎ দিতে হবে তোমাকে, এতখানি বেড়ে উঠেছ তুমি! পাখা গজিয়েছে তোমার! এ পাখা দুটো পুড়ে ঝলসে যাবে একদিন।

রেঞ্জার উঠে চলে গেলে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। ইউক্যালিপটাস্ গাছগুলোর তলায় অশান্তভাবে ঘুরতে লাগলাম।

বেশ কিছু সময় পরে এসে দাঁড়াল সেঁজুতি। তখনও ঝড় ঠিকমত থামেনি। ওর শ্যাম্পু করা চুলগুলো বড় বেশী রকম উড়ছিল। ওর মুখখানা থমথমে।

বললাম, কেন এমন করে নিজেকে ক্রোধের শিকার করে তুলছ লক্ষ্মী? নাই বা হল সুজন সিংয়ের ওখানে যাওয়া।

ও ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

এক সময় বলে উঠল, তুমিও একথা বললে আমাকে! আমি কি চোর যে চুরি করে যাব সুজন সিংয়ের ওখানে। যেখানে কোন অন্যায় নেই সেখানে যেতে আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। মানব না আমি কারও কথা। এতকাল খাঁচায় বন্দী হয়ে আছি আমি একটা বাতে-ধরা পাখির মত। কয়েকটা দানা ফেলে দিলেই তোমরা মনে কর চুকে গেল সব কর্তব্য। আমি আর থাকব না এই খাঁচাটায়, হয় মরব মাথা খুঁড়ে, নয় উড়ে চলে যাব যেখানে খুশি।

ও আমাকে কিছু বলতে দিল না। দুহাতে মুখ ঢেকে দৌড়ে ঘরে ঢুকে গেল।

আমি অবাক হয়ে অসহায়ের মত শুধু চেয়ে রইলাম ওর চলে যাওয়া পথটার দিকে।

পরের তিনদিন রেঞ্জার আর আসেন নি বাংলোতে। দরোয়ানের কাছে শুনলাম, তিনি রাঁচী চলে গেছেন জরুরী কাজে।

কথায় কথায় আরও জানতে পারলাম বাহা পরবের দিন বেয়ারা, কুক, দরোয়ান, ফরেস্ট গার্ড সকলেই যাবে সাসাংদায়। সেখানেই হবে খানাপিনা। এ বাংলোতে ওরা সেদিন কেউ থাকবে না। রেঞ্জার সাহেব নাকি এ হুকুম জারি করে গেছেন।

উৎসবের দিন কিন্তু ঘটলো সম্পূর্ণ উল্টো। সবাই চলে গেল বাংলো ছেড়ে সাসাংদায়। সন্ধ্যার একটু আগে সুজন সিংয়ের গাড়ি এসে দাঁড়াল বাংলোর সামনে। কিন্তু সুজন আর আমার বহু অনুরোধেও বাংলো থেকে এক পা নড়ানো গেল না সেঁজুতিকে।

সে বলল, তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। শুধু আমাকে মাপ কর। অন্ততঃ আজ আমার যাওয়া কোন মতেই হয়ে উঠবে না।

শেষে আমাকে উৎসবে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করল কিছুক্ষণ সেঁজুতি।

আমি বললাম, সে কি করে হয়, অসম্ভব। তোমাকে একা ফেলে যাওয়া কোনমতেই আমার চলবে না।

ও বলল, আমি একা ঠিক থাকতে পারব। আর সারা জীবন তো এমনি করে একাই থাকতে হবে আমাকে অনির্বাণদা। কেউ আগলাবে না।

সুজন বলল, আমার কিছু গুসসা নেই বহুরাণী। তোমাদের পেলে

দিলটা খুশ হত। ঠিক আছে। জরুরৎ পড়লে ডাক দেবে এ বান্দাকে। হাজির থাকবে বহুরাণীর হুকুম তামিল করতে।

জীপটা নিয়ে যেন আর্তনাদ করতে করতে ছুটে চলে গেল সুজন সিং।

কিন্তু সুজনকে ফিরে আসতে হয়েছিল শেষ-রাতে। বন জুড়ে তখন শুরু হয়েছিল সে এক ঝড়ের তাণ্ডব।

সুজন চলে গেলে দরজা ভেজিয়ে কতক্ষণ নিজের ঘরে বন্দী হয়ে রইল সেঁজুতি। আমি বাইরে বসে রাতের আকাশের দিকে চেয়ে রইলাম। কয়েকদিন ধরে যে গানের কলিগুলো টুকরো টুকরো কানে এসে বাজছিল, সেগুলো যেন মিছিল করে আসতে লাগল।

'হেসামাতা মাতালেনা
বাড়ীমাতা মাতালেনা
হেসামাতা চবজনা
বাড়ীমাতা চবজনা
সমাগেজা তুইম বন্দলেকানা।'

চাঁদ উঠেছে আকাশে। গানের কথা বাজছে বাতাসে। পূর্ণিমার চাঁদ রাতটাকে দিন করে দিয়েছে।

কতক্ষণ বাইরে বসেছিলাম জানি না। হয়তো কিছুক্ষণ নয়তো অনেক প্রহর পার করে দিয়েছি। বাঁশি আর মাদলের আওয়াজ গানের সুরের সঙ্গে মিশে চাঁদনী রাতটাকে মহুয়া মাতাল করে তুলেছিল।

একসময় ভেতরে আমার ঘরে ঢুকে দেখি রাতের খাবার কখন সেঁজুতি এসে নিঃশব্দে সাজিয়ে রেখে গেছে টেবিলের ওপর।

আমি ফিরে গিয়ে ওর ঘরের সামনে দাঁড়ালাম। হাত দিলাম দরজায়। ভেতর থেকে বন্ধ। ফিরে এলাম আমার ঘরে। খাবার যেমন ঢাকা ছিল তেমনি রইল। আমি বিছানায় আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাইরে পূর্ণিমার রাত জেগে রইল, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

অনির্বাণদা! অনির্বাণদা!

আমার ঘরের দরজা যেন আছড়ে দুপাশে ঠেলে দিয়ে ঢুকে পড়ল সেঁজুতি। আমি চমকে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতেই ও আমার বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কি একটা আতঙ্ক যেন ওকে গ্রাস করে ফেলেছিল। ও কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারল না।

কয়েকটা মুহূর্তমাত্র। তারপর আমাকে টানতে টানতে ও বাইরে নিয়ে এল।

ঝড় শুরু হয়ে গেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় নদী বন কাঁপিয়ে কারা যেন ছুটে চলেছে।

ঘুমের ঘোর তখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সারা শরীর। সেঁজুতির চীৎকারে সংবিত ফিরে পেলাম।

আগুন! আগুন!

তাকিয়ে দেখি ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে লাল বেনারসীর আঁচল উড়ছে আকাশে। আমাদের বাংলোর পেছনের পাহাড় আগুনের আভায় লাল হয়ে উঠেছে। কারো নদীর তীর ছুঁয়ে রাস্তাটা চলে গেছে চিরিবুরুর দিকে। তার ওপর দিয়ে কোটি কোটি খুরের শব্দ বেজে চলেছে। ধাক্কা খেয়ে কতকগুলো জানোয়ার ছিটকে পড়ে যাচ্ছে জলে। হাতি ডেকে উঠছে। একটা জানোয়ার ডাকলেই লক্ষ জানোয়ারের আর্ত চীৎকার বেজে উঠছে। কিন্তু পরমুহূর্তে স্থির হয়ে যাচ্ছে সকল শব্দ। শুধু বাজছে দ্রুত পলায়নপর পায়ের ধ্বনি।

ওদিকে চাঁদের আলো ঢেকে দিয়েছে হাজার হাজার পাখি। ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ ভয়ে উড়ে চলেছে আকাশ আঁধার করে।

বাংলোতে আগুনের এসে পড়তে আর বেশী বাকী নেই। বিহ্বলতা আমাদের সমস্ত শক্তিকে গ্রাস করে নিল। আমরা অগ্নি ঝড়ের মুখে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

সেঁজুতি এক মুহূর্তে আমার কাছে তার পরম নির্ভরতা খুঁজে পেল। সে আমার মুখের দিকে চেয়ে আমাকে নিবিড়ভাবে তার দুটো হাতের বাঁধনে জড়িয়ে ফেলল। নিশ্চিত মৃত্যুর সেই মুহূর্তে সে কি তার সব ভয় দূরে সরিয়ে ফেলে আমাকে জন্মান্তরের সঙ্গী হিসেবে পেতে চাইল!

তার নিবিড় বাঁধন থেকে আমি নিজেকে মুক্ত করে নিতে চাইলাম না। আমাদের পেছনের পাহাড়ে তখন আগুন জ্বলে উঠেছে দাউ দাউ করে। যেন একটা আগুনের ঘোড়া লাফ দিতে দিতে ছুটে আসছে সামনের দিকে। তার গরম নিশ্বাসগুলো গায়ে এসে লাগছে।

সামনে অতি তীব্র একটা আলো জ্বলে উঠল।

বহুরাণী, চৌধ্রী!

জীপ থেকে লাফিয়ে পড়ল সুজন সিং।

ছুটে এসে আমাদের অসাড় দুটো দেহকে টেনে নিয়ে তুলল জীপে। তারপর একটা বুলেটের মত নিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আগুন আসছে আমাদের পেছন পেছন ধাওয়া করে। আগুন থেকে কখনও একটু দূরে সরে যাচ্ছি, আবার কখনও পাহাড়ী বাঁক ঘুরে একেবারে মুখোমুখি হচ্ছি আগুনের। গাছের ডাল-পাতাগুলো যেন এক গ্রাসে কড় মড় করে চিবিয়ে খেয়ে নিচ্ছে একটা অগ্নি-রাক্ষস।

সেই ভয়াবহ মৃত্যুর বেড়াজালের ভেতর হঠাৎ বেজে উঠল সুজন সিংয়ের গলা, বহুরাণী, সারা বন জুড়ে আগ জ্বালায়েছে রেঞ্জার। সাসাংদা থেকে লিজা রাতভর পায়দলে আসছে আমার তাঁবুতে। সে-ই খবর লিয়ে আসছে, কুম্ডির বাংলো রেঞ্জার জ্বালায়ে দিবে বাহা পরবের দিন। আমার তাঁবুতে পড়িয়ে আছে, কোই চেতনা নেই। ছোটা লেড়কীটাকে ওর পাশে বসায়ে তোমাদের লেগে আইলাম বহুরাণী।

আমাদের দুজনের কারো মুখে কোন কথা নেই। শুধু মন বলল, কি ভীষণ হিংস্র প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে রেঞ্জার!

আবার বেজে উঠল সুজন সিংয়ের গলা, বাহা পরবে খানাপিনা নাচ গানা শেষ করিয়ে চলিয়ে গেল কুলি-কামিনরা আপনা ঘর, আর তার থোড়ি বাদ আসল লিজা। আছাড় খাইয়ে জমীন'পর পড়ল বহুরাণী। খালি তোমাদের বাংলোর কথাটা বলিয়ে দিল।

কারো নদীটা পেরিয়ে এসে দাঁড়াল আমাদের গাড়ি। আমরা নেমে পড়লাম। এক্ষুনি যে বিরাট পাহাড়ের আঁকা বাঁকা পাকদন্ডীর পথে গাড়িটা ছুটে এল সে পাহাড়ের গায়ে এখন সোনালী আগুনের আঁচল দুলছে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সুজন সিং, বুক-ফাটা একটা আর্তনাদ!

ঐ দেখ, চিরিবুরুর পাহাড়ে আগুন জ্বলছে বহুরাণী। লিজা আর ছোটা লেড়কীটা আছে ঐ পাহাড়খানার উপর আমার ক্যাম্পে। হা ভগবান!

গাড়িখানা পাশের জ্বলন্ত পাহাড়ের দিকে ঘুরিয়ে নিল সুজন সিং।

আমি লাফিয়ে উঠতে গেলাম গাড়িতে। ও পাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে আমাকে পাথরের ওপর ফেলে বেরিয়ে চলে গেল। শুধু চেঁচিয়ে বলল, লিজাকে লিয়ে যদি ফিরতে পারি চৌধ্‌রী তাহলে এই আশমানের তলায় যেখানেই থাক সুজন সিংয়ের সাথে তোমাদের দেখা হবেই।

আমি আর সেঁজুতি পাশাপাশি মোহগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

দেখলাম, সুজনের জীপটা পাহাড় ঘুরে উঠে যাচ্ছে। পাহাড়ের চারদিক ঘিরে যেন সৃষ্টি হয়েছে একটা অগ্নিবলয়। জীপটা পাহাড়ের ওপারে কিছুক্ষণের জন্যে ঢাকা পড়ে গেল। হঠাৎ চীৎকার করে কেঁদে উঠল সেঁজুতি, দেখ, দেখ, কি রকম জ্বলে উঠেছে সুজনের জীপটা।

মুহূর্তে আমার চোখের ওপর ফুটে উঠল একটা জ্বলন্ত আগুনের গোলা। সেটা গড়াতে গড়াতে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর কোনদিন সুজন সিংকে এ আকাশের তলায় আমাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে দেখিনি।

থামলেন অনির্বাণ চৌধুরী। পরমুহূর্তে দূরে চোখ মেলে বললেন, জান মালবী, এখন কোন কোন রাতে যখন চাঁদকে কোনকিছুর আড়াল থেকে উঠে আসতে দেখি, তখন একটা ছবি চোখের ওপর ভেসে ওঠে।

সাসাংদার পাহাড়ের ওপর আবছা আলোয় একটা বলিষ্ঠ মানুষ এক নারীর হাত ধরে টেনে টেনে তুলছে! হঠাৎ অন্ধকার সরিয়ে চাঁদ উঠে এল। একটা শিমুল গাছের তলায় মেয়েটিকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে আর একটি হাত চাঁদের দিকে প্রসারিত করে বলছে মানুষটি, আশমান পর চাঁদিয়া, মেরা বুক পর লিজা।

এর পর স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন অনির্বাণ চৌধুরী। সামনের সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ল বালির জমিনে।

শঙ্খ আর মালবী একবার শুধু তাকাল রত্নমঞ্জুলা দেবীর দিকে,

সে সংস্কৃতির কোন চিহ্ন কি খুঁজে পাওয়া যাবে তার মধ্যে !

অনেক রাত অবধি ঝাউবীথির তলায় বালির জমিনে বসেছিল শঙ্খ আর মালবী। ওপরের আকাশে চাঁদ ঝাউয়ের ডালে আটকা পড়ে সোনার একটা বীণার মত মনে হচ্ছিল।

হঠাৎ শঙ্খের গলায় বেজে উঠল বৃদ্ধ ফাদারের সেই কথা :

The lovers are timeless, eternal.
They are as free and natural
As the sunlight, sand and sea.

ডাঃ জনসনের ডায়েরী

ঘুম ভেঙে যায় রাতে। একটা ভারী জিনিস ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পাই। তার পরেই চোখের ওপর ফুটে ওঠে একটা ছবি। দীর্ঘদেহী একটি মানুষ ফরেষ্ট হস্পিটাল থেকে বেরিয়ে আসছেন। হাতে একটি ল্যাম্প। এদিক ওদিক কি যেন খুঁজে ফিরছেন তিনি।

হঠাৎ আলোটা নিভে যায়।

শনি-চা-রি-ই···।

একটা আর্ত চীৎকার পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলতে থাকে। সারজম গাছের ওপর থেকে পাখা ঝাপটে উড়ে যায় বনমোরগ আর সারো-ময়নার দল।

এরপর কতক্ষণ স্তব্ধতা। কান পাতলে শোনা যায় দু'চারটে কথা। টুকরো টুকরো, কতক বা অস্পষ্ট।

আমি মরতে চাইনি ডাক্তার। অতি ক্ষীণ আহত একটা গলার আওয়াজ।

তবে কেন এমন করলে?

তোমাকে খু-উ-ব ভালবাসি, তাই।

এ বনের থেকে তোমাকে মুক্ত করে আমার দেশে নিয়ে যাব মনে করেছিলাম শনিচারি।

তোমার দেশে!

কথা অস্পষ্ট। একটা যন্ত্রণার কাতরোক্তি বলে মনে হয়।

সেখানে নিয়ে গিয়ে তোমাকে আমি উপযুক্ত মর্যাদা দিতাম।

আজ এই শেষ মুহূর্তে তোমাকে গ্রহণ করলাম ডাক্তার। পঙ্গু হয়ে, তোমার বিপদের কারণ হয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারলাম না। আমার মত আমার দেশের মানুষকেও তুমি চিরদিন ভালোবাসবে। কথা দাও, কোনদিন তাদের ছেড়ে যাবে না।

কথা দিচ্ছি শনিচারি।

এরপর সীমাহীন নীরবতা! পাহাড়ের আড়াল থেকে অতি উজ্জ্বল নীলাভ একটি দ্যুতি ফুটে উঠছে। সূর্যোদয়ের সূচনা হচ্ছে ওপারে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে এ পারের ছবি।

নতজানু হয়ে বসে আছেন ডাক্তার জনসন প্রার্থনার ভঙ্গীতে। সামনে নিস্পন্দ শুয়ে আছে আদিবাসী এক কন্যা। যেন এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে।

* * *

আপনারা যদি কেউ কখনো সিংভূমের সারান্দা ফরেস্টে আসেন তাহলে আমার মত এমনি বিচিত্র এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবেন কিছুকাল। সাতশোটি পাহাড় সারান্দা নাম নিয়ে সবুজ অরণ্যের পোশাক পরে দক্ষিণ

পশ্চিম থেকে উত্তর পূর্বে চলে গেছে। আপনি পাহাড়ী রাস্তা ধরে এগিয়ে আসবেন। একদিকে উঁচু পাহাড়, অন্যদিকে পাহাড়ী খাদ। তার মাঝে অপ্রশস্ত পথ। পাহাড়ের গায়ে আদিম অরণ্য। শাল, হেসেল, বীজা, শিমুলের ঘন বসতি। অজস্র লতাগুল্মে রহস্যময় বলে মনে হবে আপনার সারান্দা বনভূমি। কুইনা রেঞ্জ ধরে চলে আসুন। কিছুদূর এগিয়ে সামনে দেখবেন একটি পাহাড়ী নদী। ভারী মিষ্টি তার নাম। কোয়েল নামের সত্যি একটা যাদু আছে। নুড়ির নূপুর বাজিয়ে কোয়েল একখানা নীল শাড়ি গায়ে পাক দিয়ে জড়াতে জড়াতে ছুটে চলেছে।

নদী পেরিয়ে চলতে চলতে আপনি একসময় এসে পড়বেন 'ছোট নাগরা' নামে একটি পাহাড় ঘেরা আদিবাসী গ্রামের মাঝখানে। দূর থেকে দেখতে পাবেন আদিবাসী 'হো'দের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। লাল কালো মাটির প্রলেপ লাগানো দেয়াল। ঐ পাহাড়ী গ্রামটিতে ঘুরতে ঘুরতে আপনি কয়েকটি চিহ্ন দেখতে পাবেন। পাথর-গড়া মন্দির আর ইঁটের তৈরী ভাঙা গড়ের ধ্বংস-স্তূপ। বনের মাঝে এ ধরণের চিহ্নগুলি সত্যিই আপনাকে অবাক করবে। আপনি ভাবতে ভাবতে গ্রামটি পেরিয়ে আসবেন। কিছুদূর বনের পথে এগিয়ে এসে বাঁক ফিরলেই আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে একটি পরিচ্ছন্ন শাল মহুয়ায় ঘেরা আস্তানা। বেশ খানিকটা জমি নিয়ে চমৎকার গাছপালা, লতায় ফুলে সাজানো জায়গাটি আপনাকে আকর্ষণ করবে বিশেষভাবে। আপনি পথ থেকে একটু উঠে এলেই দেখতে পাবেন কয়েকটি বাংলো টাইপের খড়ো ঘর। তাদের একটির ওপরে কাঠের সাদা রঙ করা ক্রুশ আপনার চোখে পড়বে। এই নিভৃত বনভূমিতে আপনি ক্রুশচিহ্ন দেখে যখন মনে মনে চিন্তা করবেন, কি করে এখানে এল খৃষ্টধর্ম, ঠিক সেই সময় হয়ত আপনার চোখে পড়বে আর একটি বিচিত্র বস্তু। চার্চের সামনেই একটি বাঁধান বেদীর ভেতরে ঈষৎ উঁচু একটি মণ্ড। আপনি যদি আদিবাসী 'হো'দের সংস্কার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হন তাহলে সহজেই বুঝতে পারবেন ঐ মণ্ডটি 'আদিং' ছাড়া আর কিছু নয়। ঐ আদিং-এর ভেতর রক্ষিত আছে কোন আদিবাসীর আত্মা।

আপনি নিশ্চয়ই এ দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যাবেন। একই সঙ্গে চার্চের এলাকায় এ ধরণের আদিং-এর অস্তিত্ব কি করে থাকতে পারে এই নিয়ে যখন আপনি জটিল চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়বেন, ঠিক সেই সময় এক অতি বৃদ্ধ পাদ্রীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে যেতে পারে।

তাঁর তুষারশুভ্র কেশ আর মুখের মৃদু হাসিটি আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

আপনি এগিয়ে গিয়ে এই বিচিত্র ব্যাপারটি সম্বন্ধে তাঁর কাছে কিছু জানতে চাইবেন। তিনি অমনি মৃদু হেসে আপনার হাত ধরে নিয়ে যাবেন চার্চের ভেতর। তারপর আপনার হাতে একখানি অতি জীর্ণ পুঁথি তুলে দিয়ে ইঙ্গিতে পড়তে বলবেন। আপনি বৃদ্ধ পাদ্রীর নির্দেশে বাইরে এসে বাঁধান বেদীর পাশে বসে একের পর এক পাতা উল্টে যাবেন। অজ্ঞাত অরণ্য মানুষের অলিখিত

এক ইতিহাস ফুটে উঠবে আপনার চোখের ওপর। 'ডাক্তার জনসনের ডায়েরী' থেকে আপনি আদিম অরণ্যের বিচিত্র অনাস্বাদিত এক রহস্যের সন্ধান পাবেন।

ডাক্তার জনসনের ডায়েরী

উৎসর্গ : যে প্রেম আমার ভেতর মহৎ ভালবাসার সৃষ্টি করেছে, সে প্রেমকে নত হয়ে নমস্কার করি। যে কুমারী আমাকে সেই প্রেম দান করেছেন, তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করি আমার এই স্মৃতি-গ্রন্থখানি।

২০শে জুন : ১৮৯৮

জামদা থেকে হাডসনের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে আসতে বেশ মজা লাগল। এখানে ওখানে পাহাড়গুলো ছড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে সমতল। কোথাও বা দু'চারটে জলের ধারা চোখে পড়ে। ইঁটের রঙের মত জলের রঙ এখানে। হাডসন বললেন, এখানকার পাথরে নাকি প্রচুর লোহা আছে।

পথের মাঝে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ভালই হল। যে রকম রোদ চড়তে আরম্ভ করেছিল, তার ভেতর এতটা পথ আসা সত্যিই কষ্টকর হত। যীশুকে ধন্যবাদ, মেঘ করে বৃষ্টি এল। পাহাড়ের ওপর যখন মেঘ জমে উঠছিল তখন আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম সেদিকে। ছোট এক টুকরো মেঘ দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের ভেতর পাহাড়ের কোল বেয়ে নামতে লাগল সে মেঘ। গুরু-দেহ পাখি যেমন পায়ের ওপর ভর রেখে কিছুটা দৌড়ে এসে আকাশে ডানা মেলে দেয়, ঠিক তেমনি পাহাড়ের কোল বেয়ে খানিকটা নেমে এসেই মেঘটা যেন পাখা ঝাপটে উড়ে আসতে লাগল। শোঁ শোঁ শব্দ উঠল। হাডসন ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। আমাকেও নামতে বললেন। পথের পাশে কয়েকটা শালের গাছ জটলা করে দাঁড়িয়েছিল। আমরা তার আশ্রয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘোড়া দুটোকে সেই গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখলাম।

মুক্তোর দানার মত এক সময় বৃষ্টি ঝরতে লাগল। প্রথমে বড় বড় ফোঁটা, তারপর অঝোর ধারায়। যেদিক থেকে বাতাস বইছিল আমরা তার বিপরীত দিকে দাঁড়িয়েছিলাম। ইচ্ছে করছিল, একটু জলে ভিজি। হাডসনকে আমার ইচ্ছের কথাটা জানালাম।

হাডসন হেসে বললেন, ডাক্তার, চিকিৎসার গোড়ার কথা হল প্রকৃতি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জানা। তারপর ওষুধের কথা।

বললাম, তা মানি, কিন্তু এ কথা কেন?

এই যে তুমি চাইলে বৃষ্টিতে ভিজতে। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজলে সাঁদগর্মীতে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। যে দেশে ডাক্তারী করবে, সে দেশের

আবহাওয়া সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হয়।

কথাটা ভালই লাগল। বয়েসের একটা অভিজ্ঞতা আছে। ডাক্তার হলেও আমি তরুণ; হাডসন ফরেস্ট-রেঞ্জার হলেও অনেক প্রবীণ। পুঁথিপড়া শিক্ষার চেয়ে অভিজ্ঞতার দাম অনেক বেশী।

আমরা নিজেদের বৃষ্টির ছোঁয়া থেকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু সবটুকু পারলাম না। এলোমেলো বাতাসে কিছুটা ভিজিয়ে দিয়ে গেল। এদিকে শালের বড় বড় পাতার থেকে ভারী ভারী জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগল আমাদের মাথা আর পোশাকের ওপর।

বৃষ্টি থামলে শান্ত হল প্রকৃতি। গরম অনেক কম বলে মনে হল। আমরা আবার ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলাম।

বনের ভেতর ঢুকে মনে হল, দিনের বেলাতেই সূর্য ডুবে গেছে। হাডসন সামনে চলেছেন, আমি আছি পেছনে। পথের অন্ধিসন্ধি হাডসনের নখদর্পণে। তবু চারদিকে লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে এগুচ্ছেন তিনি। আমার কিন্তু চারদিকের গাছপালা, লতাপাতার নিবিড়তা মনোরম মনে হচ্ছিল।

হাডসন ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন। ইঙ্গিতে আমাকে থামতে বললেন। তারপর হাতের ইসারায় যে দৃশ্য দেখালেন তা কোনদিন ভোলার নয়।

একটি একশিলা পাথরের ওপর মেঘের ছায়া এসে পড়েছে। লতায় পাতায় ফুলে জায়গাটি মনোরম। পাশের পাহাড় থেকে ঝির ঝির শব্দে ঝরে পড়ছে একটা ক্ষীণাঙ্গী ঝরণা। ঐ একশিলা পাথরের ওপর পাখা মেলে নাচছে একটি ময়ূর। পাখায় কি উজ্জ্বল রঙের বাহার। কতক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। মেঘভাঙা রোদের দু'এক টুকরো রশ্মি ইতিমধ্যে এসে পড়েছে ওর চিত্রিত পাখার ওপর। ঐ যে আর একটি ময়ূর। একটা মহুয়া গাছের ডালে সে বসেছিল। এবার দ্বৈত নৃত্য শুরু হল। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখতে লাগলাম। বনের নটনটী নেচে চলেছে আপন মনে। দর্শকের দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই। মানুষের তৈরী করা রঙ্গমঞ্চে যে নৃত্য-শিল্পীরা নাচে, তারা কি এমন করে দর্শকদের ভুলে আপনার ভেতর ডুবে থাকতে পারে।

১লা সেপ্টেম্বর ঃ

কয়েকমাস যেন বৃষ্টিতে ভেসে গেল পাহাড়ী দেশটা। কুমুডির বাংলোতে প্রায় বসে বসেই কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। বর্ষার দিনে পাহাড়ে ধ্বস নেমে পথ দুর্গম করে দিয়েছে। তার ওপর দিয়ে পথ করে যাওয়া একেবারে অসম্ভব।

আমাদের বাংলোর দেয়াল, মেঝে সব কাঠের। ছাউনিটা খড়ের। চাল বেয়ে টপ টপ করে যখন বৃষ্টির জল পড়ে তখন জলের রঙ প্রথম দিকে লালচে দেখায়। সামনে একটা চেয়ার ফেলে সারাদিন আমি বসে থাকি। বাংলোর চারদিকে কাঠের খুঁটির বেড়া। সেই খুঁটিগুলো আর দেখা যায় না। কত রকমের লতা, পাতা, ফুলে তাদের ছেয়ে ফেলেছে। বাংলোর কর্মচারীদের কাছ থেকে কয়েক রকমের ফুল আর লতার নাম শিখে নিয়েছি। একটি লতার

নাম 'জনাপা'। গুচ্ছ গুচ্ছ বেগুনী আর সাদা ফুলে তার সর্বাঙ্গ ভরে আছে। বনমল্লী, যুঁই আরও কত ফুল। মিষ্টি গন্ধ ছড়ায়। পাশেই কারো নদী। মাঝে মাঝে বান ডাকে। শো শো শব্দ উঠলেই আমি বাংলো থেকে বেরিয়ে নদীর পাশে গিয়ে দাঁড়াই। ওপরের পাহাড়ে কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেলে সেই বৃষ্টির ঢল নেমে আসে নদী বেয়ে। তার আওয়াজ ভেসে আসে বহু দূরের থেকে।

নদীতে দেখা যাচ্ছে নীল জলের প্রবাহ, পরক্ষণেই কত উঁচু, একটা গৈরিক জলের ঢেউ তার ওপর এসে পড়ল। অমনি কূল ছাপিয়ে বইল জলের ধারা।

মাঝে মাঝে কুলিকামিন নিয়ে হাডসন পথের অবস্থা দেখতে বেরিয়ে যান। কখনো বা তাঁর বাংলোতে ফিরে আসার আগেই প্রবল বর্ষা শুরু হয়। মেঘের মাতামাতি চলতে থাকে। বাজের গর্জনের সঙ্গে পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ শোনা যায়। আশপাশের পাহাড়গুলো সে শব্দে কেঁপে কেঁপে ওঠে। হাডসনের জন্যে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ি। বড় জেদী আর একরোখা মানুষ এই হাডসন। বিপদের ঝুঁকি যতটা নেওয়া চলে তার চেয়ে অনেক বেশী নিতে পারেন তিনি। তাই মাঝে মাঝে তাঁর জন্যে চিন্তিত না হয়ে উপায় থাকে না। হাডসন আমার পিতৃব্যের বন্ধু। তাঁর ভরসাতেই আমার এখানে আসা। কুলিকামিনেরা পাহাড়ী রাস্তাঘাট তৈরী করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়। মাঝে মাঝে জ্বরজাড়িতে ভোগে। তাদের জন্যে সরকারী রিজার্ভ ফরেস্টে চিকিৎসকের দরকার। নতুন জায়গা দেখার একটা লোভও ছিল আমার। তাই হাডসনের ডাকে চলে এলাম।

এই বর্ষার ভেতর দু'একদিন হাডসনের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। বৃষ্টি বন্ধ থাকলেও পাহাড়ের মাথায় মাথায় মেঘ থমকে থাকত। তারই ফাঁকে সূর্যের আলো এদিক ওদিক একটু দেখা দিলেই পাখিরা ঝাঁক বেঁধে রোদ্দুরের লোভে জড় হত। নিপুণ শিকারী হাডসনের অব্যর্থ লক্ষ্য। কয়েক জোড়া বন মোরগ, তিতির শিকার করে বুনো লতায় বেঁধে নিয়ে আমরা বাংলোয় ফিরতাম।

রাত্রে বৃষ্টি নামত। আমাদের বাংলোটা সেই মুহূর্তে মনে হত যেন সমস্ত জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিশাল সমুদ্রের বুকে একটি নিঃসঙ্গ তরণীতে আমরা দুটি প্রাণী কোথাও ভেসে চলেছি বলে মনে হত।

হাডসন যেমন শিকারী তেমনি ভোজনবিলাসী। এখানকার বাবুর্চির রান্না তাঁর আদপেই পছন্দ হয়না। রাতে বসে বসে হাডসন তাঁর সংসারের কথা তুলতেন। আগামী শরৎকালে সমস্ত পরিবারকে এনে ফেলার একটা পরিকল্পনাও তিনি এই সময় স্থির করে ফেললেন।

১৭ই নভেম্বর ঃ

একদিন দেখলাম হাডসন আর বাংলো থেকে কাজে বেরুলেন না।

বললাম, কি হল, শরীর খারাপ নাকি ?

হাডসন কোন কথা না বলে আমার হাতে একখানা চিঠি এগিয়ে দিলেন।

চিঠিখানা এসেছে বোম্বে থেকে। হাডসনের এক বন্ধু সেই চিঠির রচয়িতা। সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী তিনি। চিঠির মোটামুটি বক্তব্য এই, সরকার একদল মিশনারীকে সারান্দা ফরেস্টে পাঠাচ্ছেন আদিবাসীদের ভেতর খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য। এ কাজে দু'দিক থেকেই লাভ হবে। অখৃষ্টানেরা প্রভু যীশুর মাহাত্ম্য বুঝতে পারবে। তা ছাড়া পরোক্ষে আর একটি বড় রকমের লাভের সম্ভাবনা আছে। সেটি হল, খৃষ্টধর্মের প্রভাবে এলে আদিবাসীদের ভেতর কথায় কথায় বিদ্রোহ করবার আগ্রহ কমে আসবে। তখন সরকারের পক্ষে বনভূমিতে নিরুপদ্রবে রাজত্ব করা আর ব্যবসা চালানোর সুবিধে হবে।

বললাম, এতে তো আপনারই সুবিধে। আদিবাসীরা আপনাকে কুলিকামিন দিয়ে এখন সাহায্য করতে চাইছেনা, তখন আর এ হাঙ্গামা থাকবেনা।

হাডসন বললেন, চিঠির শেষ অংশটুকু পড়ে দেখ।

চিঠি শেষ করে আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, কি আনন্দ, আপনার পরিবারের সবাই দেখছি ঐ দলের সঙ্গেই আসছেন।

হাডসন এবার উঠে বসলেন। এমন উত্তেজিত মুখভাব আমি এর আগে কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না।

বললেন, পাদ্রী পিটারের সঙ্গে আসছে দেখতে পাচ্ছ না ?

ওঁর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে আমি বোকার মত তাকিয়ে রইলাম।

হাডসনের মুখে করুণ হাসির রেখা ফুটে উঠল। মুহূর্তে হাডসন শিশুর মত অসহায় হয়ে পড়লেন।

জনসন, এ একান্ত আমার ব্যক্তিগত দুঃখের কথা। অন্য কারু জানার কথা নয়।

এমন বলিষ্ঠ মানুষের এমনি কোমল একটা আঘাতের জায়গা থাকতে পারে তা আগে কোনদিন ভাবতে পারিনি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম আমরা।

হাডসন বললেন, তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ডাক্তার; তবু এই নির্জন জায়গায় একই সঙ্গে আমরা কাটাচ্ছি, তাই তুমি আমার বন্ধু। তোমার কাছে গোপন করার কিছু নেই আমার।

মনের কোন একটি গোপন কথা হাডসন আমাকে আজ শোনাতে চান, তাই এ ভূমিকা।

হাডসন বললেন, আমার স্ত্রী তাঁর কুমারী জীবনে পিটারের প্রতি আসক্তা ছিলেন। আমার সঙ্গে ওঁর বিয়ে হলে পিটার অবিবাহিত থেকে যান; পরে মিশনে যোগ দেন।

হাডসনের ব্যথার কাঁটা কোথায় বিঁধে আছে এতক্ষণে তা বুঝলাম।

সান্ত্বনা দেবার ত্রুটি রাখলাম না।

বললাম, কুমারী জীবন আর বিবাহিত জীবনের ভাবনা এক হবে এমন কোন কথা নেই। আজ উনি পাদ্রী পিটারের সঙ্গে আসছেন বলে আমরা নিশ্চিত ধরে নিতে পারিনা যে ওঁর মনে এখনও কুমারী জীবনের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে।

হাডসন হেসে বললেন, যুক্তি মনকে অনেক সময় প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু মন প্রায়-ক্ষেত্রেই তাকে স্বীকার করতে চায় না।

বললাম, কোন সন্দেহ থাকলে আপনি বিবাহ-বিচ্ছেদের সুযোগ নিতে পারতেন।

করুণ হাসি হাসলেন হাডসন।

বললেন, একবার এক হিন্দু সাধুর সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কথা হয়েছিল। সাধু আমাকে বললেন, যে বাতাস আমাদের নৌকো ডোবায়, জলের ভেতর ডুবে যেতে যেতে আমরা সেই বাতাসকেই প্রতি মুহূর্তে চাই।

কথাটা মনে রাখার মত।

হাডসন বললেন, আমাদের যা পারা উচিত, বা পারা দরকার ছিল, তা সব সময় পারা যায় না। যে আমাদের জীবনে দুর্ঘটনা ঘটায়, অনেক সময় আমাদের মন তাকেই বেশী করে আগলে রাখতে চায়।

আমি চুপ করে গেলাম। জীবনের রহস্য সত্যই বিচিত্র।

২৫শে নভেম্বর ঃ

ইতিমধ্যে মিসেস হাডসন এসে পেঁীছেছেন। সঙ্গে অবিবাহিতা বোন, ডরোথি।

দু'জনের বয়সে যেমন তফাৎ স্বভাবেও ঠিক তেমনি।

মিসেস হাডসন অত্যন্ত বাকপটু। রসিকতার সঙ্গে সামাজিকতার চমৎকার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন তিনি। সারাক্ষণ কৌতুক আর হাসির টুকরো ছড়িয়ে চলেছেন।

তাঁর বাইরের এই উজ্জ্বলতার ভেতর কোথাও যে মনের আকাশে মেঘ জমে থাকতে পারে তা একেবারেই ভাবা যায় না।

ডরোথির প্রকৃতি একটু চাপা। চেষ্টা করেও সে উজ্জ্বল হতে পারে না। স্বভাবের গভীরে কোথায় যেন তার একান্ত নির্জন বসবাসের জায়গা আছে। সেখান থেকে তাকে কদাচিৎ বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

যে ক'দিন পাদ্রী পিটার বাংলোতে রইলেন, হাডসন অন্য-মানুষ। চেনাই যায় না যে ভেতরে তাঁর কোন ক্ষত আছে।

আদর আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি রইল না। সকাল, সন্ধ্যা পিটারের সঙ্গে চলতে লাগল নানান পরিকল্পনা। স্থির হল, সাসাংদাতে একটি চার্চ তৈরী করে সেখান থেকেই ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

সাসাংদায় চার্চ তৈরী হল। কাঠের বাড়ী, খড়ের চাল। চার্চের লাগাও আরও কয়েকখানা ঘর উঠলো। পাদ্রী পিটার আর তাঁর দলবল থাকবেন সেখানে। স্কুলের জন্যে জমি তৈরী করা হল।

উদ্বোধনের দিন আমরা সবাই মিলে ঘোড়ায় চড়ে চললাম সাসাংদার চার্চে। সারাদিন রইলাম সেখানে। প্রার্থনায় যোগ দিলাম। প্রথম দিনেই একটি আদিবাসী মেয়েকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া হল। মেয়েটি আমাদের বাংলোতে

পরিচারিকার কাজ করত। স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছিল তার। দীক্ষা নিয়ে মেয়েটি মিশনারীদের কাছেই থেকে গেল।

কাজকর্মের জন্যে একটি লোকের দরকার ছিল। তাই চার্চেই রাখা হল মেয়েটিকে।

সন্ধ্যায় আমরা সবাই মিলে ফিরে এলাম বাংলোতে।

২১শে ডিসেম্বর ঃ

বর্ষায় ভেঙে গিয়েছিল পথঘাট, ডিসেম্বরের ভেতর সব মেরামত হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে কুম্‌ডির বাংলো থেকে খানিক দূরে থল্‌কোবাদে গড়ে উঠেছে আমার হাসপাতাল। রোগী অল্পই থাকে, আমাকে প্রায় একা একাই কাটাতে হয়। বসে বসে বই পড়ি। শিকার-কাহিনী পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। পাদ্রী পিটার কয়েকখানা বই পাঠিয়েছেন। সবই প্রায় ধর্মগ্রন্থ। এত সহজ করে বইগুলির ভেতর ধর্মের কথা লেখা আছে, যা পড়লে সাধারণ মানুষও ধর্ম-পথের মোটামুটি একটা হদিস পেতে পারে।

হাসপাতালের সামনে একটি চমৎকার শালের বন। তলাকার পাথরগুলো বড় পরিচ্ছন্ন। আমি বসে বসে দেখি, একটির পর একটি শালের পাতা খসে খসে পড়ছে। একটা দমকা হাওয়া লাগল, অমনি কি বিচিত্র শব্দ করে ঘুরতে ঘুরতে ওরা নেমে গেল নীচের উপত্যকার ভেতর। রাতের আকাশ ঘন নীল। জ্বল জ্বল করে জ্বলছে একটা তারা শাল গাছটার ঠিক মাথার ওপর। আরও অগুন্তি তারা আকাশে। সবার ভেতর এটি যেন একটু আলাদা।

কত কাছে, আর কত স্নিগ্ধ আলো ছড়াচ্ছে। যীশুর আবির্ভাবের সময় পূর্ব-দেশের সাধুরা এমনি একটি নক্ষত্র আকাশে দেখেছিলেন।

শাল গাছের মাথার ওপর ঐ তারাটি দেখলে আমার মন কেমন যেন শান্ত আর গভীর হয়ে আসে।

কয়েকদিন আগে আমার হাসপাতালে একটি রোগী এসেছে। সে রাতে কিছুতেই ঘুমুতে পারছেনা। ঘুমের ওষুধ দিলে কিছু সময় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে, তারপর জেগে উঠলেই শুরু হয় গোঙানী। ওর জন্যে এ ক'দিন আমার চোখেও ঘুম নেই।

মনে মনে প্রার্থনা করি, আমার হাসপাতালে যে রোগীটি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে রাতে ঘুমুতে পারছেনা, তার ঐ তারার আলোর মত স্নিগ্ধ শান্তি আসুক। জগতের যেখানে যত রোগার্ত, শোকার্ত রয়েছে তারা সুস্থ হয়ে উঠুক, সুখী হোক।

এই শীতের রাত্রি, কুয়াশার চাদর বিছান উপত্যকায় অতন্দ্র চাঁদের আলো, বনভূমির নিভৃতলোকে কীটপতঙ্গের বিচিত্র ধ্বনি আমাকে যেন আবিষ্ট করে রাখে।

৩০শে ডিসেম্বর ঃ

সেদিনটির স্মৃতি বোধকরি ভুলতে পারবনা কোনদিন।

ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলাম কুম্‌ডির বাংলোর দিকে। পথের ধারে দেখলাম কাঞ্চন ফুল ফুটে আছে। এ দেশের গাছপালা আর ফুলের কত নামই না আমার ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে।

একটা দুটো গাছ নয়, শত শত কাঞ্চন ফুলের গাছের যেন বন তৈরী হয়েছে। আমি ঘোড়ায় বসে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখ আর ফেরাতে পারলাম না। কোন কোন গাছে সাদা সাদা ফুল ফুটেছে, আবার কোন গাছে বা ঈষৎ বেগুনী আভার ফুল। গাছ খুব বড় নয়, কিন্তু বড় শোভন সুন্দরভাবে ডালপালা পাতাপত্র মেলে রেখেছে।

আরও এগিয়ে চললাম। বেলা শেষের তখনও অনেক বাকী। শীতের বনভূমি এরই মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। প্রকৃতির কি বিচিত্র আয়োজন। টেকোমা ফুল ফুটে রয়েছে পথের ধারে। গুচ্ছ গুচ্ছ হলুদ রঙের ফুল। খাদের ধারে তিলাই গাছটার ছোট ছোট সাদা ফুলে তখনও মৌমাছিদের ভিড় ভাঙেনি। ওদিকে ডাইনে উঁচু পাহাড়ের গায়ে আরাবা গাছে বসে আছে এক ঝাঁক পাখি। বিচিত্র কলরব তুলেছে তারা। ডালের ফাঁকে ফাঁকে লাল লাল ছোট ফুলগুলি উঁকি দিচ্ছে।

শীতের প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে অতি ধীরে এগিয়ে চলেছি, আর মনে মনে ঈশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টির তারিফ করছি। হঠাৎ আমার ঘোড়াটা থমকে দাঁড়াল। সামনে একটি টিলা। ঐ টিলার কোল ঘেঁষেই আমার পথ। পথটা ঐ পাহাড়টার কাছে এসে কোণ তৈরী করে বেঁকে গেছে। এপারের থেকে ওপারের পথটা দেখা যায় না। ঘোড়াটা হঠাৎ থামল দেখে আমি চারদিকে তাকাতে লাগলাম। হঠাৎ যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন হয়ে গেল। পাহাড়টা যেখানে দুটো পথের কোণ সৃষ্টি করেছে তার নীচেই সাদা সল্ট লিকের একটা রেখা অগভীর ভ্যালির মধ্যে নেমে গেছে। ঐ সল্ট লিক্ ধরে উঠে আসছে একটা সম্বর। আর তার কয়েক হাত ব্যবধানে শাল আর হেসেল গাছের আড়ালে থেকে একটি চিতা গুঁড়ি মেরে সম্বরটাকে অনুসরণ করছে। সম্বর কিছু একটা বিপদের গন্ধ পেয়েছে কিন্তু চিতাটাকে দেখতে পাচ্ছে না। তাই লাফাতে লাফাতে সল্ট লিক্ ধরে ওপরের পাহাড়ের দিকে উঠে আসছে, আবার একটু থেমে সিধে দাঁড়িয়ে পেছনের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে।

এ দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার চিন্তা প্রবল হয়ে উঠল। ঘোড়ায় চড়ে এই পাহাড়ী আঁকাবাঁকা খাদের পথে দৌড়ান সম্ভব নয়। তাতে যে শব্দ হবে, চিতাটা সে শব্দে অন্যমনস্ক হয়ে যাবে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে ধীরে ধীরে নেমে আশেপাশে একটা গাছ খুঁজতে লাগলাম। ঐ টিলার পাশেই একটা উঁচু পলাশ গাছ ছিল। জুতো খুলে তার ওপর উঠলাম।

এখন টিলার দু'পাশে দুটো পথই আমি দেখতে পাচ্ছি। সম্বরটা লাফ

দিয়ে এক ধাপ টিলার ওপর উঠে এল। চিতাটা এখন পথের পাশে একটা ঝোপের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসেছে।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটে গেল। দুটি গরু কতকগুলো কাঠের বোঝা বয়ে আনছিল পশ্চিমের পথটা ধরে। তাদের পেছনে আদিবাসী একটা লোক গরুগুলোকে তাড়িয়ে আনছিল। আমি এই দৃশ্য দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। চীৎকার করে সাবধান করতে গেলে চিতাটার দৃষ্টি সম্বরের ওপর থেকে গরু আর আদিবাসীর ওপরে গিয়ে পড়বে। তখন বিপরীত ফল ফলবে।

আমি চুপচাপ প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে হরিণটা আর এক ধাপ লাফ দিয়ে ওপরের বনের কাছাকাছি গেলেই বাঘটা তাকে অনুসরণ করে আরও ওপরে উঠে আসবে। তখন ঐ লোকটা বেঁচে গেলেও যেতে পারে।

কিন্তু সম্বর নড়ল না, বাঘটাও বসে রইল পথের ওপর। আর তাদের মাঝে এসে পড়ল গরু দুটো আর আদিবাসী লোকটি। বাঘটাকে দেখে গরু দুটো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। লোকটা তখনও বাঘটাকে দেখতে পায়নি। সে গরুগুলোকে আয়ত্বে আনবে বলে হেঁই-হো হেঁই-হো করে তাদের পিছু পিছু দৌড়ে চলল। লোকটি যেই চিতার ধার ঘেঁষে বেরিয়ে যাবে, অমনি একটি থাবা এসে পড়ল তার ঘাড়ে। বলিষ্ঠ লোকটা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। আমি গাছের ওপর থেকে আর্তনাদ করে উঠলাম। পাহাড়ে পাহাড়ে আমার সে চীৎকার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

গাছের ওপর থেকে চেয়ে দেখি, বেড়াল যেমন করে ইঁদুরকে একবার আঘাত করে আবার খেলা করে, ঠিক তেমনি লোকটাকে নিয়ে বাঘটা খেলা করতে লাগল।

সূর্যাস্ত হয়ে গেল সামনের পাহাড়ের আড়ালে। পেছনের রাস্তায় একটা হৈ চৈ শুনে তাকিয়ে দেখি কতকগুলি আদিবাসী তীর ধনু নিয়ে মশাল জ্বেলে এদিকে দৌড়ে আসছে। আমি গাছের ওপর থেকে চীৎকার করে তাদের ডাকতে লাগলাম। মশাল দেখে আর হৈ চৈ শুনে বাঘটা লোকটাকে পথের ওপর ফেলে রেখে সরে গেল।

ওরা এসে লোকটাকে ঘিরে চেঁচামেচি জুড়ে দিল। আমি গাছের থেকে নেমে এলাম। পথের ওপর থেকে কুড়িয়ে নিলাম আমার ওষুধের ব্যাগটা। লোকটির কাছে গিয়ে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে আমার সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে আসতে বললাম। লোকটির তখনও জ্ঞান ফেরেনি। ওরা ওকে আমার হাসপাতালে বয়ে দিয়ে গেল। আজ ক'দিন ধরে সমানে লোকটার চিকিৎসা চলেছে। সম্পূর্ণ আরোগ্য হতে পারেনি এখনও।

রাতে বসে বসে রহস্যময় প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি, এত সুন্দর তুমি, অথচ কি ভীষণ।

১৫ই মার্চ : ১৮৯৯

হাডসনের লোক এসে জরুরী খবর দিয়ে গেল, যেন একটুও দেরী না করে

আমি কুম্‌ডির বাংলোতে যাই।

তাড়াতাড়ি হাসপাতালের কাজ গুছিয়ে আমি বাংলোতে গিয়ে পেঁছিলাম। গেটের সামনেই পায়চারী করছিলেন হাডসন। আমাকে দেখেই বেরিয়ে এলেন। বাংলোতে না গিয়ে হাডসনকে অনুসরণ করে আমরা এসে বসলাম কারো নদীর ধারে নতুন তৈরী সাঁকোটার ওপর। হাডসন আমার হাতটা চেপে বসলেন।

ব্যাপার কি বলুন তো, কোন অঘটন কি ঘটেছে?

আমার হাত তেমনি হাডসনের হাতের ভেতর ধরা রইল।

কিছুক্ষণ পরে আত্মস্থ হয়ে বললেন, রেবেকা পাগল হয়ে গেছে!

রেবেকা হাডসনের স্ত্রী। আমি গত সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে কথা বলে গেছি। পাগলামোর কোন লক্ষণই তাঁর ভেতর প্রকাশ পায়নি।

বললাম, আনুপূর্বিক ঘটনাগুলো বলে যান।

হাডসন বললেন, ইদানিং প্রায়ই উনি সাসাংদার গীর্জায় যেতেন। তুমি জান, নানা কাজে আমাকে বাইরে বাইরে যেতে হয়। আমি ওঁর সঙ্গে যেতে পারতাম না। ডরোথিকে নিয়েই উনি ওখানে যেতেন। সঙ্গে থাকত আমার আরদালী।

প্রথম দিকে গীর্জা থেকে ধর্মবিষয়ক অনেকগুলি করে বই আনতেন। রাত জেগে তাই পড়তেন।

তুমি জান জনসন, কারো স্বাধীন ইচ্ছায় আমি কখনো বাধা দিতে চাই না।

উনি এক ঘরে পড়তেন, আমি অন্য ঘরে ঘুমোতাম।

এক রাতে ডরোথির সঙ্গে কি নিয়ে যেন ওঁর কথা কাটাকাটি হল। কিছুই বুঝলাম না। তারপর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছেন। গীর্জায় যান না, একা একাই ঘরের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ান। কি যেন হারিয়ে ফেলেছেন, তাকেই পাতি পাতি করে খোঁজেন। প্রথমদিকে ডরোথিকে দেখলে কথা বলতেন না। এখন ওকে একেবারেই দেখতে পারেন না। কারণে অকারণে তেড়ে যান।

বললাম, কিছু যদি মনে না করেন তাহলে আমি দু'একটি কথা আপনার কাছে জানতে চাই।

স্বচ্ছন্দে, হাডসন বললেন।

ডরোথির কি আপনার ওপর কোন দুর্বলতা লক্ষ্য করেছেন?

হাডসন যেন আকাশ থেকে পড়লেন, আমার ওপর! ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খুব নিকট হলেও বয়সের পার্থক্যটা নিশ্চয়ই তুমি লক্ষ্য করেছ।

আপনি আপনার দিকের কথাই বলছেন, ওঁর মনের দিকটা নিশ্চয়ই ভেবে দেখেননি।

চিন্তিত হলেন হাডসন।

বললেন, আমি কিন্তু কোনদিন তার কোন আভাস পাইনি।

আচ্ছা, এটা কি লক্ষ্য করেছেন, আপনার কাছে ডরোথি কোন কারণে এলে আপনার স্ত্রী উত্তেজিত হয়ে ওঠেন?

হাডসন কিছুক্ষণ পেছনের ঘটনাগুলো মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এক সময় বললেন, তোমার অনুমান সত্য বলেই মনে হচ্ছে ডাক্তার।

ডরোথিকে কোন সময়ে আমার পড়ার ঘরে এসে ঢুকতে দেখলেই উনিও সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হন। ডরোথি চলে গেলে উনি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, তারপর এদিক ওদিক কি যেন খুঁজতে শুরু করেন।

হাডসনের শেষের কথাটার ব্যাখ্যা ঠিক মত করে উঠতে পারলাম না। হাডসনের ওপর ডরোথির অনুরাগকে সন্দেহের চোখে দেখলে রেবেকা ডরোথিকে চোখে চোখে রাখতে পারেন, কিন্তু এর ভেতর খোঁজাখুঁজির প্রশ্নটা আসে কোথা থেকে।

ব্যাপারটা আমার কাছে ঠিকমত পরিষ্কার হল না।

বললাম, আপনি বুঝতেই পারছেন, এ রোগটা সম্পূর্ণ মানসিক। সুতরাং মনের চিকিৎসা ছাড়া এর নিরাময় সম্ভব নয়। তবে সাময়িক উত্তেজনা যাতে খানিকটা দূর করা যায় সেজন্যে ওষুধ একটা দিয়ে দিচ্ছি।

আমি আর বাংলোর ভেতর গেলাম না। হাডসন আমার সঙ্গে এলেন হাসপাতালে।

ওষুধ তৈরী করে দিয়ে বললাম, কয়েকদিন গেলে তারপর নতুন চিকিৎসার কথা ভাবা যাবে, কি বলেন?

কথা বলতে গিয়ে হাডসনের দিকে তাকিয়ে দেখি, ওঁর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেখানে যেন উদ্বেগের কোন ছায়া নেই।

ঘোড়ায় উঠতে গিয়ে হাডসন হেসে বললেন, নিশ্চিন্ত হলাম ডাক্তার। পিটারকে নিয়ে রেবেকা সম্বন্ধে যে দুশ্চিন্তা ছিল তা আর রইল না। ডরোথির ওপর রেবেকার ঈর্ষাই আমাকে এতদিনের দুর্ভাবনার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে।

হাডসন চলে গেলেন। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম। রেবেকার খোঁজা-খুঁজির অর্থটা কিছুতেই আমার কাছে পরিষ্কার হল না।

২০শে এপ্রিল ঃ

মার্চে সারান্দা বনভূমিতে যেন উৎসব লেগে গেল। শীতে শালের পাতা ঝরে গিয়েছিল, বসন্তের বাতাসে নতুন প্রাণের জোয়ার এল। কোথা থেকে শূন্য ডালে জ্বলে উঠল নতুন পাতার আগুন। দেখতে দেখতে ঘন পাতায় গাছ ছেয়ে গেল। গাছে গাছে ফুল এল এক সময়। থোকা থোকা মাখন-রঙের ফুল।

মিষ্টি একরকম গন্ধে সারা বন মেতে উঠল। মৌমাছি পাড়ায় হুড়োহুড়ি পড়ে গেল মধু লুটবার। পাহাড়ী ঝোরার ধারে সাংকারলা লতা ভরে সাদা সাদা ফুল এল। হলুদ রঙের কেশর দুলতে লাগল।

শালের গাছে এসে বসল হাজার হাজার টিয়া। রাতদিন গাছে গাছে চলল তাদের জলসা। পাতায় পাতায় মিশে রইল তারা।

এদিকে 'বাহা' পরব শুরু হয়ে গেল আদিবাসীদের। শালের ফুল ফুটল আর ওদের মনে লাগল উৎসবের রঙ। নাচ গান চলল ওদের গাঁয়ে গাঁয়ে। আসর বসল শালের ছায়ায়। মহুয়ার ফুল কুড়োবার ধুম পড়ে গেল। হাড়িয়া তৈরী হল সেই ফুলে। তারপর হাড়িয়ার মদে মাতামাতি।

হো সম্প্রদায়ই এ অঞ্চলে সংখ্যায় বেশী। সাঁওতাল আর লোহার আছে অল্প সল্প।

পরবে মেয়েদের সাজের বাহার দেখবার মত। বনদেবতা 'জায়েরা'র আস্তানায় পুজো দিতে গেল আমার হাসপাতালের সামনের পথ দিয়ে। খোঁপায় গুঁজেছে লাল, সাদা ফুল আর হরেক রকম পাতা। গান গাইছে। বিচিত্র সুর আর ভাষা। তবে এই আদিম অরণ্য পরিবেশের সঙ্গে ওদের এই গানের সুরের কোথায় যেন একটা গভীর যোগ আছে। বহু রাত অবধি শোনা যায় মাদল, নাগরা আর বাঁশির আওয়াজ।

হাসপাতালে বসে বসে শুনতে পাই ওদের গানের সুর। সেই সঙ্গে দু'এক টুকরো কথাও ভেসে আসে।

'হেসামাতা মাতালেনা, বাড়ীমাতা মাতালেনা,
হেসামাতা চবজনা, বাড়ীমাতা চবজনা,
সমাগেজা তুইম বন্দলেকেনা।'

আমি মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ি। উৎসবের দিনগুলোতে পথে পথে ঘুরে বেড়াই। ওদের গাঁয়ে আমি যেতে আরম্ভ করেছি। কেউবা সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। কারু চোখে বা কৌতুহল।

কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছে।

একটা লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিল। অমনি গাঁ উজাড়। এ রোগ ধরলে কাছে পিঠে যে থাকবে তার নাকি নিস্তার নেই। কথাটা শুনেই আমি গাঁয়ে গেলাম। লোকটার ঘরে গিয়ে দেখি সে কাতরাচ্ছে। ওষুধপত্র সঙ্গেই ছিল। চিকিৎসা শুরু করলাম। কয়েক দিনের ভেতর লোকটা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

একদিন বসে আছি হাসপাতালের বারান্দায়। দেখি, দল বেঁধে আদিবাসী মেয়ে পুরুষ হাজির। কারো হাতে মুরগী, কারো বা পায়রা, আবার কেউ এনেছে মাটির ভাঁড়ে হাড়িয়া। মেয়েরা ফুল এনেছে। কি ব্যাপার! ওদের ভেতর দেখি সেই লোকটি, যার চিকিৎসা আমি করেছিলাম। লোকটি ছিল গাঁয়ের মাতব্বর। সে সেরে উঠেই দলবলকে খবর দিয়েছে। তারা তো তাজ্জব। যে লোকটা নির্ঘাত মরবে সে কিনা এমনি বেঁচে গেল। তারপর সব শুনে ভেট নিয়ে এসেছে আমার কাছে।

মেয়েরা এসে বলল, ফুল নে, তোর বউয়ের লেগে আনলাম।

আর একটি মেয়ে বলল, কই বউ দেখাবিনা?

বললাম, আমার বউ নেই।

ওরা সব হেসে লুটিয়ে পড়ল। কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে আজও আমি বিয়ে করিনি।

তারপর সারা হাসপাতাল ঘুরে উঁকি দিয়ে আমার বউয়ের খোঁজ করতে লাগল। শেষে কোন মহিলাকে না দেখতে পেয়ে ওরা আবার ফিরে এল।

এরপর যে যার নিজেদের খোঁপায় ফুল গংজতে লাগল। আমি ওদের কাছ থেকে কিছু ফুল চেয়ে নিয়ে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখলাম। ওরা আমার কাণ্ড দেখে হেসে অস্থির। ফুলদানিতে যে কেউ কখনো ফুল রাখতে পারে, তা ওরা ধারণাই করতে পারে না।

একজন ফুলদানির দিকে তাকিয়ে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওটা তোর বউ?

অমনি হাসির ঢেউ উঠল।

এই জঙ্গলের মেয়েগুলির ভেতর এত হাসি, এত প্রাণ আছে! দেখলে অবাক হতে হয়।

ওরা মুরগী আর পায়রা আমাকে খেতে দিয়ে গেল। হাসপাতালে বসেই ওরা হাড়িয়া খেল। তারপর আমার উদ্দেশ্যে যে সব প্রশংসা বর্ষণ করতে লাগল তাতে মনে হল, আমি একজন ছদ্মবেশী দেবতা।

ওরা চলে গেল, আর আমি সারাদিন বসে বসে ওদের সারল্যের কথা ভাবতে লাগলাম।

৫ই মে ঃ

হাডসনের বাংলোতে গিয়ে দেখলাম, কারো নদীর তীর ঘেঁষে যে খালি জায়গাটা পড়েছিল তাতে সারি সারি ক্যাম্প পড়েছে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন হাডসন।

সরকার সারান্দা বনে আদিবাসীদের গাছ কাটা নিষেধ করে নাগরা দিয়েছিল। তাতে আদিবাসীরা ভয়ানক ক্ষেপে গেছে।

বললাম, ওদের আস্তানার গাছ ওরা কাটবে, তাতে বাধা দিতে গেলেই বিপত্তি আসবে, এ তো স্বাভাবিক।

কথাটা তা নয় জনসন। প্রথমে ওদের কাছে নামমাত্র খাজনা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওরা আমলই দেয়নি। তখন বনের কাঠ কাটা নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে।

বললাম, আর্মড পুলিস ফোর্স এলো কোত্থেকে?

হাডসন বললেন, আমাদের অনুগত যে ক'টি আদিবাসী নাগরা দেবার কাজে নিযুক্ত ছিল, তাদের একটি ছাড়া আর কেউ ফেরেনি।

খবর পেয়ে গিয়ে দেখি, কয়েকটি নাগরাওয়ালাকে অগুণতি তীরে গেঁথে গাছের সঙ্গে প্রায় ক্রুশ-বিদ্ধ করে রেখে গেছে। পরিস্থিতি বিশেষ খারাপ হবার আগেই হেড কোয়ার্টারে খবর পাঠিয়ে ফোর্স আনা হয়েছে।

বললাম, ব্যাপারটা ঘোরাল না করে সহজ সমাধানের একটা পথ বের করলে হত না?

হাডসন মনে হল উত্তেজিত হয়েছেন।

বললেন, রাস্তাঘাট বানাতে সরকারের কি পরিমাণ টাকা খরচ হচ্ছে তা তুমি জান, জনসন। যদি তার থেকে ঠিকমত রিটার্ণ না পাওয়া যায় তাহলে সরকার সে লোকসান কতদিন বইতে পারবে। বৃটিশ সরকারের অনুগত কর্মচারী

হিসেবে আমাদের এ কথাগুলো ভেবে দেখা দরকার নয় কি ?

হাডসনের কথার কোন জবাব না দিয়ে নীরব হয়ে রইলাম। ওঁর মুখ থেকেই শুনতে পেলাম, বরাইবুরুতেও এমনি ক্যাম্প পড়েছে।

বললাম, ওরা আমাদের এ ধরণের প্রস্তুতিকে কি চোখে দেখেছে, তার খবর কিছু পেয়েছেন ?

হাডসন বললেন, টাকা পয়সা আর হাড়িয়া খাইয়ে কতকগুলো ইনফরমার জোগাড় করেছি। তাদের কাছ থেকে যে খবর পেলাম তাতে ও পক্ষের প্রস্তুতি বেশ জোরালই চলেছে বলে মনে হল।

একটু থেমে হাডসন বললেন, ওদিকে ছাতমবুরুর পাহাড়ে লোহার সন্ধান পাওয়া গেছে। সরকার খুব শীঘ্রই পাহাড় ভেঙে লোহা তোলার ব্যবস্থা করবে। সেজন্যে গুয়াতে একটা কলোনী গড়ে তোলারও পরিকল্পনা হয়েছে। তখন এ অঞ্চলটা অনেক বেশী সুরক্ষিত হয়ে যাবে।

বললাম, এই আদিবাসী হো সম্প্রদায় বনের এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে। তাছাড়া ওরা অশিক্ষিত। ওদের পক্ষে সংঘবদ্ধ হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান খুব সহজ হবে বলে মনে হয় কি ?

হাডসন বললেন, যতটা ভাবছ, পরিস্থিতি কিন্তু আমাদের পক্ষে সে পরিমাণে অনুকূল নয়।

একটু থেমে বললেন, ইনফরমারের কথা যদি মিথ্যে না হয় তাহলে শুনছি আদিবাসী এক রাজ পরিবারের মেয়ে নাকি সমস্ত হোদের সংঘবদ্ধ করছে।

কথাটা শুনে কেমন যেন চমক লাগল। এদের ভেতর কোন প্রতাপশালী রাজার অস্তিত্ব থাকতে পারে এ আমার কল্পনারও বাইরে। তার ওপর আদিবাসী রাজ পরিবারের মেয়ে হোদের সংঘবদ্ধ করছে! সমস্ত ব্যাপারটার ভেতর আমি বিরাট এক রহস্যের গন্ধ পেয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

ফেরার সময় হাডসনকে তাঁর স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, নতুন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।

কি রকম ?

হাডসন বললেন, আগে আমার কাছে ডরোথিকে দেখলে দু'জনের দিকে নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য করতেন। আজকাল ডরোথিকে আমার কাছে আসতে দেখলেই দৌড়ে ঘরে ঢুকে কপাট দিয়ে দেন। অনেক সাধ্যসাধনায় তবে দরজা খোলেন।

খুলেই কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। চোখেমুখে তখন তাঁর কেমন যেন ভয়ের ছায়া এসে পড়ে।

বললাম, পিটার আসেননি ইতিমধ্যে ?

এসেছিলেন, কিন্তু রেবেকা তাঁর সঙ্গে দেখাই করলেন না। ডরোথি যেই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেল, অমনি ওঘর থেকে চেঁচাতে লাগলেন রেবেকা।

হাসপাতালে ফিরতে গিয়ে সারাপথ নানা চিন্তায় ডুবে রইলাম। এই শান্ত

নিরুপদ্রব হোরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল কেন ? কেনই বা একজনের জন্মগত অধিকার থেকে অন্যজন তাকে বঞ্চিত করতে চায় । কি লাভ এই বিদ্বেষের আগুন জ্বেলে।

মনে এল সেই হো রাজকুমারীর কথা । এই অরণ্যের ভেতর এমন আগুনই বা ছিল কোথায় ! তার শিখায় একদিন হয়ত সমস্ত বনভূমি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ।

১২ই মে ঃ

দূর পাহাড়ে আগুন লেগেছে । হাসপাতালের সামনের দাওয়ায় বসে দেখছি । মনে হল আগুনের ফুল দিয়ে একটি মালা গাঁথা হচ্ছে । ক্রমে মালাটি বেড়ে চলল । তারপর এক সময় মনে হল পাহাড়ের গলায় সে মালা সম্পূর্ণ হয়ে দুলছে ।

কি প্রচণ্ড গরম এই দেশে । ঘরের বাইরে বের হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে । কোন কোন পাহাড়ে লোহার পরিমাণ খুব বেশী, গরমও তাই প্রচণ্ড। পাথরের ওপর পাথর গড়িয়ে পড়ল, অমনি আগুন জ্বলে উঠল । সে আগুনের ছোঁয়া লাগল গাছের শুকনো পাতার রাশে । দাউ দাউ জ্বলে উঠল আগুন। তারপর সামনে কিছু পড়ল, অগ্নিনাগ সব গ্রাস করে চলল ।

গরমের দিনে বনে বনে এমনি আগুন লাগে । ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজ বেড়ে যায় তখন । দামী গাছগুলোকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে তারা নানা কৌশল অবলম্বন করে । যেদিকে আগুন আসছে সেদিকের শুকনো পাতার রাশ বনবিভাগের লোকজন লাইন ধরে পরিষ্কার করে ফেলে । সাধারণতঃ নদী বা জলার দিকে ঐ সব শুকনো পাতা লাইন করে জড়ো করা হয় । আগুন ঐ লাইন ধরে যেতে যেতে এক সময় নদী বা জলাশয়ে এসে নিভে যায় ।

এবার যেমন গরম পড়েছে অত্যধিক, তেমনি আগুনও জ্বলছে চারদিকে। রাতে যেদিকে তাকাই সেদিকে আলোর মালা । বন পুড়ছে, আদিবাসীদের ঘর পুড়ছে, পশুপাখি পুড়ে মরছে । মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে বেরুলে বনে বনে বিরাট অংশ জুড়ে কালো কালো চিহ্ন দেখা যায় । আগুনের ধ্বংসলীলা এগুলি ।

সেদিন বসে আছি, দশ বারোটি আদিবাসী দোলায় করে বয়ে নিয়ে এল কয়েকটি ছেলেমেয়ে । আগুনে পুড়ে গেছে ।

তাড়াতাড়ি যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করলাম । সবাইকে বাঁচান গেল না। দুটি মারা গেল । তাদের মুখ চোখ কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না । এমন অবস্থায় বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা । কিন্তু ডাক্তারের ভাবনা তা নয়, যেমন করে বাঁচুক, চেষ্টা করে যেতে হবে তাকে বাঁচিয়ে রাখার ।

একটি দল ভাল হয়ে গেল দেখে দলে দলে আগুনে-পোড়া রোগী দূর দূর জঙ্গল থেকে আসতে লাগল । আমার ছোট হাসপাতালে আর জায়গা দিতে পারা গেল না । এখন ঘোড়ায় চড়ে ওষুধের বাক্সপত্র নিয়ে যেতে হচ্ছে বিভিন্ন

জঙ্গল এলাকায়। গ্রামের লোকদের সঙ্গে এমনিভাবে সেবার ভেতর দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে আমার পরিচিতি।

পথের দু'পাশে ওদের লম্বা ধরনের ঘর। মাটির বা পাথরের দেয়াল। খাপরার ছাউনি। ঘরের মুখগুলো কিন্তু পথের দিকে নয়।

হামা দিয়ে আমাকে অনেক সময় ঘরের ভেতর ঢুকতে হয়। এদের ঘরের মাঝে এক ধরণের উঁচু বেদী আছে। সেই বেদীকে ওরা বলে আদিং। আদিংকে ওরা বিশেষ পবিত্রভাবে রাখে। হোদের পূর্বপুরুষদের আত্মা নাকি থাকে তার ভেতর।

হাসপাতালে ফিরতে ফিরতে ভাবি, কত বিচিত্র সংস্কার মানুষের।

১৭ই জুন ঃ

কয়েকদিন আগে হাসপাতালে ফিরে দেখি হাডসন আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন, পাশে ডরোথি।

কি ব্যাপার? হাডসনকে জিজ্ঞেস করলাম।

ডরোথিকে দেখিয়ে হাডসন বললেন, বিভ্রাট বাধিয়েছে।

টন্‌শিলটা এত বড় হয়েছে, অপারেশন না করলেই নয়। বম্বেতে থাকার সময়ে অপারেশনের কথা উঠেছিল, কিন্তু নানা কারণে হয়ে ওঠেনি। এখন তোমার হেফাজতেই অপারেশনের কাজটা হয়ে যাক।

ভর্তি করে নিলাম ডরোথিকে। জরুরী কাজ ছিল হাডসনের, থাকতে পারলেন না।

যাবার সময় বলে গেলেন, কয়েকটা দিন ডরোথি থাকবে তোমার এখানে। আমি সময়মত একদিন এসে ওকে নিয়ে যাব।

বললাম, খুব আনন্দের কথা।

পরের দিন ডরোথির অপারেশন। সব প্রস্তুত। এনাস্থেসিয়া দেওয়া হল।

একি শুনতে পাচ্ছি! এনাস্থেসিয়ার প্রভাবে ডরোথির অবচেতন মনের কয়েক টুকরো কথা বেরিয়ে এল। কথাগুলি অসংলগ্ন, তবু তার মূল্য কম নয়।

'পিটারকে আমি ভালবাসি। তুমি বিবাহিতা।'…'কাছে এসো না আমাদের, এসো না বলছি'।—'চিঠি পাবেনা, কিছুতেই পাবেনা।'…'সরে যাও রেবেকা, নইলে হাডসনকে তোমার সব চিঠি দেখিয়ে দেব।'

অপারেশন শেষ করলাম। ডরোথি ঝিমিয়ে পড়ে রইল। জ্ঞান আসতে দেরী আছে। হাসপাতালের বারান্দায় বসে চিন্তা করতে লাগলাম।

ডরোথি পিটারকে ভালবাসে। রেবেকা হাডসনের বিবাহিতা স্ত্রী। প্রকাশ্যে একজন পাদ্রীর ওপর সে ভালবাসা দেখাতে পারছেনা। কিন্তু চিঠি এল কোত্থেকে!

হঠাৎ রহস্যের উদ্‌ঘাটন হয়ে গেল। রেবেকার কোন কিছু খোঁজার অর্থ পরিষ্কার হয়ে এল। নিশ্চয়ই ডরোথি পিটারকে লেখা রেবেকার প্রেমপত্র

কোনরকমে সংগ্রহ করে লুকিয়েছে। এটা রেবেকাকে ডরোথির ভয় দেখানোর কৌশল। রেবেকাকে ভয় দেখিয়ে পিটারের কাছ থেকে দূরে রাখাই তার উদ্দেশ্য। 'হাডসনকে তোমার সব চিঠি দেখিয়ে দেব।' ডরোথি এই একটুকরো কথায় সবকিছু স্পষ্ট করে ধরে দিয়েছে। রেবেকার উন্মাদনা তাহলে এই কারণে। প্রথম দিকে সে হাডসন আর ডরোথিকে চোখে রেখেছিল, তার কারণ ডরোথি হাডসনকে তার চিঠির কথা বলে কিনা দেখার জন্যে। পরে তার পাগলামো যখন বাড়ল তখন তার মনে হল, হাডসন নিশ্চয়ই তার গোপন প্রণয়পত্রের কথা জানতে পেরেছে। ইদানিং তাই সে ভয়ে ভয়ে থাকতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু রেবেকার চিঠিগুলো ডরোথি কোথায় লুকিয়েছে। নিশ্চয়ই ডরোথি কাছ ছাড়া করেনি সেগুলো।

অমনি উঠে গেলাম ভেতরে। ডরোথির হাত ব্যাগ থেকে চাবি বের করে ওর সুটকেশটা খুললাম। সুটকেশের ভেতরে ওর দৈনন্দিন ব্যবহারের পোশাক আশাক রয়েছে। নাড়াচাড়া করতে করতে তারই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একরাশ চিঠি।

এ চিঠি নিশ্চয়ই রেবেকার। কারণ রেবেকার হাতের লেখা আমার কাছে অপরিচিত নয়। মাঝে মাঝে বাংলো থেকে আমার নিমন্ত্রণ আসত। সেই নিমন্ত্রণের চিঠি রেবেকাই লিখে পাঠাতেন। তাঁর চিঠির ভাষাও ছিল বিশেষ উপভোগ্য।

চিঠিগুলো কাছে রেখে দিলাম। ডরোথি সুস্থ হয়ে উঠলেন একদিনেই।

হাডসনের কাছে চিঠি লিখলাম, তিনি যেন রেবেকাকে অবশ্যই পাঠিয়ে দেন হাসপাতালে। আমি তাঁর চিকিৎসা করব।

হাডসন চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই রেবেকাকে নিয়ে এলেন।

বললাম, দু'বোনকে আমি কয়েকদিন এক সঙ্গেই রাখতে চাই।

হাডসন বললেন, স্বচ্ছন্দে।

উনি চলে গেলে রেবেকাকে সঙ্গে নিয়ে আমি চললাম শালবনে বেড়াতে। আমার কাছে রেবেকা চুপচাপ থাকেন, এটা লক্ষ্য করেছি। আমি আগে চলেছি, রেবেকা আসছেন পেছনে। এবার একটু পিছিয়ে ও'র পাশাপাশি চলতে লাগলাম।

বললাম, আপনার ব্যবহার আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে।

রেবেকা আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

বললাম, আপনার কোনরকম উপকার করতে পারলে আমি খুব খুশী হই।

রেবেকার মুখে কেমন যেন ভাবান্তর হল।

বললেন, আপনি আমার উপকার করতে পারেন, সত্যি বলুন ?

নিশ্চয়ই পারি।

আমার মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে রেবেকা আবার নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন, না, আপনি পারেন না।

সামনের একটা পাথর দেখিয়ে বললাম, আসুন এর ওপর বসা যাক্।

রেবেকা আর আমি বসলাম পাথরটার ওপর।

পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে রেবেকার হাতে দিয়ে বললাম, দেখুন তো হাতের লেখাটা চিনতে পারেন কিনা।

মানুষের মুখের এমন পরিবর্তন আমি আগে কখনো লক্ষ্য করিনি।

মুহূর্তে রেবেকা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন, এ চিঠি আমার, এ চিঠি আমার।

পরক্ষণেই আমার দিকে তাকিয়ে কাগজের মত রক্তশূন্য হয়ে গেলেন।

এ চিঠি আপনি কোথায় পেলেন ডাক্তার জনসন। ডরোথি আমার সব চিঠিই তো চার্চে গিয়ে পিটারের কাছ থেকে নিয়ে এসেছে।

বললাম, আমি যদি আপনাকে আপনার সবগুলো চিঠিই ফিরিয়ে দিই।

আমার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসলেন রেবেকা।

চিরদিন কৃতজ্ঞ হয়ে রইব মিঃ জনসন।

বললাম, প্রতিদানে আমি যদি কিছু চাই, দেবেন ?

নিশ্চয়ই দিতে চেষ্টা করব জনসন।

বললাম, কথা দিন, হাডসনকে ছেড়ে কোনদিন আর পিটারের কাছে যাবেন না।

কতক্ষণ আপন মনে কি ভাবলেন রেবেকা। দু'চোখ বেয়ে জল নামল। অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। আমি আর বাধা দিলাম না। কাঁদতে কাঁদতে মনটা হাল্কা হয়ে গেলে মানসিক যন্ত্রণার গুরুভারটা নেমে যাবে।

এক সময় শান্ত হলেন রেবেকা।

বললেন, আমি জানতে চাইনা কি করে ডরোথির কাছ থেকে আপনি আমার চিঠিগুলো উদ্ধার করলেন। তবে আমি আর পিটারের কাছে যাব না কথা দিচ্ছি।

ওঁর হাতে চিঠির গোছা তুলে দিতে যেতেই উনি কি যেন ভাবলেন।

আপনি ওগুলো রেখে দিন মিঃ জনসন। মানুষের মন, কখন কি হয় বলা যায় না। চিঠিগুলো আপনার কাছে থাকলে তবু মনে একটা ভয় থাকবে।

বললাম, আপনার ভয় থাকবে কিনা জানিনা, তবে আমি নির্ভয় হয়েছি, এ কথা বলতে পারি।

চিঠিগুলো পাথরের ওপর জড়ো করলাম। পকেট থেকে দেশলাই বের করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলাম।

দাউ দাউ করে রেবেকার জীবনের অনেক স্মৃতি জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল।

২২শে আগষ্ট :

কয়েক মাস বর্ষার ভেতর কাটল। এবার পথের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। সরকারী বন-বিভাগের পুলিশের যাতায়াতের জন্যে হাডসন বিশেষ

পরিশ্রম করে পথঘাট ভালভাবে মেরামত করে রেখেছিলেন। বর্ষায় কর আদায় কিংবা জঙ্গলের বাসিন্দাদের ওপর জোর জুলুমের কোন চেষ্টাই করা হল না।

এই বর্ষায় আমার জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে। কাজের ভেতর থেকেও যা আমি একেবারেই ভুলতে পারছি না।

কয়েকদিন একটানা বৃষ্টির ভেতর হাসপাতালে বন্দী থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। হঠাৎ সকাল থেকে মেঘ কেটে গেল।

বর্ষাধোয়া আকাশে সোনা রঙের রোদ্দুরটুকু বড় উপভোগ্য হয়ে উঠল। আমি ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথের ধারে গাছপালার মখমলের মত সবুজ পাতার ওপর থেকে রোদের সোনা গড়িয়ে পড়ছিল। আমি তাই দেখতে দেখতে চললাম। পাহাড়ী ঝোরার ধারে ঐ যে বসে আছে ধনেশ পাখি। বড় বড় বাঁকানো শান দেওয়া ঠোঁট। হরিয়াল উড়ে গেল। আকাশের গায়ে যেন মিশে গেল আকাশী রঙ। পথে পথে বন যুঁই। সবুজ পাতার ওপর একরাশ সাদা তারা-ফুল ফুটিয়ে রেখেছে। কি মিষ্টি গন্ধ।

ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছি আর প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য দেখছি। দেখতে দেখতে কতদূর চলে এসেছি, বুঝতে পারিনি।

সামনে আর এক রূপের জগত আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

একটি শালগাছের তলায়, যেখানে পাথরের গর্তের ভেতর বর্ষার জল জমে ছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে শিশুকে নিয়ে মা-হরিণী।

জল খেতে এসেছে বোধ হয়। ঘোড়ার পায়ের সাড়া পেয়ে অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বর্ষাধোয়া রোদ তাদের সুচিক্কণ দেহের ওপর থেকে যেন পিছলে পড়ে যাচ্ছে।

ওরা তাকিয়ে আছে, আমিও ওদের থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। মা-হরিণী বাচ্চাটাকে লেহন করতে লাগল। এত স্নেহ জননীর। নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। কত শৈশবে মাকে হারিয়েছি।

বর্ষাধোয়া প্রকৃতির মত মনটা কেমন ভিজে আর নরম হয়ে গেল।

বেলা বাড়ল। আমি এপথে ওপথে চলতে লাগলাম। যখন খেয়াল হল তখন দেখি আমি চেনা পথ হারিয়েছি। একটি পথ ধরে কিছু সময় ঘোড়া ছুটিয়ে যাই, আবার অন্য পথ ধরি। এমনি ভাবে চলতে চলতে একসময় অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। এদিকে আকাশ ঘিরে মেঘ জমতে শুরু করেছে।

সামনে একটি উঁচু টিলা দেখে ঘোড়া ছেড়ে তার ওপরে উঠলাম; যদি এর ওপর থেকে কোনরকম চেনা জায়গার সন্ধান পাওয়া যায়। টিলার ওপর উঠে সামনে যতদূর দেখা যায়, অসংখ্য পাহাড়ের রাজ্য।

নীলে সবুজে মেশা পর্বত-তরঙ্গ দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। কি অপরূপ সৌন্দর্য-ঈশ্বর এই দুটি চোখের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন।

বামে চোখ পড়তে দেখলাম, খুব কাছেই একটি উপত্যকা। সহসা যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। গাছপালার ফাঁকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা ভাঙা দুর্গের মত কি যেন আমার চোখে পড়ল।

এখানে আদিবাসী এলাকায় দুর্গ এল কোথা থেকে! ভাল করে দেখলাম, মন্দির রয়েছে একদিকে। একটি জলধারা বয়ে চলেছে দুর্গটি বেষ্টন করে।

কতক্ষণ এমনি একদৃষ্টে তাকিয়েছিলাম, হঠাৎ একটা নাগরার আওয়াজ শুনে টিলার ওপর থেকে নেমে এলাম। কোথা থেকে নাগরার শব্দটা আসছে তা বোঝা গেল না; কারণ, মুহূর্তে সে শব্দ ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ে পাহাড়ে। দূরে কাছে যত পাহাড় আছে, মনে হল তাদের প্রতিটির থেকেই এ শব্দ-তরঙ্গ উঠে আসছে।

টিলার থেকে নেমেই ঘোড়ায় চড়ে যে পথে এসেছিলাম, সেই পথে ফিরে চললাম। পাহাড়ী বাঁক ঘুরতেই যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার বিস্ময় চরমে উঠল।

ঘোড়ার ওপর চড়ে একটি মেয়ে আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

সাধারণ হো সম্প্রদায়ের মেয়েদের ভেতর যে ধরণের গড়ন দেখেছি, তার থেকে এ সম্পূর্ণ আলাদা। কেবল গায়ের রঙের কিছুটা মিল রয়েছে, তবু আদিবাসী হোদের চেয়ে অনেক বেশী উজ্জ্বল। দেহের গড়ন সুঠাম। মনে হল যেন পাথর কুঁদে দক্ষ কোন শিল্পী এ মূর্তিটি গড়েছেন।

আমি তার উপস্থিতি ভুলে, সেই বিশেষ ধরণের পরিবেশের কথা ভুলে, তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মেয়েটি প্রথমে কথা বলল, এ অঞ্চলে আসার কারণটা জানতে পারি কি?

পথ হারিয়ে হঠাৎ এসে পড়েছি।

আস্তানা বরাইবুরু না কুমডির বাংলোতে?

বললাম, ও দুটোর কোনটাতেই নয়।

তবে? কথার ভেতর সামান্য একটু ঝাঁঝ ছিল।

বললাম, থলকোবাদের হাসপাতালে আপাততঃ আমার ডেরা।

মেয়েটি সহসা ঘোড়ার থেকে নেমে মাথা নত করে আমাকে অভিবাদন জানাল।

আপনিই ডাক্তার জনসন।

কথা শুনে আমি হতবাক। এতদূরে এই রহস্যময়ী মেয়েটি আমার নাম জানলো কি করে!

আমাকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে মেয়েটি বলল, এর আগে আপনাকে আমি না দেখলেও, আপনার নাম আমার কাছে অপরিচিত নয়।

আকাশে মেঘের ডাক শুনে তাকিয়ে দেখি, বর্ষার প্রায় সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে।

মেয়েটি কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, দূরে এসে পড়েছেন ডাক্তার জনসন, তাছাড়া এই ছোট নাগরা এলাকাটাও ইংরাজদের পক্ষে খুব সুখকর নয়। আসুন, আপনার পথে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে আসি।

মেয়েটি আগে আগে চলল, আমি তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। ভাঙা চোরা, উঁচুনীচু কত অজানা অচেনা পথ ধরে মেয়েটি অবলীলায় এগিয়ে চলল,

আর আমি তাকে অন্ধের মত অনুসরণ করতে লাগলাম।

এক জায়গায় এসে দেখলাম, দুটি পাহাড়ের মাঝে গিরিসংকট। সেই ফাঁকে একটি খরস্রোতা জলধারা বয়ে চলে গেছে উপত্যকার একেবারে ভেতরে। কাছাকাছি এসেই মেয়েটি বলল, সাবধানে আমাকে লক্ষ্য রেখে আসুন।.

ওকে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে সেই দুর্গম স্থানটি পার হলাম।

মনে হল, এই অঞ্চল মেয়েটির একেবারে নখদর্পণে।

এরপর আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার পথ প্রদর্শিকা বলল, এখন যতদূর সম্ভব দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে আমাকে অনুসরণ করুন। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। বৃষ্টি হলেই কোয়েল নদীতে বান আসবে। তখন পার হওয়া দুঃসাধ্য হবে। পথ সংক্ষেপ করার জন্যে ওপরের পথ ছেড়ে নীচের পথেই আমাদের চলতে হচ্ছে।

বেশ কিছু সময় চলার পর আমরা কোয়েলের কূলে এসে পেঁছলাম। পার হতে গিয়ে ঘোড়ার বুক অবধি জলে ডুবল। আমরা ঘোড়ার ওপর প্রায় দাঁড়িয়েই পার হলাম, তাই পোশাক কোমরকমে রক্ষা পেল।

কোয়েল পেরিয়ে আসতেই চারদিকে আঁধার ঘনিয়ে এল। আরও কিছু পথ একসঙ্গে আসার পর মেয়েটি বলল, আশাকরি এখন আপনি আপনার চেনা পথ পেয়ে গেছেন।

এতক্ষণ ওকেই অনুসরণ করে এসেছি, তাই পথ চেনার দরকার হয়নি, এখন চোখ মেলে ভাল করে চারদিকে তাকালাম।

সামনেই কুমডির পথ চলে গেছে। দু'জনে পথের ওপর উঠে এলাম।

মেয়েটি ঘোড়ার থেকে নেমে দাঁড়াল, আমিও নামলাম।

আপনি আমাদের জঙ্গলের লোকদের ভালবাসেন, সেজন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।

বললাম, ডাক্তারের কাছে যেমন রোগের বিচার নেই, চিকিৎসাই একমাত্র ধর্ম, ঠিক তেমনি মানুষেরও বিচার নেই। সেবা করার জন্যেই আমাদের ডাক্তারী শিক্ষা।

ঝিন্ ঝিম্ বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে ততক্ষণে। রহস্যময়ী মেয়েটি আমাকে শেষবারের মত অভিবাদন জানিয়ে বলল, আশাকরি আজকের এই সাক্ষাতের কথা লোকের মুখে মুখে রটবেনা।

বললাম, ডাক্তার জনসন আশাকরি অকৃতজ্ঞ নয়।

বৃষ্টি জোরে জোরে পড়তে লাগল। বাতাস বইল। মেয়েটি ঘোড়ায় চড়ে বলল, আপনি যান ডাক্তার জনসন। বান আসার আগেই আমাকে অন্ততঃ কোয়েল নদী পার হয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে।

দ্রুত ঘোড়া ছুটল। চোখের পলকে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি ফিরে চললাম কুমডির বাংলো লক্ষ্য করে। কিন্তু অল্প দূর যেতে না যেতেই প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। বাতাসের বেগও দ্রুত হল। একান্ত চেনা পথে আমার বিশেষ কোন অসুবিধেয় পড়তে হল না। কুমডির বাংলোতে বেলা শেষের আগেই পেঁছে গেলাম। কিন্তু আমার চিন্তার কেবল একটি কথা

আসা যাওয়া করতে লাগল, বান আসার আগেই রহস্যময়ী নদী পার হয়ে যেতে পেয়েছে কি।

১৯শে ডিসেম্বর ঃ

প্রথমে সাসাংদা গীর্জা আক্রান্ত হল। আগুন লাগিয়ে কাঠ আর খড়ের তৈরী গীর্জা, সংলগ্ন বাসগৃহগুলি পুড়িয়ে দিল বিদ্রোহীরা।

তার আগে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল ছাতমবুরুতে। হোদের ঈশ্বর সিংবোঙ্গা আর মারংবোঙ্গার আস্তানা ছিল ঐ পাহাড়ে। সেখানে সরকার লোহার সন্ধান পেয়েছিল, সুতরাং সরকারী নিয়ন্ত্রণের ভেতর আনা হল ছাতমবুরুকে। বসল সেখানে সশস্ত্র রক্ষীদল।

হোদের অসন্তোষ আগেই ধূমায়িত হয়েছিল। সরকারকে কর দেবার ব্যাপারে, বনে কাঠ কাটার ওপর নিষেধ জারির ব্যাপারে তারা অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তার ওপর ধর্মস্থান যখন বন্ধ হল তখন ধূমায়িত আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

এর ফলে সাসাংদার গীর্জায় প্রথম শুরু হল বিদ্রোহীদের হানা। পিটার আর তাঁর দলবলের ওপর কোন রকম আক্রমণ করা হল না। তাঁরা কুমডির-ডাক বাংলোতেই আশ্রয় নিলেন।

সরকারী পুলিশ ফোর্স গেল সাসাংদায়। হার মানলেই বিদ্রোহীরা সুযোগ পাবে বেড়ে ওঠার। তাই নতুন করে গীর্জা তৈরীর কাজ শুরু হল। কয়েক-দিনের ভেতর নতুন ছাউনি উঠল। আবার পিটার চললেন তাঁর দলবল নিয়ে। এবার গীর্জা সংলগ্ন জমিতে পুলিশ ব্যারাকও তৈরী হল। গীর্জা আক্রান্ত হলে সরকারী বাহিনী তা রক্ষা করবে। এদিকে আদিবাসীদের ভেতর যারা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা দলে দলে চলে এল সাসাংদার কাছাকাছি। সরকারের আশ্রয়ে না থাকলে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা। সরকারী পুলিশ সাসাংদার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও টহল দিতে শুরু করল।

কয়েকদিন চুপচাপ কেটে গেল। সরকারী বাহিনী পর্যবেক্ষণ করতে লাগল আক্রমণের প্রকৃতি। কিন্তু কোনদিক থেকেই কোনরকম সাড়া পাওয়া গেল না।

কেবল ইনফরমারদের মুখে শোনা যেতে লাগল নানান কাহিনী। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হো, লোহার, মুণ্ডারী, সাঁওতাল, সম্প্রদায়কে একত্রিত করা হচ্ছে। ঐ একটি মেয়েই এ কাজে অগ্রণী হয়েছে।

মনে মনে মেয়েটিকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারলাম না। আমি নিশ্চয়ই দেখেছি তাকে। আমার মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, সেই রহস্যময়ী তরুণীর দ্বারা সব কিছুই করা সম্ভব।

মেয়েটির নাম নাকি শনিচারি। নামটা বার বার উচ্চারণ করলাম। তার ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল আমার চোখের ওপর। কিন্তু আমি কারো কাছে তার কথা বলতে পারলাম না।

আবার খবর পেলাম সাসাংদার গীর্জা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সংলগ্ন গ্রামের

একটি কুটিরও অক্ষত নেই। এত কড়া পাহারার ভেতর কি করে এমন কাণ্ড ঘটল, তা ভেবে প্রথমে বিস্মিত হলাম। পরে শুনলাম, মাঝরাতে যখন সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ, শুধু দু'একজন পাহারাদার গীর্জা সংলগ্ন ব্যারাকে পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তখনি আক্রমণ শুরু হয়।

সকলে জেগে উঠে দেখে গীর্জা জ্বলছে, আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠেছে সমস্ত গ্রামখানা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা বিদ্রোহীদের ভেতর একটি মানুষেরও সন্ধান পাওয়া গেল না।

ভোরে উঠে রহস্যের সমাধান হল। তীরের মুখে আগুন জেবলে বহু দূর থেকে বিদ্রোহীরা গীর্জা আর গ্রাম লক্ষ্য করে ছুঁড়েছে। তার ফলে এই অগ্নিকাণ্ড।

সরকার এবার এক একটি গ্রাম লক্ষ্য করে ঘেরাও করল। কর আদায়ের জন্যে মারধোর শুরু হল। কিন্তু খবর পেলাম, একটিও মানুষের কাছ থেকে নাকি কর আদায় করা সম্ভব হয়নি। গ্রামের মাতব্বরদের ধরে নিয়ে আসা হল বরাইবুরুর ক্যাম্পে। সেখানে তাদের ওপর চলল অত্যাচার। কিন্তু কারো মুখ থেকে তাদের প্রধান ঘাঁটির খবর বের করা গেল না।

বরাইবুরুতে গড়ে উঠেছিল সাময়িক কয়েদখানা। দলে দলে আদিবাসীদের ধরে নিয়ে এসে সেখানে কয়েদ করে রাখা হত। কথা আদায়ের জন্যে চলত নানা ধরণের অত্যাচার।

একদিন বরাইবুরুর কোয়ার্টার থেকে আমার ডাক এল। গিয়ে দেখি, কয়েকটি আদিবাসী কয়েদখানার মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাদের নাকে মুখে রক্ত চাপ বেঁধে জমে আছে।

শুনলাম, তাদের কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্যে অতিরিক্ত প্রহারের ফল।

এদের সুস্থ করে তোলার ভার পড়ল আমার ওপর। কারণ এরা নাকি অনেক কিছুই জানে। বিদ্রোহী আদিবাসী দলের অন্যতম তিনজন প্রধান এরা।

সাধ্যমত চিকিৎসা করলাম। আর্তের চিকিৎসা করা আমার কর্তব্য বলে আমি করলাম। কিন্তু যে অবস্থার ভেতর ওরা পড়েছে তাতে মৃত্যুর আগে নিষ্কৃতি পাবে বলে মনে হল না।

শুনলাম, এরা একটু সুস্থ হলেই আবার শুরু হবে জেরা। দিনরাত্রি পুলিশের লোক এদের সঙ্গে কথা কইবে। বিশ্রামের কোন সুযোগই দেওয়া হবে না এদের। তারপর নখের ভেতর সুঁচ ঢুকিয়ে গোপন কথা আদায়ের চেষ্টা চলবে।

ফিরে এলাম হাসপাতালে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। মানুষের ওপর এ ধরণের নির্দয় অত্যাচারের ভেতরে যে পশু মনোবৃত্তি আছে, আমার আত্মাকে বার বার তা পীড়া দিতে লাগল। একবার ভাবলাম, চাকরী ছেড়ে চলে যাব এখান থেকে। আবার মনে হল, এখানে থাকলে তবু আহতের সেবার সুযোগ পাওয়া যাবে। সাধ্যমত তাদের সারিয়ে তোলার চেষ্টা করব। আমার জাতি,

আমার দেশ আজ ভিন্ন দেশের মানুষের ওপর যে অন্যায় আচরণ করছে, তার সামান্য কিছু যদি আমার সেবার ভেতর দিয়ে লাঘব করতে পারি।

সেদিন আর একটি অমানুষিক ঘটনা ঘটতে দেখলাম।

বরাইবুরু থেকে ডাক আসতে গিয়ে দেখি, একটি মেয়ে কয়েদখানায় পড়ে আছে। দেহ তার ক্ষত বিক্ষত। পরীক্ষা করে দেখলাম, অত্যাচারের শেষ সীমায় এসে পেঁছেছে। মানুষের পশুবৃত্তি কতদূর পর্যন্ত পেঁছতে পারে তার পরিচয় পেলাম সেদিন।

চেষ্টা করলাম, কিন্তু বাঁচান গেল না।

মেয়েটি নাকি কয়েকদিন আগে উপযাচক হয়ে এসেছিল ইনফরমারের কাজ করবে বলে। তারই নির্দেশমত এখানকার পুলিশ বাহিনী বিদ্রোহীদের একটা গুপ্ত ঘাঁটির সন্ধানে যায়। মেয়েটিকে কিন্তু আটকে রাখা হয় বরাইবুরুর ব্যারাকে।

পুলিশ বাহিনী মেয়েটির নির্দেশিত পথে এসে পেঁছল একটি পাহাড়ী নদীর কাছে। নদীতে জল ছিল হাঁটু পরিমাণ। সেখান থেকে গুপ্ত ঘাঁটির দূরত্বও ছিল অনেকখানি। তারা যখন সবাই মিলে নদী পার হচ্ছিল, তখন হঠাৎ পাশের জঙ্গল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে পড়তে লাগল তাদের ওপর। দু'চারটি ছাড়া বিরাট পুলিশ বাহিনীর প্রায় সব ক'টিই নিঃশেষ হয়ে গেল।

এরপর মেয়েটির ওপর শুরু হল অত্যাচার। প্রতিপক্ষের গুপ্তচরের ওপর যে ধরণের আচরণ এদের বিধানে আছে, তার সব ক'টিরই পরীক্ষা করতে লাগল এরা।

শুনলাম, পুলিশ বাহিনীর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার খবর শুনে মেয়েটি সেই যে হাসি শুরু করেছিল, অজ্ঞান হয়ে যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে হাসি আর থামেনি।

সে নাকি অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে বলেছিল, তার স্বামীকে মেরে ফেলার প্রতিশোধ সে নিয়েছে।

মৃতের কাছ থেকে উঠে আসার সময় শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে মনে মনে বললাম, এ দেশের মানুষের ওপর আমার শ্রদ্ধা তুমি বাড়িয়ে দিলে। আমার অন্তরের অভিনন্দন রইল তোমার উদ্দেশ্যে। সর্বময় প্রভু তোমার মঙ্গল করুন।

২৪শে ফেব্রুয়ারী : ১৯০০

একটি খবর শোনা গেল। উড়িষ্যা থেকে আদিবাসীরা দলে দলে আসছে সারান্দা বনের দিকে হাতে তাদের তীর ধনু আর টাঙি। সরকারী গুমটির টহলধারী দু'জন পুলিশ তাদের দেখতে পেয়েছিল, গতিরোধের চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু তারা সমর্থ হয়নি। এক রাত বন্দী থেকে তারা ফিরে এসেছে। তাদের মুখে শোনা গেল এক রহস্যজনক কাহিনী। একটি অশ্বারোহিণী মেয়ে, হাতে তলোয়ার নিয়ে পরিচালনা করছে সমস্ত দলটিকে। গভীর পাহাড়ী জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ করে দলে দলে তারা এগিয়ে আসছে। রাতে মশাল জ্বেলে

চলেছে তারা। দিনের বেলা ঘন বনের ভেতর আত্মগোপন করছে। তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে টহলদারী পুলিশেরা বন্দী হয়েছিল।

এক রাত তাদের নাকি কাটাতে হয়েছিল ঐ আদিবাসীদের সঙ্গে। বিশেষ অভিজ্ঞতা নিয়েই তারা ফিরে এসেছে ক্যাম্পে।

সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই দলের নেত্রীর নির্দেশে তারা সকলে মিলে প্রার্থনা করে। তারপর নেত্রী তাদের সামনে আদিবাসীদের অধিকার সম্বন্ধে, তাদের একতা সম্বন্ধে, কথা বলে যায়। সে কথা নাকি আদিবাসীরা গভীর আগ্রহ নিয়ে শোনে। প্রাণ দিয়েও নেত্রীর অনুগত থাকবে বলে তারা প্রতিজ্ঞা করে।

সবশেষে শুরু হয় নাচ আর গানের আসর। দীর্ঘ পথ চলতে গিয়ে তাদের মন যাতে ক্লান্ত হয়ে না পড়ে সেজন্য এই ব্যবস্থা। মণ্ডলের মাঝে ঘোড়ায় চড়ে দাঁড়িয়ে থাকে নেত্রী। তাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় নৃত্য আর গীত। সে এক বিশেষ উপভোগ্য দৃশ্য। টহলদার পুলিশের সামনেও এমনি নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়েছে। তারপর নেত্রী পুলিশদের বলেছে, তোমরা এ দেশের মানুষ হয়ে কেন এমন শত্রুতা করছ আমাদের সঙ্গে। জানি, নিমক খেয়েছ, কিন্তু নিজের দেশের মাটি আর মানুষকে রক্ষা করা কি তার চেয়েও বড় কর্তব্য নয়।

পরের দিন সকালে অবশ্য তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তারা ফিরে আসার সময়ে নেত্রী বলে দিয়েছে, সরকারকে প্রস্তুত থাকতে বলো। আমাদের দেশের এই সরল মানুষগুলি সহজে তাদের অধিকার ছেড়ে দেবে না।

বসে বসে ভাবছি, এ নিশ্চয়ই সেই অরণ্য-কন্যা, যার ক্ষণিক সঙ্গ আমি পেয়েছিলাম। সেদিন তার চোখে মুখে যে দীপ্তি, যে পরোপকার ব্রত দেখেছি, আজ মনে মনে তাই আর একবার স্মরণ করলাম। নেত্রী হবার উপযুক্তই বটে। কিন্তু কোথায় ছিল এ অরণ্য-অগ্নি। যে সব আদিবাসীদের সঙ্গে আমি মিশেছি, তাদের ভেতর এ স্ফুলিঙ্গ তো কোনদিন দেখিনি।

হয়ত এমনি হয়। যখন মানুষ অত্যাচারের মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন তারা মরিয়া হয়ে ওঠে।

তারা আঘাত হানবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। সেদিন তাদের পরিচালনা করবার জন্য তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় উপযুক্ত কোন চালক।

জোয়ান অব আর্কের কথা মনে পড়ল। আমাদের জাতির মানুষ যখন পর-রাজ্যের লোভে এগিয়েছে, তখনই নিপীড়িত মানুষের থেকে জেগে উঠেছে মহিয়সী মহিলা জোয়ান।

আজ আমার চোখের ওপর নতুন এক জোয়ানের আবির্ভাবের ছবি ফুটে উঠেছে। জোয়ানকে যে অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়েছিল, দেখছি সেই অগ্নি থেকেই যেন শাণিত তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে আসছে আর এক অগ্নি-কন্যা। আমি ভয় পেলাম না। আমার জাতির অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মনে মনে তাকে স্বাগত জানালাম।

১৭ই মে ঃ

এবার হাডসন বরাইবুরুর হেড কোয়ার্টারে একটা পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনাটি ছিল এইরূপ, গ্রীষ্মকালে বনে বনে যখন আগুন লাগবে, আর সে আগুন ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে, তখন তাকে নেভাবার কোন চেষ্টাই করা হবে না ; বরং নদীর বিপরীত মুখে দুর্গম আদিবাসী এলাকায় যাতে সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

হেড কোয়ার্টার মেনে নিল হাডসনের এই পরিকল্পনা। গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছরের মত এ বছরও আগুনের ভয়াবহ খেলা শুরু হয়ে গেল।

সরকারী চেষ্টায় যে আগুনের গতি নদীর পথে চালনা করা হত, তা আর হতে পারলনা। ফলে, আগুনের তাণ্ডব চলল সারা গ্রীষ্মকাল ধরে।

আমার হাসপাতালে কিছু কিছু আগুনে পোড়া রোগী আসতে লাগল। আমি তাদের সেবায় রাত দিন নিযুক্ত রইলাম। কিন্তু বেশীদিন তা করা চলল না। সরকার থেকে আমার কাছে কড়া নির্দেশ এল, আমি যেন আদিবাসী রোগীদের সরকারী হাসপাতালে ভর্তি না করি।

এর উত্তরে আমি জানালাম, আমি ডাক্তার, রোগী এলে তাদের ফেরান আমার সাধারণ সেবাধর্মের নীতির বাইরে। সুতরাং আমাকে এই হাসপাতালের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হোক।

আমার সাফ জবাবে কর্তৃপক্ষ কিছুটা নরম হলেন। তাঁরা আর আমাকে বরখাস্ত বা বদলী করতে চাইলেন না।

কিন্তু আর একটি উপায় তাঁরা অবলম্বন করলেন।

বিভিন্ন পাহাড়ী অঞ্চলে নাগরা পিটিয়ে ঘোষণা করতে লাগলেন যে, এরপর যদি কোন আগুনে পোড়া রোগীকে হাসপাতালের পথে বয়ে আনতে দেখা যায় তাহলে তাদের সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হবে।

এই ঘোষণায় আমি খুবই আহত হলাম। কিন্তু আমার দিক থেকে এর প্রতিবাদে কোন কিছু করার রইল না।

হাসপাতালে রোগীর আসা বন্ধ হয়ে গেল। সেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি মনে মনে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলাম।

শেষে স্থির করলাম, রাতের বেলাতেই গোপনে আমি পাহাড়ী গ্রামে গ্রামে যাবার চেষ্টা করব।

শেষ পর্যন্ত তাই শুরু করলাম। রাতের ঘোড়ায় চড়ে পথে যেতে খুব অসুবিধে হত। অন্ধকার রাতে পথ চিনে যেতে পারতাম না। চাঁদের আলোয় বের হতাম। এ অঞ্চল গুলো আমার চেনা জানা হয়ে গিয়েছিল, তাই বিশেষ কষ্ট হত না।

রোগীর সেবা করে যখন হাসপাতালে ফিরতাম, তখন মনটা তৃপ্তিতে ভরা থাকত। পথের হিংস্র পশুর ভয় আমার মনকে আচ্ছন্ন করতে পারত না।

এবার বিপদ এল অন্যদিক থেকে। ওষুধ ফুরিয়ে গেল। কর্তৃপক্ষের কাছে ওষুধ পাঠাবার জন্যে লিখতেই উত্তর এল, সরকারী আগুনে পোড়া কর্মচারীর সংখ্যা নিশ্চয়ই এমন অধিক নয় যে প্রভূত পরিমাণ ওষুধ ডাক্তার জনসনের দরকার হতে পারে।

আমি প্রায় নিরুপায় হয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে শুধু হাতে গিয়ে ওদের সমবেদনা জানিয়ে আসি। ওষুধ নেই, তাই আজকাল প্রায় দিন আমার আর গ্রামে যাওয়া হয় না।

এক সন্ধ্যায় হাসপাতালে বসে বসে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিলাম। আগুন জ্বলছিল সে পাহাড়ে। আমার মনে এসেও লাগছিল সে আগুনের আঁচ। এমন সময় একটি বলিষ্ঠ মানুষ আমার সামনে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল। দেখলাম, লোকটি আদিবাসী।

আমাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, ডাক্তার জনসন, যদি অনুগ্রহ করে আগুনে পোড়া রোগীর ওষুধগুলো লিখে দেন তাহলে আমি আপনাকে তা আনিয়ে দিতে পারি।

লোকটির কথায় বিস্মিত হলাম। কিন্তু এখানে কাছেপিঠে এমন কোন মেডিক্যাল স্টোর নেই যেখান থেকে ওষুধ নিয়ে আসা যায়।

বললাম, আমি লিখে দিচ্ছি, কিন্তু ওষুধ এ অঞ্চলে পাওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া আমার হাতের লেখা প্রেসক্রিপসন যেন কর্তৃপক্ষের হাতে কোন রকমে না পড়ে।

লোকটি আমার প্রেসক্রিপসন নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল।

কয়েকদিন পরেই দেখি সেই লোকটি আবার ফিরে এসেছে। বিরাট একটি ওষুধের প্যাকেট আমার হাসপাতালের বারান্দায় নামিয়ে রেখে সে বলল, ডাক্তার জনসন, আশাকরি এর পর আপনার চিকিৎসার কোন অসুবিধে হবে না।

লোকটি আর অপেক্ষা না করে ঘোড়ার পিঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি একটু অবাক হলাম। প্রথম যেদিন লোকটি আসে সেদিন ভেবেছিলাম দরকারটা ওরই বাড়ীর। হয়ত কোন সম্পন্ন আদিবাসী ও। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। আমি নিজের সম্প্রদায়ের ওপর দরদী এই লোকটিকে মনে মনে অশেষ সাধুবাদ দিলাম।

এরপর আদিবাসীদের সেবা করতে আমার আর কোন অসুবিধেই হল না।

১৫ই আগষ্ট ঃ

এবার বর্ষায় লড়াই চরমে পৌঁছল। হাডসন এ বছর আরও উৎকৃষ্টভাবে পথঘাট তৈরী করে রেখেছিলেন।

নতুন কয়েকটা পথও শুকনোর দিনে তৈরী করা হয়েছিল। তবে সে সব পথে আশানুরূপ কাজ এগোয়নি। কারণ আদিবাসীরা লড়াইয়ের জন্য সরকারী কাজ করতে নারাজ।

এবারও কর্তৃপক্ষ বর্ষাতে চুপচাপ থাকতে মনস্থ করেছিল, কিন্তু তার সুযোগ

পাওয়া গেলনা।

বর্ষা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই দলে দলে আদিবাসী তীর ধনু টাঙি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে স্রোতের মত ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন ঘাটি লক্ষ্য করে। সমানে লড়াই চলল। বাঁধান সরকারী পথ বিদ্রোহীরা জায়গায় জায়গায় কেটে দিলে। বর্ষার জল সেই পথে গড়িয়ে গিয়ে ভয়াবহ খাদের সৃষ্টি করল।

যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

খবর এল, হাজার হাজার আদিবাসী যোদ্ধা চলেছে ছাতমবুরুর দিকে। মারংবোঙ্গা আর সিংবোঙ্গাকে উদ্ধার করতে হবে শত্রুর হাত থেকে। তারা গভীর জঙ্গল, দর্গম গিরিখাদ, সব কিছু পার হয়ে চলেছে। মেয়েরা চলেছে আগে আগে। তাদের মাথায় কলস। পূজার উপচার হাতে। দেবস্থান উদ্ধার হলে তারা পূজা দেবে দেবতার উদ্দেশ্যে।

বরাইবুরুর ক্যাম্প থেকে সশস্ত্র পুলিশ পাঠান হল। তারা ঘোড়ায় চড়ে চলল ছাতমবুরুর দিকে। ওখানে যে সব রক্ষী রয়েছে, তাদের দলবৃদ্ধি করাই এদের উদ্দেশ্য।

আদিবাসীরা দুর্গম পথ দিয়ে চলেছে, আর এরা চলেছে বাঁধান পথের ওপর দিয়ে। কিন্তু পদে পদে বাধা। সরকারী পথ যেখানে সেখানে আদিবাসীরা ভেঙে দিয়েছে। সেই ভাঙা পথে কোথাও কোথাও বয়ে চলেছে বর্ষার খর জলস্রোত।

সরকারী পুলিশেরা ছাতমবুরুর কাছাকাছি এসেই বিপদের সম্মুখীন হল। শাল আর শিমুলের ঘন বনের আড়াল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তাদের ওপর শুরু হল তীর বৃষ্টি। ঘোড়া সমেত আরোহীরা এই অসতর্ক আক্রমণে ছিটকে পড়ল ডানদিকের গভীর খাদে। তাদের ভেতর অতি অল্পই পেঁছিল ছাতমবুরুর বেসক্যাম্পে।

তখন গভীর রাত। ছাতমবুরু পাহাড়ে ওঠার পথে সারি সারি সান্ত্রী বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খবর পাওয়া গেছে আজই অধিবাসীরা ছাতমবুরু আক্রমণ করবে।

বেস ক্যাম্পে কারো চোখে ঘুম নেই। বয় বেয়ারাগুলো পর্যন্ত তটস্থ হয়ে আছে। কীট পতঙ্গ রাতের অন্ধকার চিরে চিরে শব্দ করছে। মাঝে মাঝে হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে দু'একটা হিংস্র জন্তুর। কিন্তু সকল উদ্বেগ আজ কারো মনে কোন রেখাপাত করছে না। আসন্ন একটা বিপদের জন্য প্রতীক্ষা করছে সবাই।

পাহাড়ে ওঠার এই একমাত্র পথ। অন্য দিকগুলো ভয়ানক খাড়াই, আর গভীর জঙ্গলে পূর্ণ।

বেস ক্যাম্পে ক্যাপ্টেনের নির্দেশে আলো জ্বালা হয়নি। অন্ধকারে ওৎ পেতে সান্ত্রীরা অপেক্ষা করছে শত্রুর আগমনের। রাত তখন প্রায় দুটো।

হঠাৎ মনে হল চারদিক কাঁপিয়ে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। ছাতমবুরুর পাহাড় যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে নীচে খসে পড়ছে। অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে

না কেবল পালাও পালাও শব্দ। চারদিকে আতঙ্ক। গভীর অন্ধকারে পথ দেখা যায় না। পাথর এসে পড়ছে ক্যাম্পের ওপর। ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে সব। চীৎকার উঠছে। মানুষের আর্ত চীৎকার। কে কোথায় পাথরের তলায় চাপা পড়েছে, তার গোঙানি উঠেছে।

আহত ঘোড়াগুলো বীভৎস আর্তনাদ করছে।

যারা কোন রকমে বনের আড়ালে থেকে বেঁচে গেল, তারা সভয়ে দেখল একটা, দুটো করে শত শত মশাল জ্বলে উঠছে ছাতমবুরুর ওপর। নাগরার আওয়াজ ভেসে আসছে।

তারপর পঙ্গপালের মত দলে দলে বেস ক্যাম্পের পাশ দিয়ে উঠে যেতে লাগল আদিবাসীর দল। মারংবোঙ্গা আর সিংবোঙ্গার জয় ধ্বনি দিতে দিতে তারা উঠে চলল ওপরে।

আদিবাসীরা সেই রাতে অধিকার করে নিল ছাতমবুরুর পাহাড়। সিংবোঙ্গা আর মারংবোঙ্গার মন্দির মুক্ত হয়ে গেল।

কয়েকদিন পরে ইনফরমারের মুখে খবর পাওয়া গেল। দুর্গম খাড়াই পাহাড়ের যে দিকটাতে পাহারার কোন ব্যবস্থা ছিল না, সেই পথে কতকগুলো আদিবাসী আগের রাতে কাঁধে কাঁধে ভর দিয়ে ত্রিভুজের মত ওপরে উঠেছে। তারপর দড়ির সাহায্যে টেনে টেনে তুলেছে অন্যান্য সঙ্গীদের। তারা ওপরের পাহাড়ে শিলাখণ্ড আর নুড়িগুলোকে একত্র জড়ো করেছে।

সারাদিন এই কাজ করার পর, গভীর রাতে বেস ক্যাম্প লক্ষ্য করে ছেড়ে দিয়েছে সেই সব পাথরের বড় ছোট চাঁইগুলো। সারা পাহাড় কাঁপিয়ে সেগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছে নীচে। যখন বেস ক্যাম্পের লোকেরা আহত হয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে, তখন পাহাড়ের ওপর মশাল জেবলে আদিবাসীরা নাগরায় আওয়াজ তুলেছে। নীচে জঙ্গলের আড়ালে অপেক্ষমান হাজার হাজার আদিবাসী সেই শব্দে উল্লাস ধ্বনি করতে করতে উঠে গেছে ওপরে।

বর্ষায় ছাতমবুরু পুনরধিকার অসম্ভব। চেষ্টা করতে যাবার অর্থই হল অযথা অজস্র লোকক্ষয়। এদিকে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলছে। বরাইবুরুর দিকেও নাকি এগিয়ে আসছে আদিবাসী দাঙ্গাকারীরা। বরাইবুরু অবশ্য সুরক্ষিত। সেখানে জঙ্গলের অংশ কম। অনেকখানি সমতল জুড়ে কয়েকশ সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন রয়েছে সবসময়।

কুমডির বাংলো থেকে রেবেকা তার ডরোথিকে হাডসন বরাইবুরু পাঠাতে পারতেন, কিন্তু কি মনে করে থলকোবাদে আমার কাছেই পাঠিয়ে দিলেন।

আমার হাসপাতালে আমি একটি সান্ত্রীকেও থাকতে দিইনি। তবু হাডসন আমার আস্তানাকেই সবচেয়ে নিরাপদ ভাবলেন।

রেবেকা আর ডরোথি এল। দেখলাম ইতিমধ্যে দু'বোনের খুব ভাব হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে সারাদিন সমানে চলল ওদের রসিকতা।

ডরোথির সঙ্গে আমার নামের যোগ করে কথা বলতে ভালবাসে রেবেকা। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, সেই কৌতুকময়ী মেয়েটি আবার তার স্বাভাবিক

অবস্থা ফিরে পেয়েছে।

মাঝে মাঝে রেবেকা বিষণ্ন হয়ে যান। জিজ্ঞেস করলে আমাকে জানান হাডসন সম্বন্ধে তাঁর দুশ্চিন্তার কথা। যে রকম এক রোখা মানুষ, না জানি এইসব হাঙ্গামার দিনে কি ভাবে সময় কাটাচ্ছেন।

ডরোথির বিষণ্নতা কিন্তু অন্য দিকের। রাতের আঁধার নামলেই সে চারদিকের দরজা, জানালা বন্ধ করে বসে থাকে। তার কেবলই ভয়, এই বুঝি বুনো মানুষগুলো হাসপাতাল ঘেরাও করে তাকে ধরে ফেলল।

যত বুঝাই, আর সব জায়গায় গেলেও আদিবাসীরা এখানে আসবে না, ততই ডরোথি অবিশ্বাসের হাসি হাসে। বলে, বরাইবুরুতে যেতে পারলে সব চেয়ে খুশী হত সে।

এদিক থেকে আমি তাকে খুশী করতে পারলাম না ঠিক, কিন্তু আর এক দিক থেকে সে কেমন এক আনন্দ অনুভব করতে লাগল।

রেবেকা যখন আমার সঙ্গে ডরোথিকে জড়িয়ে কৌতুক করেন, তখন ডরোথি খুশী হয়।

সেদিন হাসপাতালে রোগী দেখে কোয়ার্টারে ফিরে ডরোথিকে দেখলাম না। রেবেকা উঠোনে বসে কি যেন একটা বুনছিলেন।

ক'দিন একটানা বৃষ্টি হবার পর সবে এক চিলতে রোদ দেখা দিয়েছে। চারদিক সেই করুণ আলোর প্রসন্ন ছোঁয়ায় উজ্জল হয়ে উঠেছে।

ভারী উপভোগ্য মনে হচ্ছিল এই দৃশ্যটুকু। আমি হাসপাতালের পাশের পাহাড় উঠে এলাম। এখানে একটি ঝর্ণার ধারে কয়েকটি শালগাছ ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। তার তলায় একটি মসৃণ পাথর। আমি সেখানে গিয়ে প্রায়ই বসতাম।

পাহাড়ে উঠে দেখি, ঝর্ণার ধারে ঐ পাথরটার ওপর ডরোথি বসে আপন মনে গান গাইছে। আমি তার পেছনে ছিলাম, তাই সে আমাকে দেখতে পায়নি।

সামনে শালগাছে দড়ি বাঁধা। তার থেকে ঝুলছে আমার সদ্য ধোয়া পোশাকগুলো।

আমি পাহাড়ের আড়ালে থেকে ঝর্ণার জলে একখণ্ড পাথর ছুঁড়ে মারলাম। ডরোথি চমকে শিলা স্তুপটার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকাতে লাগল। আবার একটা পাথর ছুঁড়লাম। শালগাছের কাণ্ডে লেগে সেটা পাহাড়ের ওপর গড়িয়ে চলল। এমন ভয়ের চেহারা আমি এর আগে কখনো দেখিনি।

ডরোথি ভয়ে কাঁপতে লাগল। আমি পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতেই ও প্রায় চীৎকার করতে যাচ্ছিল। তারপর আমাকে দেখে দৌড়ে এসে ভয়ে প্রায় জড়িয়ে ধরল।

যত বোঝাবার চেষ্টা করি, ততই সে ভয় পেয়ে আমাকে জড়ায়। যখন বললাম, আমিই পাথর ছুঁড়েছি, তখন ও আমাকে ছেড়ে দিয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, আমাকে কুমডিতে পাঠিয়ে দিন। আমি আর এক মিনিটও এখানে

থাকব না।

সেদিন তাকে শান্ত করতে অনেক সময় কেটে গেল আমার।

পরে মুখে কয়েকবার বললেও, থলকোবাদ ছেড়ে ও আর কোথাও যেতে চাইল না।

একদিন হাডসন এলেন হাসপাতালে। তাঁর মুখেই শুনলাম, এখন হাঙ্গামা একটু কমেছে।

হাডসন বললেন, যদি এর পর বৃষ্টি না হয়, তাহলে আমাদের সুবিধে হয়ে যাবে। হেড কোয়ার্টার থেকে ফৌজ আনিয়ে তখন বুনোগুলোকে শায়েস্তা করার আর কোন অসুবিধেই হবে না।

হাডসন, রেবেকা আর ডরোথিকে কুমডিতে নিয়ে গেলেন। ডরোথির এখানে আরও কিছুদিন থেকে যাবার ইচ্ছে ছিল, সেটা সে আমার কাছে আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশও করেছিল, কিন্তু রেবেকাই তাকে একরকম জোর করে নিয়ে গেলেন। কয়েকদিন খোস গল্পের মাঝে ভাটা পড়তেই আমি বুঝলাম, কোথায় যেন কি একটা আনন্দের সুতোয় টান পড়েছে। নিজেকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হল।

কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা দিল ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা। যে ভাবে বর্ষার শুরু হয়েছিল তা একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে গেল। বর্ষার দিনে আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র রইল না। হাডসন ভাঙা পথ আবার গড়ে তুললেন। সংবাদ পাঠিয়ে বহু সংখ্যায় সশস্ত্র পুলিশ আনিয়ে রাখা হল। এবার প্রবলভাবে সরকার পক্ষের পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। পক্ষকাল যুদ্ধ চলল সামনে। শেষে হটতে লাগল আদিবাসীর দল। ছাতমবুরুর পাহাড় ছেড়ে দিতে হল তাদের। এবার গভীর জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল তারা।

একটি বিষয় বরাবর আমি লক্ষ্য করছিলাম। লড়াইএ যাতে কম লোকক্ষয় হয়, সেদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল নেত্রীর। ছাতমবুরু রক্ষার জন্য বহুদিন যুদ্ধ চালাতে পারত আদিবাসীরা, কিন্তু তা তারা করল না। অকারণ লোকক্ষয়ের থেকে সরে দাঁড়াল তারা। লড়াইতে এই সূক্ষ্ম বিবেচনা বোধ যার, তাঁর ওপর গভীর শ্রদ্ধায় আমার সমস্ত অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল।

১৭ই ডিসেম্বর ঃ

বিধাতা সত্যিই এবার জঙ্গলের মানুষগুলির বিপক্ষে দাঁড়ালেন। বর্ষাকালে নামমাত্র বৃষ্টি দিয়েই আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে গেল। চারিদিকে অনাবৃষ্টি। ফসল ফলল না এককণা। এদিকে দীর্ঘকাল যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল আদিবাসীরা। কয়েক মাস পরে তাদের মাঝে নেমে এল ভয়াবহ অনাহার আর মৃত্যুর আতঙ্ক। সারান্দা বন জুড়ে শুরু হয়ে গেল দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর ধ্বংসলীলা।

সরকার এবার এক কৌশল অবলম্বন করল। ঘোষণা করা হল,

ছাতমবুরুতে সিংবোঙ্গা আর মারংবোঙ্গার মন্দির আদিবাসীদের জন্য মুক্ত করে দেওয়া হবে। তাছাড়া যে সকল আদিবাসী সরকারের কাছে নতি স্বীকার করবে, দুর্ভিক্ষের দিনে তাদের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করবে সরকার।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ঘোষণাও করা হল, যে রাজকুমারী শনিচারির সন্ধান সরকারকে দিতে পারবে তাকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে।

ঘোষণার পর কিছুকাল পর্যন্ত কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তারপর একে একে সরকারী ক্যাম্পে আদিবাসীরা আসতে শুরু করল। ধীরে ধীরে সারান্দা বনভূমির ক্ষুধার্ত মানুষগুলো জল-স্রোতের মত বরাইবুরুর ক্যাম্পে সাহায্যের জন্য ভেঙে পড়ল।

কর্তৃপক্ষ ক্ষুধার্ত লোকগুলোকে নিয়ে শুরু করল জিজ্ঞাসাবাদ। রোজ নানা ধরণের লোক সাহায্যের আশায় আসা যাওয়া করত। কর্তৃপক্ষ তাদের একজনের কাছ থেকে প্রধান ঘাঁটির খবরটা সংগ্রহ করল। সেই হল সরকার পক্ষের ইনফরমার।

ছোটনাগরার উপত্যকার সেই ভগ্নদুর্গ, যা একদিন আমি দেখে এসেছিলাম পথ হারিয়ে, সেই দুর্গই নাকি বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি।

সরকারী পুলিশবাহিনী আর কালবিলম্ব করল না। তারা সেই ভগ্নদুর্গ আক্রমণ করল।

লড়াই চলল তীরধনু আর বন্দুকে। বেশী সময় লাগল না।

গুপ্তঘাঁটি সরকারী দখলে এসে গেল। কিন্তু দলের নেত্রী সেই রহস্যময়ী রমণী, কখন দুর্গ ছেড়ে চলে গেছে তা কেউ বুঝতে পারল না।

মনে মনে আমি পরম স্বস্তি অনুভব করলাম। প্রভু যীশুর কাছে কেন জানিনা নতজানু হয়ে সেদিন শনিচারির মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানালাম।

১৩ই জানুয়ারী : ১৯০১

একটি বিশেষ ঘটনার কথা আজ শুনলাম হাডসনের মুখে। কথাটা শুনে এদেশের মেয়েদের ওপর গভীর শ্রদ্ধায় মনটা ভরে গেল।

হাডসন যখন কথা বলছিলেন, তখন কিন্তু তাঁর গলায় আফশোসের সুরই বাজছিল। মেয়েটি মারা গিয়ে নাকি সবকিছু ভেস্তে দিয়ে গেল। নইলে শনিচারির খবর তার কাছ থেকে যে কোন রকমেই হোক আদায় করা যেত।

ঘটনাটি এইরূপ :

একদিন একটি মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এল বরাইবুরুর ক্যাম্পে। যেখানে আদিবাসীদের সাহায্য দেওয়া হচ্ছিল, সেখানে সে গেল না। সে পুলিশ অফিসারদের কাছে এসে কেঁদে কেটে অস্থির করে তুলল।

জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেল, সে তার হারান স্বামীকে খুঁজছে। মেয়েটি কথা বলে আর কাঁদে।

কতদিন নাকি তার স্বামী তাকে ছেড়ে এসেছে। সে খেতে পরতে না পাক তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু একা ঘরে সে কাটাবে কেমন করে। সেই যে কতদিন

আগে ক্যাম্পে যাচ্ছি বলে এলো, আর ফিরে গেল না। রাত দিন সে চোখের জলে ভাসছে।

শনিচারি মেয়েটা মাঝে মাঝে তার কাছে আসে। সে বলে, তার স্বামী নাকি সরকারের কাছে ছোট নাগরা দুর্গের খবর দিয়েছে।

শনিচারি তাকে মেরে ফেলবে বলে শাসায়।

মেয়েটার কাছে এতগুলো খবর পেয়ে বরাইবুরুর ক্যাম্প ইনচার্জ চঞ্চল হয়ে উঠল। এবার তাহলে শনিচারিকে ধরা যাবে।

ক্যাম্প ইনচার্জ মেয়েটিকে এবার শনিচারি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করে দিল।

কিন্তু মেয়েটি আর কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কেবল কাঁদতে লাগল। সে আগে তার স্বামীকে দেখবে তারপর অন্য কথা। কতদিন সে তার স্বামীকে দেখেনি।

মেয়েটির স্বামী যথার্থই ইনফরমারের কাজ করেছিল। লোকটি যে ক্যাম্পে ছিল, মেয়েটিকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হল।

সে কি কান্না তার। কত অভিমান। স্বামী লোকটা বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে থামাতে পারে না।

কি করেই বা সে গাঁয়ে ফিরে যাবে। শনিচারি একবার তার সন্ধান পেলে আর আস্ত রাখবে না। সে সরকারকে ছোটনাগরার খবর দিয়েছে। এর পরে তার আর গাঁয়ে ফিরে যাওয়া চলে না।

মেয়েটি সব শুনল। ধীরে ধীরে তাদের মান অভিমানের পালা চুকলো। সে সারাদিন রইল তার স্বামীর কাছে। ক্যাম্প ইনচার্জ তাদের একসঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। একটু শান্ত হলে মেয়েটার কাছ থেকে অনেক সন্ধানই পাওয়া যাবে। এখন আদিবাসীরা শান্ত হয়েছে, কিন্তু ওদের ওপর ভরসা করা চলে না। দুর্ভিক্ষ কেটে গেলেই তারা শনিচারির নেতৃত্বে আবার রুখে দাঁড়াতে পারে। অতএব সবার আগে চাই শনিচারির সন্ধান।

ইনচার্জ মনে মনে পুলকিত হল।

একরাত স্বামী-স্ত্রী কাটাল ক্যাম্পে। শেষ রাতে একটা প্রাণ-ফাটান আর্তনাদ শোনা গেল। সবাই দৌড়ল সেদিকে। ইনফরমারের রক্তাক্ত দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে কালকের মেয়েটা অট্টহাসি হাসছে। হাতে তার একখানা রক্তাক্ত ছোরা।

তাকে ধরতে যেতেই সে হাতের ছোরাখানা নিজের বুকে আমূল গেঁথে দিল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে বলে গেল, দেশের শত্তুর, বেইমানের সাজা সে দিয়েছে। আর কিছুই চায়না সে। আজ তার সবচেয়ে বড় আনন্দের দিন।

হাডসনের মুখে কথাটা শুনে সত্যিই আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। নিজের স্বামীকে খুন করল মেয়েটি দেশের জন্যে!

আমি মনে মনে শ্রদ্ধা জানালাম সেই রহস্যময়ী অরণ্য-কন্যাকে, যে এই অশিক্ষিতা মেয়েটির মনেও দেশকে ভালবাসার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

২৩শে মার্চ ঃ

দূরে কোন আদিবাসী গ্রাম থেকে মাদলের দ্রিম্ দ্রিম্ আওয়াজ ভেসে আসছিল। আকাশে চাঁদের আলো কত উজ্জ্বল, কেমন স্নিগ্ধ। সামনে শালের বনের প্রতিটি পাতা যেন গোণা যায় সেই আলোয়। মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল একটা উপভোগ্য বাতাস। পথের ধারের কত রকমের ফুলের গন্ধ সেই বাতাসের পাখায় জড়ান।

কোন কাজ ছিল না হাতে, বসে বসে দেখছিলাম বসন্ত রাত্রির রূপ।

হঠাৎ চমকে উঠে দাঁড়ালাম। মনে হল, শালের বনের প্রান্তে দুর্গম উপত্যকা থেকে অতি কষ্টে কে যেন উঠে আসবার চেষ্টা করছে।

দ্রুত এগিয়ে গেলাম। ততক্ষণে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। কাছাকাছি হতেই চাঁদের আলোয় যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার সামনে একটি শালের গাছকে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াবাব চেষ্টা করছে সেই রহস্যময়ী রাজকুমারী শনিচারি।

আমি কোন কিছু বলার আগেই শনিচারির মুখে ম্লান একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল।

ডাক্তার জনসন, আবার আমাদের দেখা হয়ে গেল।

অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, কিন্তু তোমাকে ধরার জন্যে যে সবাই ওৎ পেতে রয়েছে।

আবার সেই মৃদু হাসি ফুটে উঠল শনিচারির মুখে। বলল, ধরা যদি দিতে হয় ডাক্তার, তাহলে তোমার কাছেই দেব।

হঠাৎ চোখ পড়ল ওর পোশাকের দিকে।

একি, তোমার পোশাক যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে!

ওকে ধরে ফেললাম।

শনিচারি বলল, ও কিছু নয় ডাক্তার, তোমাদের লোকেরা আমাকে বসন্তের রাঙা ফুল উপহার দিয়েছে।

বললাম, শিগ্‌গির এসো আমার সঙ্গে। গুলি লেগেছে নিশ্চয়ই।

ও বলল, তোমাকে আমি বিব্রত করতে চাইনা ডাক্তার। চলে যাচ্ছি বহুদূর, তার আগে আমার দেশের মানুষের হয়ে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যেতে চাই।

ও কাঁপছিল। রক্তের পরিমাণ দেখে ওর আঘাতের গুরুত্ব যে কতখানি তা আমার বুঝতে বাকী রইলনা।

ওকে প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে এলাম হাসপাতালে। শুইয়ে দিলাম অপারেশন টেবিলে। পায়ের ভেতর দিয়ে গুলিটা চলে গেছে। ক্ষতটা গভীর, সারতে সময় নেবে।

পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন শনিচারি বলল, তাহলে সত্যিই আমায় ধরলে ডাক্তার?

বললাম, যতদিন সুস্থ না হচ্ছ ততদিন এ হাসপাতালে আমার নজরবন্দী হয়ে

থাকতে হবে। পরে তোমার কাজ ফুরোলে যেখানে খুশি যেও।

পাছে কেউ দেখে ফেলে তাই আমার ডিসপেনসিং রুমে ওর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলাম। অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল, অল্প সময়ের ভেতর গভীর ঘুমে ডুবে গেল।

বাইরে এসে বারান্দায় বসলাম। সমস্ত ঘটনাটি আমার কাছে রহস্যময় বলে মনে হতে লাগল। যাকে আমি শ্রদ্ধা করি, যার মঙ্গলের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছি, সে শেষ পর্যন্ত আমার কাছে এসে ধরা দেবে, এ যে একেবারেই অভাবনীয় ছিল। এমনি অভাবিত বস্তু কখনো কখনো আমাদের হাতের কাছে এসে যায়। তখন মনে হয় সমস্ত ঘটনাটি যেন অলীক একটা স্বপ্নের ভেতর দিয়ে ঘটে যাচ্ছে।

সারারাত ঘুমল ও, আমি পাশে বসে কাটিয়ে দিলাম। ছুরিতে ডিসেক্সন করে যা দেখা যায় না কোনদিন, ওর সেই শক্তি আর শ্রীকে মনে মনে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম।

ভোরের কাছাকাছি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে একটু তন্দ্রার ঘোর এসে গিয়েছিল, বাইরে কাদের গলার আওয়াজে উঠে বসলাম।

দেখি, আমার আগেই শনিচারি উঠে বসেছে। ওকে ইসারায় কথা বলতে বারণ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

অনেক আগেই ভোর হয়ে গেছে। চারদিক রোদ্দুরে ঝলমল করছে। হাসপাতালের সামনের পথে দেখি দুটি অশ্বারোহী পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।

মুখোমুখি হতেই ওরা আমাকে অভিবাদন জানাল।

একজন বলল, ডাক্তার জনসন, কাল রাতে কি আপনি কোন স্ত্রীলোককে এ পথে যেতে দেখেছেন ?

আমি বিস্ময়ের ভাণ করলাম, এ পথ দিয়ে চলে যেতে, কই না তো।

ওরা আবার অভিবাদন জানিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি সুবাদার সাহেব ? আসুন, চা পান করা যাক।

ওরা ঘোড়া থেকে নেমে এসে বসল হাসপাতালের বারান্দায়।

বামিয়াকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বললাম।

বামিয়া আদিবাসী একটি ছেলে। গত বছর আগুনে পুড়ে গিয়ে হাসপাতালে আসে। ভাল হয়ে ও আর গাঁয়ে ফেরে না, আমার কাছেই থেকে যায়। হাসপাতালের ফরমায়েস খাটে বামিয়া।

হেসে বললাম, হঠাৎ ভোরবেলা স্ত্রীলোকের খোঁজ কেন সুবাদার সাহেব ?

আর বলেন কেন ডাক্তার সাব, ঐ মেয়েটার জন্যে আমাদের দিনে রাতে ঘুম নেই।

কোন মেয়ে আবার ?

ঐ যে ডাকু মেয়েটা, যে আদিবাসী জানোয়ারগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল।

বললাম, তার জন্যে আপনাদের ঘুমের কামাই হবে কেন ?

ওকে ধরতে না পারলে সোয়াস্তি নেই। বাইরে থাকলেই আবার জ্বালাবে। কোন দিক থেকে যে কি করে বসবে বলা যায় না।

বললাম, সামান্য একটা মেয়ে, তার এত দাপট। এতগুলি ঝানু জাঁদরেল পুলিশকে ভাবিয়ে তুলল।

আত্মসম্মানে মনে হল ঘা লেগেছে সুবাদার সাহেবের।

বলল, সামান্য মেয়ে হলে কি আর ধরতে সময় লাগে ডাক্তার সাব। এ মেয়েকে আপনি দেখেননি, তাই এমন কথা বলছেন।

আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়ই।

তা আর দেখিনি। ছাতমবুরুতে লড়াই হল, সে কি মূর্তি তার। ঘোড়ায় চড়ে চোখের পলক পড়তে না পড়তে পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে চলে যাচ্ছে।

বললাম, তাহলে বেশ দক্ষ বলতে হয়।

দক্ষ বইকি। শেষে লড়াইএ হঠে গিয়ে যে পথ দিয়ে ওদের লোকজন নিয়ে নেবে গেল, আমরা তা কোনদিন ভাবতেও পারতাম না।

কোন রকমে পাকড়াও করতে পারলেন না ওকে?

চেষ্টার কসুর করিনি, কিন্তু দেখতে না দেখতে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

চা নিয়ে এল বামিয়া। ওদের চা আর কেক খাওয়ালাম। খুব খুশী।

বলল, একটা কথা বলি ডাক্তার সাব, যদি কিছু মনে না করেন।

মনে মনে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এরা আবার কি কথা বলতে চায়।

মুখে বললাম, আপনারা কোনো সংকোচ না রেখেই কথা বলুন। আমি কিছুমাত্র মনে করব না।

ওদের একজন বলল, পুলিশ ব্যারাকের অফিসাররা মনে করেন, আদিবাসীদের ওপর আপনার নাকি একটু দরদ আছে।

বললাম, নিজের কাজের ওপর আকর্ষণ থাকাই তো স্বাভাবিক। আমি ডাক্তার, আমার কাছে রোগীর কোন জাত ধর্ম নেই।

ওরা দুজনেই আমার কথায় মাথা নেড়ে সায় দিয়ে গেল।

খাওয়ার শেষে উঠল ওরা।

বললাম, সেই মেয়েটিকে কাল রাতে দেখার কথা কি যেন বলছিলেন?

হাঁ, আমরা ওর খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, সামনের ভ্যালিটার ঐ প্রান্তে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে সে।

সবিস্ময়ে বললাম, তাকে স্পষ্ট দেখলেন?

চাঁদের আলোয় যতটা দেখা যায়। আর দেখুন, এ দেশে ঐ একটি ছাড়া কোন স্ত্রীলোককে কেউ কখনো ঘোড়ায় চড়তে দেখেনি।

তারপর কি হল?

গুলি ছুড়লাম ওকে লক্ষ্য করে। মুহূর্তে বনের ভেতর মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তাহলে সে এতক্ষণে নিশ্চয়ই এ বন ছেড়ে বহুদূর জঙ্গলের ভেতর পালিয়েছে।

ওরা ঘোড়ায় চড়ে ওদের পাঁচ হাজার টাকার শিকারের লোভে বনের দিকে দ্রুত চলে গেল।

ফিরে এলাম ডিসপেনসিং রুমে। এসে দেখি বিছানায় উঠে বসে শনিচারি বামিয়ার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে।

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বামিয়া লাফ দিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। শনিচারি সে দৃশ্য দেখে হেসেই অস্থির।

কপট গাম্ভীর্য মুখে এনে বললাম, ও আমাকে ভয় করে।

হাসি আর থামতেই চায় না শনিচারির।

আমার চেয়েও বেশী ভয় ওর?

বললাম, কে তোমাকে বসতে হুকুম দিয়েছে, জান, এটা হাসপাতাল। এখানে একমাত্র আমার আদেশই পালন করা হবে।

মুহূর্তে ওর হাসি থেমে গেল। চোখমুখে অসহায় অপরাধীর ভাব ফুটে উঠল। পাটা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল ও।

হাসি চাপতে চাপতে বাইরে এলাম।

বামিয়াকে বললাম, খাবার দিয়ে এস ভেতরে। আর একটা কথা, ও যে এখানে আছে কেউ যেন না জানে।

বামিয়া মাথা নেড়ে চলে গেল। তের চৌদ্দ বছর বয়েস হবে ছেলেটার। যেমন সরল তেমনি বিশ্বাসী।

এ দেশের মানুষ মাত্রেই সহজ সরল। এই ক'বছরে কেন জানিনা বড় ভালবেসে ফেলেছি এ দেশটাকে।

বাইরে বসে শনিচারির কথাই ভাবতে লাগলাম।

কি তাজা প্রাণশক্তি এই মেয়েটির। তবু শিশুর মত ভীরু। একটু কপট ক্রোধ দেখাতেই ভয়ে কেমন জড়োসড়ো হয়ে গেল।

আশ্চর্য, যার ভয়ে সকলে ভীত, যার নিজের প্রাণের বিন্দুমাত্র ভয় নেই, সে একজন ডাক্তারের সামান্য কথায় ভয় পেয়ে গেল। মানুষের কি বিচিত্র রূপ।

বসে বসে ভাবছিলাম নানান কথা। বামিয়া এসে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি এক কাণ্ড। শনিচারির সামনে কেক আর দুধ রাখা হয়েছে। কিন্তু সেগুলো সে একেবারেই ছোঁয়নি, কেবল কেঁদে চলেছে!

বামিয়াকে বাইরে যেতে বললাম। ও চলে গেলে শনিচারির কাছে গিয়ে বসলাম।

আমাকে দেখে শনিচারি তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে লাগল।

বললাম, ব্রেকফাস্টের সময় গেছে কখন, কেক আর দুধটুকু খেয়ে নাও। গায়ে বল না এলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে কি করে।

ও বলল, কিছুতেই ওগুলো মুখে তুলতে পারব না ডাক্তার।

ভাবলাম, আমি খৃষ্টান, কোন কোন আদিবাসী খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে একটু গোঁড়া। তাই হয়ত শনিচারি আপত্তি তুলেছে।

বললাম, দুধটুকু আপাততঃ খেয়ে নাও, বামিয়া এনেছে। তোমার আলাদা রান্নার ব্যবস্থা করে দেব।

মুহূর্তে কি যেন ভেবে সামনে পড়ে থাকা প্লেট থেকে কেকটা তুলে নিয়ে ও

কামড় দিল।

খেতে খেতে বলল, আমাকে ভুল বুঝনা ডাক্তার। জাতের বালাই আমার নেই। আমার বাবা ছিলেন আদিবাসী আর মা রাজপুতানী। আমি খেতে চাইনি ভিন্ন কারণে।

বললাম, যদি আপত্তি না থাকে বলতে, তাহলে খেতে না চাওয়ার কারণটা জানতে পারি কি ?

খেতে খেতে খাওয়া থেমে গেল।

বললাম, কারণটা যদি দুঃখের হয় তাহলে আমি তা জানতে চাইব না শনিচারি।

ও চোখ মুছে বলল, খেতে গেলেই মনে পড়ে ওদের কথা। জঙ্গলের কত লোক না খেয়ে কাটাচ্ছে, তুমি ভাবতে পারবে না ডাক্তার।

শনিচারির ওপর শ্রদ্ধায় মাথাটা নত হয়ে এল।

সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, যতদিন চিকিৎসা চলবে ততদিন আমার দেওয়া খাবার খেতে হবে শনিচারি। তুমি এতে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারবে।

এবার শনিচারির মুখে কেমন যেন ম্লান এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল।

সেরে উঠে কি হবে ডাক্তার, তার চেয়ে শেষ হয়ে যাওয়াই ভাল।

এ কথা বলছ কেন ?

কোন দিক থেকে মানুষ যখন সফল হতে পারে না, তখনই কেবল তার মনে বাঁচা মরার প্রশ্ন জাগে।

তুমি ভাল হয়ে ওঠ, একদিন তোমার সব কিছু আবার ফিরে পাবে শনিচারি।

আমাকে স্বার্থপর ভেবোনা ডাক্তার। আমি আমার সেই ভাঙা দুর্গটুকু ফিরে পাবার জন্যে মোটেই চিন্তিত নই। সারা বনের মানুষগুলো আজ পঙ্গু হয়ে গেল। এ দুঃখ কিছুতেই সইতে পারছি না।

বললাম, সুস্থ হয়ে ওঠ, তখন নতুন কিছু চিন্তা করা যাবে।

একটা যন্ত্রণার ছায়া নেমে এল ওর মুখের ওপর।

ওকে কথান্তরে নিয়ে যাবার জন্য আজ সকালের গল্প জুড়ে দিলাম। সেই সুবোদারদের খোঁজাখুঁজির ব্যাপার।

কথায় কথায় ওর মুখের ভাবের পরিবর্তন হয়ে গেল।

হেসে বলল, পাঁচ হাজার টাকার ভাগ বুঝি আর কাউকে দিতে চাও না। নিজেই সবটা নেবে ?

বললাম, নিজেকে এত অল্প দামের ভাবছ কেন শনিচারি। তোমার আসল দাম আমার অজানা নয়, তাই এত কম দামে কারো কাছে তোমাকে তুলে দিতে মন চায় না।

ও হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। চুপচাপ চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল। কোন কথা বলল না।

আমি দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লাম আমার কাজে।

কয়েকদিন এমনি কেটে গেল। নিভৃতে গল্প করি শনিচারির সঙ্গে। এ ক'দিনেই বুঝতে পেরেছি কি বিপুল ঐশ্বর্য ওর ভেতর রয়েছে।

আমার ডিসপেনসিং রুমের জানালাটা খুলে দিলে সাগনের উপত্যকা আর তার ওপারের বড় পাহাড়টা স্পষ্ট চোখে এসে পড়ে।

গভীর রাতে যখন চারদিক ঘুমে ডুবে যায় তখন কোন কোন দিন আমরা দু'জনে বসে বসে গল্প করি।

টুকরো টুকরো কথার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে শনিচারির জীবনের কথা।

সেদিন এমনি সে গল্পে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। কথায় কথায় বলল, ছোটনাগরা দুর্গের কথা। আর তার মৃত পিতামাতার কাহিনী।

বলল, বাবা ছিলেন আদিবাসী হো সম্প্রদায়ের লোক। ছেলেবেলা খেতে না পেয়ে এই বনে মনোহরপুরের জায়গীরদার অভিরাম সিং-এর বাড়ীতে গিয়ে ওঠেন।

অভিরাম সিং-এর একটি খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল। সে ছিল বাবার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। বাবা সেখানে অভিরাম সিং-এর আস্তাবলে কাজ করতেন। কালে সেই মেয়েটির সঙ্গে বাবার ভালবাসা জন্মে। বিয়ে করবেন বলে উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

কথাটা ক্রমে অভিরামের কানে যায়। তিনি এমন ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন যে কোমর থেকে তলোয়ার খানা টেনে নিয়ে বাবাকে আঘাত করেন। ফলে বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তাঁর একটি হাত দু'খণ্ড হয়ে যায়।

অভিরামের রাগ পড়লে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হন। বাবাকে স্নেহ করতেন খুব। তাড়াতাড়ি লোক দিয়ে রাঁচিতে পাঠিয়ে দেন চিকিৎসার জন্য। তোমাদের দেশীয় এক ডাক্তার সেখানে বাবাকে সুস্থ করে তোলেন। তিনি নিজের দেশে ফিরছিলেন, বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান।

কয়েক বছর বিদেশে কাটিয়ে বাবা উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। পরে নিজের জঙ্গল আবাসেই তিনি ফিরে আসেন।

ফিরেই দেখা করতে যান অভিরাম সিং-এর সঙ্গে।

অভিরাম তখন মারা গেছেন। তাঁর একমাত্র কন্যা তারাবাঈ বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

কিন্তু সরকার তারাবাঈকে নানা কৌশলে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করল। তারা কৌশলে সমস্ত মহাল খাস করে নিল।

বাবার সঙ্গে গভীর জঙ্গলে চলে এলেন তারাবাঈ। সঙ্গে আনলেন, বহুদিনের সঞ্চিত সোনা। বিয়ে হল দুজনের। ছোট নাগরায় বাবা বসতি পত্তন করলেন। পাথর সাজিয়ে সাধারণভাবে গড়ে তুললেন দুর্গ। গড়লেন 'গরাম' দেবতার মন্দির। ধীরে ধীরে জঙ্গল মহালের প্রায় সমস্ত হোদের তিনি সঙ্ঘবদ্ধ করলেন। তাদের দীক্ষা দিলেন জাতীয়তার মন্ত্রে।

বাবা বলতেন, নিজের ধর্মের ভেতর দিয়ে ভগবানকে পাবার চেষ্টা করবে।

ভগবানের রাজ্যে জাতির বিচার নেই। অন্যায় সহ্য করবে না।

জঙ্গলের লোকে বাবাকে তাদের রাজা বা দেবতা বলে মনে করত।

বাবা অত্যন্ত মুক্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি আমাকে নিজের তদারকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন।

কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল শনিচারি। একটা বিষাদের ছায়া এসে পড়ল তার চোখেমুখে।

কিছুক্ষণের ভেতর নিজেকে সংযত করে ও আবার কথা শুরু করল।

প্রকৃতি বাদ সাধল এক সময়। পাহাড় হঠাৎ থর থর করে কেঁপে উঠল। ছোট নাগরার দুর্গ ভেঙে পড়ল। তার একটি স্তূপের ভেতর আমার বাবা, মা চিরদিনের মত সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

ও প্রসঙ্গে ছেদ টেনে দিয়ে আমি বললাম, প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি সেদিন কিন্তু আদিবাসী বলে ভুল করিনি।

শনিচারি উত্তেজিত হয়ে উঠল হঠাৎ।

আমি আদিবাসীর মেয়ে ডাক্তার জনসন। আমার দেহে আদিবাসীরই রক্ত বইছে। আমার ধর্ম আর আমার এই জংলী দেশকেই আমি ভালবাসি।

বললাম, আমি সেজন্যে তোমাকে শ্রদ্ধা করি শনিচারি। আমাকে ভুল বুঝ না।

সহজ হল শনিচারি। আমার হাতটা টেনে নিয়ে বলল, তোমাকে দেখে ইংরাজের ওপর সব অশ্রদ্ধা দূর হয়ে যায় ডাক্তার। আমার বাবাও তোমার মত দয়ালু এক ইংরাজ ডাক্তারের কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ ছিলেন।

যত তাড়াতাড়ি পায়ের ক্ষতটা সেরে উঠবে মনে করেছিলাম, তা আর হল না। শনিচারিকে বেশ কিছুদিন ভুগতে হবে বলেই মনে হল।

মাঝে মাঝে ও অস্থির হয়ে উঠত। বনে বনে রাত্রি দিন ঘুরে বেড়ানই যার স্বভাব, কতকাল ছোট্ট একটি বেডের মধ্যে তাকে আবদ্ধ করে রাখা যায়।

এক একদিন শনিচারি হাঁপিয়ে উঠত।

বলত, কতদিনে সারব ডাক্তার ?

বুঝিয়ে বলতাম. আঘাতটা গুরুতর, তাই সারতে একটু সময় লাগছে।

অনুনয় করত, আমাকে একটু বাইরে নিয়ে যেতে পারবে ডাক্তার। কতদিন চারদিকটা ভাল করে দেখিনি। শালের ফুল ফুটেছে। 'বাহা' পরবের ঢেউ উঠেছে সারা বন জুড়ে। আমার মন কেমন করছে ডাক্তার।

গভীর রাত। চাঁদের আলোয় বন, পাহাড় ভেসে যাচ্ছে। ওকে সাবধানে ধরে নিয়ে এলাম হাসপাতালের বাইরে।

কতক্ষণ একটি পাথরের চাঁইএর ওপর বসে রইলাম দুজনে। ও কতদিন পরে চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। আপন মনে মগ্ন হয়ে গেল একসময়।

বহুদূর থেকে মাদলের ক্ষীণ একটা আওয়াজ ভেসে আসছিল। শনিচারি কান পেতে সেই শব্দটুকু শুনতে লাগল। তারপর নিজেই ধীরে ধীরে গাইতে লাগল 'বাহা' পরবের গান।

সেই জ্যোৎস্নার জলে ধোয়া বন পাহাড়ের রহস্যময় পরিবেশে সে সুর চারদিকে আশ্চর্য স্বপ্নের জাল বুনতে লাগল। আমি মুগ্ধ হয়ে সেই অরণ্যকন্যাকে দেখতে লাগলাম।

মাঝে মাঝে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আর ধর্ম নিয়ে আলোচনা হত। আমি ওকে প্রভু যীশুর ত্যাগের কথা শোনাতাম। কথায় কথায় আদিবাসীদের বিচিত্র সংস্কার আর দেবতার কথা এসে পড়ত।

শনিচারি বলত, আমি জানি ডাক্তার, আমাদের ধর্মবোধের ভেতর অনেক কুসংস্কার আছে। কিন্তু নিজের ধর্মের চেয়ে অন্য কোন ধর্মকে আমি বড় বলে ভাবতে শিখিনি।

বলতাম, তোমার মুক্ত মনের কাছে এটা একটা সংস্কার বলেই আমি মনে করি।

ও অমনি বলত, তোমার ধর্ম একেবারে কুসংস্কার থেকে মুক্ত নয় জনসন। তাই খৃষ্টানরাও কিছু পরিমাণে সংস্কারাচ্ছন্ন।

এ তোমার তর্কের কথা হল শনিচারি।

ও আবার নীরব হয়ে যেত। কতক্ষণ ভাবত। তারপর বলত,প্রতি জাতির ধর্ম গড়ে ওঠে বহুদিনের সাধনা আর সংস্কারে। এক একটি জাতির কাছে তার ধর্ম তার একান্ত প্রাণের জিনিস। আমার মনে হয় কি জান, নিজের নিজের ধর্মকে ধীরে ধীরে সংস্কার করে নিলে তার ভেতর দিয়েই ঈশ্বরের সহজ রূপটি দেখা যায়।

প্রভু যীশুর প্রতি সম্পূর্ণ অনুরক্ত থেকেও শনিচারির কথাকে অস্বীকার করতে পারতাম না।

নানা আলোচনার ভেতর দিয়ে এই অরণ্য কন্যাটি ধীরে ধীরে আমার সমস্ত মন অধিকার করে বসল। আমার দিন, আমার রাত্রি, আমার সমস্ত ভাবনা কল্পনা এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে লাগল।

শনিচারির মনের বিপুল ঐশ্বর্যের ভেতর আমি ধীরে ধীরে মগ্ন হয়ে গেলাম।

কয়েকদিন পরে এক দুপুরে হাসপাতালের বারান্দায় বসে আমাদের কথা হচ্ছিল।

বললাম, ডাক্তার হয়ে বলব, তোমার অসুখ তাড়াতাড়ি সেরে যাক্, কিন্তু আমার ভেতর আর একটা মানুষ বলছে, অসুখ সারলেই ও পালাবে। যে ক'টি দিন ও হাসপাতালে বন্দী হয়ে থাকে সে ক'টি দিনই লাভ।

মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল শনিচারির মুখে। বলল, খাঁচার ভেতর যে

পাখি কিছুকাল বন্দী হয়ে থাকে, খাঁচা মুক্ত করে দিলেই কি সে উড়ে যেতে পারে ডাক্তার ?

হেসে বললাম, বুনো পাখীরা বড় একটা পোষ মানে না। খাঁচার ভেতরে থকে তারা কেবল পালাবার জন্যে পাখা ঝাপটায় !

হেসে ফেলল শনিচারি। তারপর হঠাৎ মুখে ভাবনার ছায়া নামল ওর। অনেকক্ষণ বসে বসে আপন মনে চিন্তার জাল বুনে চলল। আমি যে এতক্ষণ তার পাশেই বসে আছি, সে খেয়ালই নেই তার।

একসময় দেখলাম, চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শনিচারির। কি একটা ভাবনার দীপ্তিতে সে যেন ঝলমল করছে।

আচ্ছা ডাক্তার, রবার্ট ব্রুস খুব বড় সাধক ছিলেন, তাই না ?

তিনি বীর ছিলেন।

না ডাক্তার, যত বড় বীর ছিলেন, তার চেয়ে সাধক ছিলেন অনেক বড়। হেরে গিয়েও তিনি হার মানেননি, চেষ্টা করে গেছেন বারবার।

বললাম, তুমিও চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই সফল হতে পারবে।

ও আমার দুটো হাত চেপে ধরল।

তুমি বলছ ডাক্তার, আমি পারব। ওদের আবার আমি জাগিয়ে তুলতে পারব।

বললাম, নিশ্চয় পারবে তুমি। সে বিশ্বাস আমার আছে। আমি দেখেছি তোমার দেশের সেই মেয়েটিকে যে দেশের জন্যে নিজের স্বামীকে হত্যা করেছে।

শনিচারি চমকে উঠল বলে মনে হল।

তুমি জান ডাক্তার, সে মেয়েটির কি হয়েছে ?

স্বামীকে খুন করে সে নিজের বুকেও ছোরা বসিয়েছে।

দুটি হাত জোড় করে শনিচারি প্রার্থনা করল। চোখ বেয়ে ঝরতে লাগল ফোঁটা ফোঁটা জলের ধারা।

একসময় শান্ত হয়ে বলল, তোমাদের সরকারের অত্যাচার তাকে ভোগ করতে হয়নি, আমি কত সুখী হয়েছি তার মৃত্যুতে, সে তুমি বুঝবেনা ডাক্তার।

একটু থেমে মনে মনে কি যেন ভাবল ও। তারপর বলল, সোনিয়া মারা গিয়ে আমার একখানা হাত ভেঙে দিয়ে গেছে ডাক্তার।

বললাম, মেয়েটির আচরণ দেখে ও যে তোমারই লোক তা বোঝা গিয়েছিল।

শনিচারি বলল, তোমাদের চার্চে সোনিয়া আর তার স্বামী দীক্ষা নিয়েছিল। আমি ঐ মেয়েটিকে কি যে ভালবাসতাম। আমার কাছ থেকে ও বিদেশী সাহিত্যের বই নিয়ে পড়াশোনা করত।

একটু অবাক হয়েই বললাম, সোনিয়া শিক্ষিতা মেয়ে !

তোমরা শিক্ষিতা কাকে বল জানিনা, তবে সোনিয়ারা শুধু পড়াশোনার শিক্ষা পায়নি, দেশের জন্যে নিজের স্বামীর প্রায়শ্চিত্ত সে নিজেই করেছে।

জান ডাক্তার, ওর স্বামী ছিল একেবারে অশিক্ষিত। কিন্তু কি সেবাই না

সোনিয়া তাকে করত। যেদিন শুনল, ওরই স্বামী সরকারের ইনফরমার হয়েছে, সেদিন ও আমার কাছে এসে বলল, ওর প্রায়শ্চিত্তের ভার আমার হাতে তুলে দাও শনিচারি!

বললাম, দেশ আমাদের সবার চেয়ে বড়, শুধু এই কথাটুকু মনে রেখ।

সে কথা সে মনে রেখেছিল। তাই ভাবি ডাক্তার, আবার আমি হয়ত দাঁড়াতে পারব।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, দুর্ভিক্ষ চিরদিন থাকেনা, মানুষের দুর্বলতাও চিরদিনের নয়।

আচ্ছা ডাক্তার, তোমার হাতে কি এমন ক্ষমতা নেই যাতে আমি খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারি।

কথাটা আঘাত করল আমার মনে। বললাম, তুমি কি মনে কর, ডাক্তার তার রোগ সারাবার ক্ষমতা গুলো হাতের ভেতর রেখে দিয়ে চিকিৎসা করে!

ওর মাথাটা নত হল।

আমাকে ক্ষমা কর ডাক্তার। নিজের মনের উত্তেজনায় তোমাকে আঘাত দিয়ে ফেলেছি।

বললাম, আমার কাছে দেশ নেই, জাতি নেই। আমি শুধু মানুষকে ভালবাসি। তাকে সারিয়ে তোলাই আমার একমাত্র ব্রত। এখানে শনিচারির সঙ্গে হাডসনের কোন ভেদ নেই।

তুমি মানুষকে ভালবাস, তাই আমি তোমাকে ভালবাসি ডাক্তার জনসন।

আমার হাসপাতাল দেখার সময় হয়ে গিয়েছিল, তাই হেসে বললাম, একজন রোগীর কাছে এত সময় দিলে বাকী রোগীদের ওপর অবিচার করা হবে।

উঠতে যাচ্ছিলাম, শনিচারি হঠাৎ হাত ধরে টেনে বসাল।

রোগ গুরুতর হলে রোগীর কাছে বেশী সময় দিতে হয় বইকি।

তোমাকে অতিরিক্ত সময় দিয়ে ফেলেছি।

শনিচারি অমনি বলল, তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে গেলে আমিও তোমার কাজে সাহায্য করতে পারব। তখন শোধ দেব তোমার এই সময়ের অপচয়ের।

বললাম, তাহলে তোমার দেশোদ্ধার?

চুপ করে গেল শনিচারি। আমি হেসে হাসপাতালে উঠে এলাম।

কয়েক দিন পরের কথা। হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলোতে রাউণ্ড দিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে দেখি বামিয়া আর শনিচারি গভীরভাবে কি যেন আলাপ করছে।

আমি এলাম, পাশের ঘরে চলে গেলাম, ওরা কথা বলায় এমনি মত্ত যে আমার আসার সাড়াই পেলনা।

ভাবলাম, বেচারা পায়ে আঘাতের ফলে বাইরে বেরুতে পারছে না, তাই মনের নির্জনতাটুকু ঘোচাতে চায় যে কোন একটি মানুষের সঙ্গে কথা বলে।

পাশের ঘরে এসে আমি পোশাক ছাড়লাম। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে

দিলাম। বসে থাকতে থাকতে কয়েকটা কথা কানে ভেসে এল।

সাসাংদা কোথায় জানিস বামিয়া ?

ওখানে তো আমার মামার বাড়ী।

দুপুরে একদিন যেতে পারবি ওখানে ?

কেন পারব না। তুমি বললে আমি সব পারি।

তারপর আরও কি সব কথা হল, আমি ঠিক শুনতে পেলাম না।

শনিচারি বামিয়াকে সাসাংদায় পাঠাতে চায় কেন। কি উদ্দেশ্য ও মনে মনে পোষণ করে রেখেছে!

আমার মনে এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন জাগল, কিন্তু আমি শনিচারিকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। ও যখন সহজ মন নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করে, তখন একটি অবোধ শিশুর মত ওকে মনে হয়। একটি কিশোরী যেন চপলতা প্রকাশ করছে কথায় কথায়। আবার কখনো বা সে ভীরু চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু যখন ও গভীর হয়, আপনার ভেতর ডুবে থাকে সবকিছু ভুলে, তখন ওর দিকে সসম্ভ্রমে আমি তাকিয়ে থাকি।

আমার চেয়ে বয়সে ও কত ছোট, তবু মনে হয় কি বিপুল ব্যক্তিত্ব নিয়ে ও বসে আছে। ওর সঙ্গে আমাদের ব্যবধানটা তখন বড় বেশী করে চোখে পড়ে।

বামিয়ার সঙ্গে ওর কথা আমার কৌতূহল জাগালেও, এ নিয়ে শনিচারির সঙ্গে আমি কোন রকম আলোচনা করতে পারলাম না।

এমনি কেটে গেল কয়েকটা দিন। এক দুপুরে কোয়ার্টারে ফিরে দেখি, বামিয়া উধাও।

এদিকে রান্নাঘরে এসে দেখি, ফল বা দুধের কোন ব্যবস্থাই সে করে যায়নি। কিছু পরেই রোগীদের ঘরে ঘরে ফল আর দুধ দিয়ে আসতে হবে।

আমি চিন্তিত হলাম। কি করা যায় ভাবছি, এমন সময় রান্নাঘরে এসে ঢুকল শনিচারি।

বললাম, তোমার না ডিসপেনসিং রুম থেকে বের হওয়া বারণ, তবে কেন এখানে এলে ? এমন করে চলাফেরা করলে সহজে পাটা সারবে ?

ও কোন কথা না বলে বসে গেল ফলের ঝুড়ি আর ছুরি নিয়ে। ফল কেটে কেটে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্লেটে সাজাতে লাগল।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল, আজ তুমি নিজেই এগুলো নিয়ে যাও ডাক্তার। তোমার রোগীরা খুব খুশী হবে।

বললাম, তা নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু বামিয়া কোথায় ?

শনিচারি বলল, একটু বাইরে গেছে, ফিরতে খানিক দেরী হতে পারে।

আর কোন প্রশ্ন না করে আমি নিজেই নিয়ে গেলাম ফলের প্লেটগুলো।

শেষে রান্নাঘরে এসে দেখি, শনিচারি আরও এক প্লেট ফল আর দুধ কার জন্যে যেন রেখেছে।

আমাকে দেখেই বলল, আর একটু পরে তোমার খাবার সময় হবে, তখন খেও।

আর কোন কথা না বলে ও ওর ঘরে উঠে চলে গেল। দেখলাম, বড় কষ্ট করে পাটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ও।

মনে হল, সারাটা বনে যে মেয়ে বিদ্যুতের মত খেলে বেড়াত, আজ সে সামান্য একটা হাসপাতালের ভেতর বন্দী হয়ে আছে।

এ সব কথা ভাবতে গিয়ে মনে মনে দুঃখ পেতাম। কিন্তু আমার সাধ্যমত চেষ্টাতেও শনিচারিকে সারিয়ে তুলতে পারলাম না।

ওর পায়ের ক্ষতটা দিনে দিনে আমার চিন্তার কারণ হয়ে উঠল।

শনিচারির ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলাম, বেডের ওপরে শুয়ে ও একখানা ডাক্তারী বই-এর পাতা উল্টেপাল্টে দেখছে।

ঘরে ঢুকে বললাম, তুমি ডাক্তার হলে আমাকে যে বেকার হতে হবে শনিচারি।

ও হেসে বলল, আমি পঙ্গু হয়ে পড়ে রইলাম তোমার হাসপাতালে। তুমি যখন সুস্থ রয়েছ তখন আমার কাজগুলো তুমিই কর। আর তুমি আমার কাজে গেলে তোমার কাজগুলো আমাকেই তো চালিয়ে নিতে হবে। তাই বই পত্তর দেখে রাখছি।

বললাম, তাহলে তোমার দেশের উদ্ধারও হল, আর আমার হাসপাতালও চলল।

শনিচারি বলল, দেখে নিও, একটু ভাল হলেই আমি তোমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কেমন ডাক্তারী করি।

বললাম, ডাক্তার হতে হলে নিজের শরীরটাকে আগে সুস্থ রাখতে হয়। আজ দুধ আর ফল খেয়েছ ?

শনিচারি বলল, একজন ডাক্তার সুস্থ থাকলে অনেক রোগীই সুস্থ হতে পারে। তাই দুধ আর ফল তোমারই আগে খাওয়া দরকার। তিনটে বাজল, এখন যাও তোমার খাবার সময় হয়ে গেছে।

আমি বেরিয়ে এলাম ওর ঘর থেকে। পেছন থেকে ও ডাক দিয়ে বলল, তুমি বরং বসো এখানে, আমি এনে দিচ্ছি।

বললাম, বেডের সঙ্গে এবার দেখছি তোমাকে বেঁধে রাখতে হবে।

একটা হাসির ঝলক ভেসে এল ওর ঘর থেকে।

তুমি আমাকে বাঁধবে ডাক্তার। তোমার এমন দড়ি নেই যা দিয়ে তুমি আমাকে বেঁধে রাখতে পার।

ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, তবে কি দিয়ে বাঁধব বলে দাও। বিনা দড়িতে বাঁধার কৌশলটা আমাকে শিখিয়ে দাও।

আমার দেশের মানুষকে তুমি ভালবাস, সেই ভালবাসায় আমিও বাঁধা পড়ে গেছি ডাক্তার।

ফিরে এলাম কিচেনে। ওর জন্যে ফল কাটলাম। তারপর দুটো প্লেটে নিয়ে গেলাম ওর ঘরে।

এসো খাওয়া যাক্।

কি যেন ভাবল ও।

তারপর বলল, জান ডাক্তার, এই দুর্ভিক্ষের সময় আমরা একটুখানি খাবার অনেকে একই সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছি। তাতে কারো ক্ষুধা মেটেনি, কিন্তু মন ভরেছে। একই সঙ্গে কষ্ট সহ্য করার শক্তি পেয়েছি।

বললাম, দুর্ভিক্ষই তোমাদের সমস্ত মনের বল নষ্ট করে দিয়েছে।

ও বলল, এ কথা মিথ্যে নয় ডাক্তার, তবে বনের মানুষগুলোর অনেকেই কিন্তু সাহায্য নিতে চায়নি। আমি অনেক বুঝিয়ে ওদের রাজী করিয়েছি।

তোমার বিবেচনার ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে শনিচারি। মিথ্যে মানুষগুলোকে মেরে ত কোন লাভ নেই।

শনিচারি কি যেন ভাবল। তারপর বলল, আমি অনেক ভেবে দেখেছি ডাক্তার, প্রকৃতির ওপর মানুষের কোন হাত নেই। প্রকৃতি মানুষকে এগিয়ে যাবার পথে যেমন সাহায্য করে, তেমনি তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে পেছনে ফেলেও দেয়।

বললাম, এত বড় বীর নেপোলিয়ানকেও একদিন প্রকৃতির আঘাতে পিছিয়ে আসতে হয়েছিল।

আমি তা জানি ডাক্তার। তারপর কতক্ষণ কি ভেবে ও বলল, বৃষ্টি যদি এ বছর সমানে চলত তাহলে হয়ত এতদিনে এ বনের ইতিহাস অন্যরকম হয়ে যেতে পারত।

সেজন্যে ভেবোনা শনিচারি, বৃষ্টি আবার শুরু হবে।

কিন্তু আমার মানুষগুলোর ভাঙা মন কি করে জোড়া লাগবে ডাক্তার?

তোমার ভালবাসার টানেই তারা আসবে।

কিন্তু আমি যে তাদের ভেতর ঘুরে বেড়াতে পারছি না ডাক্তার।

এর উত্তর আমার কাছে ছিল না। শনিচারি আমাকে প্রশ্ন করেই কেমন বিষণ্ন হয়ে বসে রইল।

ওকে একটু সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। তাই বললাম, তোমাকে সারিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা আমি করছি শনিচারি। নিশ্চয়ই তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।

শনিচারির মুখে করুণ এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল।

সুস্থ হই আর না হই, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তোমার কথা আমার মনে থাকবে ডাক্তার।

এত অল্পেই তুমি ভেঙে পড়ছ শনিচারি। তুমি না বনের মানুষগুলিকে জাগিয়ে তোলার ব্রত নিয়েছ?

আজকাল মাঝে মাঝে কেমন দুর্বল হয়ে পড়ি ডাক্তার। মনে হয়, আমার এতবড় কল্পনার সব কিছুই কি করে যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

ওর হাতে দুধের গ্লাসটা তুলে দিয়ে বললাম, শরীরটাকে সুস্থ রাখ, তাহলে মনের দুর্বলতাগুলো সহজে জয় করতে পারবে।

হাসপাতাল থেকে কোয়ার্টারে ফিরে আসতে সেদিন একটু রাত হয়ে গেল।

এসেই দেখি বামিয়া ইতিমধ্যে এসে গেছে। রাতের খাবার তৈরীর কাজে মন দিয়েছে সে। আর তার পাশের ঘরে জানালায় বসে তাকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে শনিচারি। আমার ডিসপেনসিং রুমের জানালা খুললেই কিচেন দেখা যায়।

রাতের খাওয়া শেষ করে বারান্দায় এসে বসলাম। চাঁদের আলোয় এই বনভূমি কেমন রহস্যময় মনে হল। কতদিন এই চন্দ্রালোক-ধোয়া পাহাড়ী পথ ধরে আমি ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছি। বনের হিংস্র পশুর ভয় আমাকে আড়ষ্ট করতে পারেনি। আমি চলে গেছি কত পাহাড়ী বাঁক পেরিয়ে, কত ঝর্ণার পাশ দিয়ে। রাতে বনের ফুল কি মিষ্টি গন্ধ ছড়ায়।

কে যে এসে তাদের গন্ধ আঘ্রান করে তা আমি জানি না। হয়তো কোন দিন দুধসাদা চাঁদের আলোয় মৌমাছিরা উড়ে আসে ঐ সব ফুলের বনে। অথবা কোন হরিণ ঝর্ণার ধারে শালের ফুলের গন্ধে এসে দাঁড়ায় তার সঙ্গিনীকে নিয়ে। রাতের জগত কি রহস্যময়, কি রোমাঞ্চকর। দিনের বেলা মানুষের চলাফেরার পথে, সহস্র কাজ কর্মের মাঝে প্রকৃতি নিজেকে তেমন করে প্রকাশ করে না। কিন্তু রাতে যখন দিনের কর্ম কোলাহল নীরব হয়ে আসে, তখন প্রকৃতি তার মুখের ওপর ঢেকে রাখা ওড়নাখানা সরিয়ে ফেলে। তখনই তার অপরূপ রূপের দেখা পাওয়া যায়। চাঁদের আলোয় সে স্নান করে। সবুজ অরণ্যের কোমল একটা লাবণ্য গড়িয়ে পড়ে তার সর্বাঙ্গ বেয়ে।

পাহাড়ী জ্যোৎস্নার ওড়না ঢাকা গ্রামগুলোর দিকে তাকিয়েছিলাম, আর ভাবছিলাম কত কথা।

শনিচারি পাশে এসে বসল। ডিসপেনসিং রুম থেকে আমার বাইরের ঘরের বারান্দা একটু দূরেই বলতে হবে। ওর পক্ষে ঠিক এতখানি পথ না আসাই উচিত ছিল। তবু ওকে কিছু বলতে পারলাম না। এই আশ্চর্য জ্যোৎস্নার প্রেমে কতক্ষণ দুজনেই মগ্ন হয়ে রইলাম।

শনিচারি প্রথমে কথা বলল, আমার দেশ তোমার ভাল লাগে ডাক্তার?

তোমার দেশের এই চাঁদের আলো আমার কাছে বিটোফেনের সংগীতের মত মনে হয়।

শনিচারি মিষ্টি একটা হাসি হাসল।

তুমি ডাক্তার না শিল্পী আমি মাঝে মাঝে তাই ভাবি।

হেসে বললাম, মাঝে মাঝে তাহলে আমার কথা ভাব শনিচারি।

ও বলল, তুমি আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছ।

বললাম, সেকি! ভাবতে কাউকে কখনো কেউ বাধ্য করতে পারে।

তুমি করনি ঠিক, কিন্তু আমি বাধ্য হয়েছি ভাবতে।

কথা ক'টি বলে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল শনিচারি। আমি ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। এখন যে কেউ ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেই বুঝতে পারবে, সব কিছু ভুলে কি গভীর হয়ে ও ওর চিন্তার ভেতর ডুব দিয়েছে।

একসময় ও যেন আবেগে ভেঙে পড়ল, আচ্ছা ডাক্তার, তুমি বলতে পার, কেন

তুমি আমার জন্যে এত করছ ? তুমি জান, আমি তোমার দেশের, তোমার জাতির শত্রু, তবু কেন আমাকে এমন করে আশ্রয় দিলে। আমি এর কোন প্রতিদানই তো তোমাকে দিতে পারব না ডাক্তার।

বললাম, বার বার তুমি একটি ভুল করছ শনিচারি। আমি তোমাকে আগেও বলেছি, আহতকে সেবা করা আমার ধর্ম। যে কোন ঘটনাতেই হোক, আমরা সেদিন যখন ঐ শালের বনে মুখোমুখি হলাম, তখন তুমি সুস্থ নও। তার পরের কর্তব্যটুকু আমি স্বাভাবিকভাবেই করেছি। সুতরাং এখানে দান প্রতিদানের কথাই আসে না।

এবার কি ভেবে হাসি ফুটল শনিচারির মুখে।

বলল, বেশ আছি ডাক্তার। বনে বনে অভুক্ত থেকে কোথায় যে ঘুরে বেড়াতাম তার ঠিকঠিকানা নেই। এখন নিশ্চিন্ত আরামে তোমার আশ্রয়ে যে ক'টা দিন কাটান যায়, সেই লাভ।

অন্য কথার অবতারণা করলাম, বামিয়াকে কোথায় পাঠিয়েছিলে শনিচারি ?

ও আমার ডান হাতটা ওর দুটো হাতের ভেতর নিয়ে অনুনয়ের সুরে বলল, আমাকে ও প্রশ্ন এখন করো না ডাক্তার।

কিছুক্ষণ থেমে কি ভেবে আবার বলল, তোমার দেওয়া অধিকারের অপব্যবহার করছি, তাই না ? কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা কর ডাক্তার। অধিকার যখন দিয়েছ, তাকে পুরোপুরি ভোগ করতে দাও।

বললাম, বামিয়া ছেলেটা যেমন বিশ্বাসী তেমনি কাজের তাই না ?

ও বলল, আমার দেশের সব ছেলেমেয়েরাই তাই।

তাই তোমার দেশকে এমন ভালবেসে ফেলেছি শনিচারি।

ও বলল, যখন তোমার দেশের মানুষ আমার দেশে এসে শোষণ আর অত্যাচার শুরু করল তখন তাদের ক্ষমা করতে পারি নি। আমি প্রতিদিন তাদের বিরুদ্ধে আমার মনের ঘৃণাকে সঞ্চয় করেছি। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার সে ধারণা বদলে গেছে ডাক্তার। কতকগুলো মানুষকে দেখে একটি জাতিকে বিচার করা যায় না।

বললাম, তোমাদের ওপর ইংরাজদের ব্যবহারে আমি লজ্জিত হই শনিচারি।

তুমি কেবল ইংরাজ বলে আমি তোমাকে ভালবাসতাম না ডাক্তার। তুমি একটি সুন্দর হৃদয়বান মানুষ বলে তোমার ওপর আমার এত আকর্ষণ।

বললাম, আচ্ছা শনিচারি, তুমি দেশকে ভালবাস, না মানুষকে ?

তোমার কথাটা ঠিক ধরতে পারলাম না ডাক্তার। একটু সহজ করে বুঝিয়ে বল।

মনে কর একটি দেশকে তুমি ভালবাস, আবার একটি মানুষও তোমার কাছে প্রিয়। সেখানে প্রয়োজন হলে তুমি কাকে ত্যাগ করতে পার ?

এ প্রশ্ন কেন ডাক্তার ?

এ আমার নিছক কৌতূহল শনিচারি।

ও স্থির হয়ে বসে রইল কতক্ষণ। তারপর বলল, দেশ চিরদিনই মানুষের চেয়ে বড়, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম আছে।

যেমন ?

যদি কোন মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্পর্ক থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে দেশ মানুষের চেয়ে বড়। কিন্তু যেখানে একটি মানুষ নিজের আশ্চর্য ক্ষমতায় দেশের গণ্ডীর বাইরেও মনটাকে তুলে ধরতে পারেন, সেখানে দেশের চেয়েও আমি মানুষকে শ্রদ্ধা করি।

বললাম, আমি কিন্তু তোমরে সঙ্গে একমত নই শনিচারি। একটি মানুষ যত বড়ই হোন, দেশের চেয়ে কি করে তাঁকে বড় বলব তা বুঝতে পারি না।

শনিচারির গলার স্বর গম্ভীর হল। দেখেছি, মনের কোন গভীর উপলব্ধির কথা বলতে গেলে সে খুব জোরের সঙ্গে তা বলার চেষ্টা করে।

দেশকে একান্ত করে ভালবাসার ভেতর একটু স্বার্থপরতা মিশে আছে। সেখানে মানুষের মন দেশে দেশে বিভেদের গণ্ডীকে মুছে ফেলতে পারে না। কিন্তু যে মানুষ দেশের মোহ কাটিয়ে সবার জন্যে নিজেকে দান করেন, তিনি দেশের চেয়েও বড়।

তুমি তাহলে তোমার দেশের জন্যে সংগ্রাম করছ কেন ?

আমি দেশের জন্যে সংগ্রাম করছি না বলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছি বললেই ঠিক হবে। সে অন্যায়টা যেহেতু আমাদের দেশের মাটিতেই ঘটছে, তাই তাকে দেশের হয়ে যুদ্ধ বলতে পার।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম শনিচারির দিকে। এই জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে আমার মনে হল পৃথিবীটা কত কাছে সরে এসেছে। সারাণ্ডার এই শৈলঘেরা বনভূমির সঙ্গে আমার দেশের কোথায় যেন হুবহু একটা মিল আছে। এই অরণ্য কন্যাটির মুখে আমি সারা পৃথিবীর ছায়া-মন্ডল দেখতে পেলাম।

১০ই জুন ঃ

বামিয়া আর শনিচারি প্রায় রোজই একটা খেলা খেলে। আমি সে খেলার একমাত্র দর্শক।

আমার কোয়ার্টারের পেছনেই একটা পাহাড়। সেই পাহাড়ের ওপরে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা শালের গাছ। ডিসপেনসিং রুমের জানালা দিয়ে শনিচারি তীরের খেলা খেলে। তার পাশে থেকে শিক্ষানবিশি করে বামিয়া।

বামিয়া শাল গাছের কোন একটি বিশেষ স্থান নির্দেশ করে। অমনি সুঁই করে ছুটে যায় একটা তীর। আমি অবাক হয়ে যাই শনিচারির লক্ষ্যভেদের কৌশল দেখে। নির্দিষ্ট স্থানের ঠিক মধ্যবিন্দুতে শনিচারির তীর বিদ্ধ হয়ে যায়। আমার মনে হয়েছে হাডসনের চেয়েও লক্ষ্যে একাগ্র শনিচারি। হাডসন সুটিং এ বহু পুরস্কার পেয়েছিলেন। এ বনে হাডসনের তুল্য দক্ষ শিকারীও কেউ নেই। কিন্তু আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে শনিচারি হাডসনের চেয়েও

আমার কোয়ার্টার থেকে ওরা লক্ষ্য ভেদ করে। হাসপাতাল থেকে কেউ দেখতে পায় না। আমি বারান্দায় বসে বসে ওদের খেলা দেখি। আজকাল শেষের কিছু আগে হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই চলে আসি ওদের খেলা তে।

এই ব্যাপারটা আমাকে কেমন যেন নেশার মত পেয়ে বসেছে।

ইতিমধ্যে তীরের খেলায় আমাকে প্রায় অবাক করে দিয়েছে বামিয়া। লক্ষ্যে অব্যর্থ সে।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। বারান্দায় বসে আছি। লক্ষ্যভেদের খেলা তখনও রু হয়নি। আমি তাকিয়েছিলাম পাহাড়ের ওপর শাল গাছ গুলোর দিকে। খি, পাহাড় বেয়ে বামিয়া উঠছে। ব্যাপারটা দেখবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে লাম।

যেখানে দুটো শাল গাছ গায়ে গায়ে জড়াজড়ি হয়ে উঠেছে, সেখানে গিয়ে ড়াল বামিয়া। কিছুক্ষণের ভেতর এক অদ্ভুত কান্ড। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটেছে র দিকে। উত্তেজনায় আমার দম বন্ধ হবার জোগাড়। কিন্তু বামিয়া দাঁড়িয়ে ছে স্ট্যাচুর মত। তার মাথা ঘেঁষে, কান, বুক, হাত ঘেঁষে তীর গুলো বিদ্ধ যাচ্ছে শালের গাছে।

এক সময় তীর ছোঁড়া শেষ হল। বামিয়া বেরিয়ে এল। মনে হল, শালের ছ তীর দিয়ে আঁকা হয়েছে একটি মানুষের অবয়ব।

উঠে গেলাম ডিসপেনসিং রুমে। জানালার গরাদ ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছে শনিচারি ; পায়ের কাছে পড়ে আছে ধনুকটা। আমার পায়ের সাড়া য় ও ফিরে তাকাল। মুখে মিষ্টি একটা হাসি লেগে আছে।

বামিয়ার জন্যে ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলে, তাই না ডাক্তার ?

বললাম, তোমার ওপর বিশ্বাস থাকলেও ভয় আমি পেয়েছিলাম।

ও অমনি বলল, আমার ওপর তোমার বিশ্বাসের চরম পরীক্ষা আজ ছিলাম।

হেরে গেলাম, তাই না ?

ওর মুখের কেমন যেন পরিবর্তন ঘটে গেল। মনে হল একটা বেদনা ধীরে ব ছায়া ফেলছে ওর মনের ওপর। ও নীরব হয়ে রইল কতক্ষণ।

একসময় বলল, তোমার ওপর বিশ্বাস হারালে আমার আর কি রইল ডাক্তার। টা পঙ্গুকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ। যখন তার মাথার লোভে তোমারই দলের ক ঘোরাঘুরি করছে, তখন সে পরম নিশ্চিন্তে স্থান পেয়েছে তোমারই কাছে। চেয়ে বিশ্বাসের পরীক্ষা আর কি হতে পারে। আর যা হই, আমাকে তুমি তজ্ঞ ভেবোনা ডাক্তার।

পরিস্থিতিটাকে সহজ করবার জন্যেই বললাম, বামিয়ার কিন্তু তোমার ওপর ধ বিশ্বাস। তুমি তীর ছুঁড়ছ, আর ও দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল হয়ে। অন্য হলে, সে একেবারে দাঁড়াতেই পারত না।

ও আমাকে ভালবাসে ডাক্তার।

বললাম, ভালবাসাই বিশ্বাসের জন্ম দেয়।

আমার কথা শুনে চুপ করে রইল শনিচারি। কতক্ষণ এমনি থেকে হঠা এক সময় বলল, তুমি তাহলে আমাকে ভালবাস ডাক্তার?

হেসে বললাম, এ ধারণা তোমার কি করে হল?

তুমিই তো বললে, ভালবাসার থেকেই বিশ্বাস জন্মায়। তুমি আমাকে ভা না বাসলে আমি তোমাকে এতখানি বিশ্বাস করতাম কি করে।

বললাম, তোমাকে আমি যেমন ভালবাসি, তেমনি শ্রদ্ধাও করি। তোমা ভেতব জোয়ান অব আর্কের মত আগুনের ছোঁয়া পেয়েছি বলেই শ্রদ্ধা ক শনিচারি।

আব ভালবাস কেন ডাক্তার?

তুমি আমার পেসেন্ট বলে। প্রতিটি রোগীকেই আমি ভালবাসি।

এবার অন্যমনস্ক হল শনিচারি। কিছুক্ষণ পরে বলল, তুমি জোয়ান অ আর্কের কথা বলছিলে না ডাক্তার। আমি তাঁর কথা ইতিহাসে পড়েছি। তি তো তোমার দেশের শত্রুই ছিলেন।

শত্রু ছিলেন কিনা জানিনা, তবে তিনি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের শ্রদ্ধা পাত্রী, এ কথা বলতে পারি।

শনিচারি আমাব ডান হাতখানা আবার তুলে নিল, তুমি জাতির চে মানুষকে শ্রদ্ধা কর, তাই তোমাকে আমিও শ্রদ্ধা করি ডাক্তার।

ইতিমধ্যে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। হাসপাতাল থেকে সন্ধ্যে বে রাউণ্ড দিয়ে কোয়ার্টারে ফেরবার পথে দেখি পাহাড়ের তলায় একটা সাদ কালোয় মেশা প্রকাণ্ড ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে দেখি, পাশের একট পাথরের সঙ্গে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

ঘোড়াটা দেখে বিস্মিত হলাম। হাডসনের ঘোড়া আমি চিনি। আমাদে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের সব ঘোড়াই আমার চেনা। তাহলে এই নতুন ঘোড় এল কোথা থেকে! কোয়ার্টারে গেলাম। সম্ভবতঃ নতুন কোন অতিথি এ থাকবেন। কিন্তু কোথাও কাউকে দেখলাম না। বামিয়াকে জিজ্ঞেস করে কোন হদিস পাওয়া গেল না।

ডিসপেনসিং রুমে গিয়ে শনিচারিকে এই রহস্যময় ঘোড়ার কথা জানালাম

আমার মুখে কথাটা শুনে মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল শনিচারি। তার চোখে মুখে প্রবল এক উত্তেজনার আভাস ফুটে উঠল। বললাম, কি হল তোমা শনিচারি। হঠাৎ এভাবে উঠে দাঁড়ালে কেন?

তুমি আমাকে একবার ওর কাছে যাবার অনুমতি দেবে ডাক্তার?

তুমি কেন যাবে, আমিই নিয়ে আসছি ওকে।

না, আমার যাওয়া দরকার। ও আমারই ঘোড়া। তাছাড়া আমা লোকেরা নিশ্চয়ই কাছে পিঠে কোথাও আছে।

একা তোমার পক্ষে ওখানে যাওয়া সম্ভব নয় শনিচারি। আমি তোমাকে ং যেতে সাহায্য করতে পারি।

তোমাকে আমার সঙ্গে দেখলে ওরা কিছুতেই কাছে আসতে চাইবেনা ক্তার।

তাহলে?

শনিচারি মুহূর্তকাল চিন্তা করল। তারপর বলল, বামিয়াকে আমার ঙ্গ দাও। ওর ওপর ভর রেখে আমি এটুকু পথ চলে যেতে পারব।

বামিয়াকে নিয়ে শনিচারি চলে গেল। আমি বারান্দায় এসে বসলাম।

এলোমেলো কত কথা আমার মনে আসতে লাগল।

সেই প্রথম দিনটির কথা, যেদিন শনিচারির সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা য়েছিল। সেদিনও বোধবরি এমনি একটি ঘোড়ায় চড়ে আমার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল।

তারপর কি ক্ষিপ্রতায় ও আমাকে বর্ষার ভেতর আমার পরিচিত পথের ওপর ৌঁছে দিয়ে গেল।

কতদিন কত কথা শুনেছি ওর সম্বন্ধে। কত নতুন বুদ্ধির খেলা ও দেখিয়েছে ড়াইয়ের সময়। ওর বিচক্ষণতাকে দূর থেকে আমি সম্ভ্রমের চোখে দেখেছি।

তারপর একদিন ও এসে ধরা দিল আমারই কাছে। কি বিশ্বাসের ছবি ও থম দিন দেখেছিল আমার চোখে, যে জন্যে নির্ভয়ে সে আমার কাছে চলে াসতে পারল।

আমি মানুষকে ভালবাসি, তাই ও আমাকে বিশ্বাস করেছে।

মানুষকে ভাল না বাসলে ডাক্তার হব কি করে। মানুষে মানুষে ভেদ, েশ দেশে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেন অসুস্থ রাজনীতিজ্ঞেরা, কিন্তু ডাক্তারের ও তো তা নয়। আমাদের কাছে প্রতিটি মানুষের মূল্যই এক। দেহের স্থি মজ্জার গঠনে রাজা প্রজা বলতে তো কোন ভেদ নেই।

শনিচারি আমার এই মনোভাবের প্রশংসা করে। কিন্তু ও ডাক্তার হলে ঝতে পারত এতে প্রশংসা করবার কিছু নেই। এ আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম।

আচ্ছা, আমি কি শনিচারিকে আশ্রয় দিয়ে অন্যায় করছিনা। আমি মার সরকারের অর্থ নিচ্ছি, তার সেবা করা, তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকাই কি মার উচিত নয়। শনিচারি আমাদের সরকারেরই তো বিরুদ্ধাচারণ করছে।

কিন্তু অন্যায় করেছে আমার সরকার। শনিচারি তার দেশকে ভালবাসে, টা তার অপরাধ হতে পারেনা। পরদেশের মানুষকে পীড়ন করা যদি অন্যায় হয়, তাহলে পরদেশের মানুষের কাছ থেকে আঘাত পাওয়াও স্বাভাবিক বলে নে নিতে হয়।

আমার দেশ, আমার জাতি মানুষকে পীড়ন করে যে অন্যায় করেছে, আমার বা দিয়ে যদি তার সামান্য পরিমাণও স্খালন করতে পারি।

আচ্ছা, শনিচারি যদি আর ফিরে না আসে। সে যদি তার দলের াকজনের সঙ্গেই চলে যায় গভীর অরণ্যে।

কথাটা ভাবতে গিয়ে মনটা কেমন দমে গেল। একটা দুর্জয় অভিমা
আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

ও কি যাবার আগে একবারও আসবে না আমার কাছে। শনিচারি কৃতজ্ঞ
জানাক তা আমি চাইনা। আমি কর্তব্য করেছি, কৃতজ্ঞতা আমার প্রাপ্য নয়
কিন্তু এতদিন একই সঙ্গে রইলাম, তাই যাবার আগে স্বাভাবিক সৌজন্য
দেখিয়ে যাবে না।

কি এলোমেলো ভাবছি আমি। শনিচারি রক্তাক্ত দেহ নিয়ে একদিন য
তার দেশের মানুষের হয়ে আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে আসতে পারে তাহ
আজ আমি তার আচরণকে সন্দেহ করব কেন।

কত রাত এমনি ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার সামনে শনিচারি এ
দাঁড়িয়েছে। তার পেছনে বামিয়া। হাতে খাবারের প্লেট।

আজ এইখানে বসেই তোমার ডিনার হোক্।

ওকে দেখে মন হঠাৎ খুশীতে ভরে উঠল।

বললাম, এসো আমরা একসঙ্গে বসে খাই।

শনিচারি ইঙ্গিত করল। বামিয়া আমার খাবার রেখে ওর খাবার
আনতে গেল।

তুমি এতক্ষণ আসনি দেখে মনে মনে বেশ চিন্তিত হচ্ছিলাম।

হাসির রেখা ফুটে উঠল ওর মুখে।

বলল, ভাবনা হচ্ছিল বুঝি, যদি আর ফিরে না আসি।

চলে গেলেও যে বলে যাবে, সে ধারণা আমার আছে।

বড় দেরী হয়ে গেল আমার, তাইনা ?

বললাম, রাত কত হল তা ঠিক বুঝতে পারিনি। টুকরো টুকরো ভাবনা
ভেতর সময়টা কেমন নিঃসাড়ে কেটে গেল।

কি ভাবছিলে ডাক্তার ?

যদি বলি, তোমার কথা।

শনিচারি হেসে বলল, খুব স্বাভাবিক। এত বড় একটি রোগী বাইরে
বেপরোয়া ঘুরে বেড়ালে ডাক্তারের ভাবনা হবে বইকি।

বামিয়া খাবার দিয়ে গেল। আমরা দুজনে গল্প করতে করতে খে
লাগলাম।

শনিচারি বলল, আজ বহুকাল পরে আমার দলের কোন কোন সর্দারে
সঙ্গে দেখা হল ডাক্তার।

বললাম, শুভ সংবাদ। কিন্তু কি করে তারা তোমার সন্ধান পেল ?

তুমি কিছু অনুমান করতে পার ?

এদিক ওদিক ভেবে বললাম, বামিয়া ওদের খবর দিয়েছে নিশ্চয়।

পারলে না ডাক্তার।

তবে ?

তোমার মত ওরাও আমার তীরের খেলা লক্ষ্য করেছে।

সে কি !

হাঁ, ডাক্তার। কয়েকদিন থেকে আশপাশ ঘুরে ওরা তীরের খেলা দেখছিল। যেদিন বামিয়াকে দাঁড় করিয়ে তীর ছুঁড়লাম, সেদিন ওরা আমার এখানে থাকা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

তারপর ?

ওরা ভেবেছিল আমি এখানে আহত অবস্থায় বন্দী হয়ে আছি। তাই আমার ঘোড়াটাকে সাহায্যের জন্য এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

তোমার ঘোড়া কোথায় ছিল ?

যেদিন গুলিতে আহত হলাম, সেদিন ঘোড়াটা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওরা তাকে বনের পথে ধরেছিল। কিন্তু আমি কোথায় আছি তা জানতে পারেনি।

এখন কি করবে তুমি ?

হেসে বলল, তোমার চিকিৎসায় থেকে সুস্থ হয়ে উঠব।

তাড়াতাড়ি সারতে না পারলে ?

কোন ক্ষতি নেই। ওরা আমার সন্ধান জেনে গেল। এখান থেকেই আমি ওদের পরামর্শ দিতে পারব।

বললাম, এটা সরকারী হস্‌পিটাল, পলিটিকাল মিটিং-এর জায়গা নয়।

তুমি যে জায়গায় হাসপাতাল করেছ, ওটা আমাদেরই দেশের মাটি ডাক্তার।

আচ্ছা, এটা যে তোমাদের জায়গা তা না হয় মানলাম, কিন্তু হাসপাতাল এলাকায় মিটিং করা কি উচিত ?

শনিচারি হেসে বলল, চিন্তা করোনা ডাক্তার। যেদিন মিটিং হবে সেদিন আমি তোমার হাসপাতাল থেকে দূরে চলে যাব।

যদি তোমাকে অনুমতি না দিই।

আমাকে তুমি বেঁধে রাখতে পারবে ডাক্তার ?

এ কি বলছ তুমি শনিচারি ! ডাক্তার যদি রোগীকে বাইরে যাবার অনুপযুক্ত মনে করে, তাহলে রোগী কি তার অবাধ্য হবে ?

আমার কথা শুনে শনিচারি হঠাৎ মুখ নীচু করল।

আমাকে ক্ষমা কর ডাক্তার। যদি অশোভন কিছু বলে থাকি, সে জন্যে মাপ চেয়ে নিচ্ছি।

বললাম, চিন্তিত হয়োনা। তেমন বুঝলে অবশ্যই তোমাকে বাইরে যেতে দেওয়া হবে।

১৭ই আগষ্ট ঃ

কি বিপুল কর্মের উদ্যম দেখলাম শনিচারির। দুটি মাসের ভেতর সিন্ধবাদের গল্পের সেই অতিকায় পাখির মত দুটি ডানা মেলে সারা বনভূমি আচ্ছন্ন করে ফেলল।

কি অসাধারণ প্রাণের জোয়ার। আমার কতটুকু সাধ্য ওকে বাধা দিয়ে

রাখতে পারি। প্রথম প্রথম এক আধটু বাধা দিয়েছি ; অমনি আমার দুটি হাত ধরে ও অনুনয় করেছে, আমাকে একবারটি যেতে দাও ডাক্তার। এই বর্ষার সুযোগ হারালে আর কখনো দাঁড়াতে পারবনা।

ওকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। যে ইচ্ছা করলে যেখানে খুশি চলে যেতে পারে, সে যখন অনুমতি ভিক্ষা করে, তখন তাকে বাধা দেবার মত মনের শক্তি থাকেনা।

মাঝে মাঝে আমি বিশেষ দুঃখিত হয়েছি। বলেছি, নিজের পাখানাকে দিনের পর দিন এমন করে জখম করছ কেন শনিচারি ?

ও উত্তর দিয়েছে, সারা জীবন পঙ্গু হয়ে, পরাধীন হয়ে বেঁচে থাকতে চাইনা বলেই তো এমন করে পাখানাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি ডাক্তার।

আমি আর কোন কথাই বলিনি। বোধহয় বলতে পারা সম্ভব ছিল না।

বর্ষার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করল শনিচারি। পাহাড়ী বন্যার মত আদিবাসীরা ভেঙে পড়ল বরাইবুরুর পুলিশ ক্যাম্পগুলোর ওপর।

গত লড়াইয়ের পর সরকারী আর্মড ফোর্সের বেশী অংশই বন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আদিবাসীরা ঐ সুযোগ পেয়ে গেল। তারা বরাইবুরু দখল করে নিল।

হাডসন ছাতমবুরু থেকে কিছু সংখ্যক ফোর্স আনালেন কুমুডির বাংলো রক্ষার জন্যে।

খণ্ড খণ্ড লড়াই চলল। বহুক্ষেত্রে আদিবাসীরাই জয়ী হল। এই বর্ষাই তাদের একমাত্র ভরসা। প্রকৃতির এই সহযোগিতার সদ্ব্যবহার করতে না পারলে আর কোন আশাই থাকবে না তাদের।

একদিন শনিচারি ফিরে এল হাসপাতালে। দেখলাম, ক্ষতস্থান দিয়ে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে। ক্ষোভের সঙ্গেই বললাম, হয় তুমি একেবারে বাইরে চলে যাও, নয়তো চিকিৎসার ভেতর থাক কয়েক দিন।

ও বলল, এই চরম মুহূর্তে তুমি কি বলছ ডাক্তার। আমার দেশের মানুষগুলো একমাত্র আমার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে।

উত্তেজনায় কাঁপছিল ও।

বললাম, এমন ভাবে রক্ত পড়তে থাকলে আর দুচার দিনও তারা তাদের নেত্রীকে তাদের মাঝে পাবে না।

শরীরের অবস্থাটা কি খুব খারাপ ঠেকছে ডাক্তার ?

তোমার মত আমি উত্তেজিত হইনি শনিচারি। আমি ডাক্তার। রোগীর অবস্থাটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় উত্তেজনার কারণ।

শনিচারি আমার নির্দেশে কয়েক দিন চিকিৎসার ভেতর থেকে গেল। একটা উত্তেজনার তাড়নায় ও ঘুরে বেড়াচ্ছিল ; বুঝতে পারেনি, ভেতরে ভেতরে ও কতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

উত্তেজনার পরেই অবসাদ। মাঝে মাঝে শনিচারি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সেই অবস্থায় কেবল যুদ্ধের প্রলাপ চলতে থাকে। আমি সাধ্যমত সেবা করি।

যখন ও জ্ঞান ফিরে পায় তখনই বামিয়াকে নির্দেশ দিয়ে পাঠায় তার দলবলের কাছে। এমনিভাবে কাজ চলতে থাকে।

এক সন্ধ্যায় ফিরে এল বামিয়া। তার মুখের ভাব দেখে মনে হল, কোথায় যেন কি একটা অঘটন ঘটেছে।

গোপন খবরটা শনিচারিকে দেবার জন্যে সে অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু তখন শনিচারি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে।

আমি বামিয়াকে কাছে ডেকে বুঝিয়ে বললাম, খবর যত গুরুতরই হোক্, শনিচারির অসুখ তার চেয়েও গুরুতর। সুতরাং একটু সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত তার কাছে কিছু বলা চলবে না।

মনে হল ও আমার সামনেই কেঁদে ফেলবে।

বললাম, কি ব্যাপার বামিয়া ?

ও যা বলল তার অর্থ হল, শনিচারির দলের প্রধান সর্দার আজ গুলির ঘায়ে মারা গেছে। দলের সাধারণ লোকেদের মনে ক'দিন থেকেই এ রকম একটা ধারণা জন্মেছিল, শনিচারিকে সরকার নাকি বন্দী করে ফেলেছে। সে খবর শুনে দলের ভেতর ভাঙন ধরেছিল। তারপর আজ সর্দার মারা যেতে সবাই বরাইবুরু ছেড়ে বনের ভেতর আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে যাচ্ছে।

এ সময় শনিচারি সামনে গিয়ে একবার দাঁড়াতে পারলে ওরা সবাই ফিরে আসত।

শনিচারির কাছে গেলাম। ও তেমনি পড়ে আছে আচ্ছন্ন হয়ে। মনে হল, ওর জাতির এই চরম অবস্থার কথা ওকে একবার জানানো দরকার। নইলে আমিই হয়ত ওদের এই পরাজয়ের জন্য দায়ী হয়ে যাব।

কাছে গেলাম, ধীরে ধীরে ওকে জাগাবার চেষ্টাও করলাম, কিন্তু ও একবার চোখ মেলে পরক্ষণে গভীর ঘুমে ডুবে গেল। বামিয়া আর আমি শনিচারির জাগার অপেক্ষায় বসে রইলাম।

পরের দিন খবর এল, সরকারী নতুন ফৌজ-বাহিনী জামদা থেকে মার্চ করে আসছে। আদিবাসীরা সে খবর পেয়ে গভীর বনের ভেতর লুকিয়েছে।

এবারের পরাজয় আদিবাসীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে গেল। যে উদ্যম নিয়ে ওরা শুরু করেছিল, সেটুকু শেষ অবধি বজায় রাখতে পারলে, সরকার হয়ত বনের অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করতে পারত। চিরস্থায়ী একটা সুযোগ সুবিধেও ভোগ করতে পারত তারা। কিন্তু বিধাতার উদ্দেশ্য তা নয়। শনিচারির আঘাত আজ সমস্ত অরণ্যের মানুষদের ওপর চরম আঘাত হানল।

২৩শে অক্টোবর ঃ

পায়ের আঘাত থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছে শনিচারি, কিন্তু মনের ক্ষত আরোগ্য হবে কি করে।

সারাদিন বসে থাকে ঘরের ভেতর। ছোট্ট জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে

দূরের উপত্যকার দিকে। উপত্যকার শেষে ছোটনাগরার সীমানা। ওর পিতার রাজ্য, ওর বাল্য, কৈশোরের স্বপ্নভূমি। হয়ত ও ভাবে ওর অতীত জীবনের কথা। স্বপ্ন দেখে, আবার সে রাজ্য সে ফিরে পেয়েছে। সেখান থেকে সে জড়ো করছে অরণ্যের সাধারণ মানুষদের। আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তুলছে তাদের।

আজকাল আমি যখন ওকে ডাক দিই তখন কেমন অসহায় দুটো চোখ মেলে ও আমার দিকে তাকায়। যা বলি, কোন প্রতিবাদ না করে তাই শোনে।

ওর এই অসহায় ভাবটা আমাকে বড় পীড়া দেয়। যার ইঙ্গিতে সারা বনের মানুষ প্রাণ দিতে পারত, আজ সে সামান্য একটা ঘরের ভেতর অন্যের আশ্রয়ে তার দুর্ভাগ্যকে বয়ে নিয়ে চলেছে।

একদিন বসলাম ওকে প্রবোধ দিতে।

বললাম, রবার্ট ব্রুসের সাধনার কথা তুমি জান। তাহলে এমন ভেঙে পড়ছ কেন শনিচারি।

ও আমার দিকে তাকাল। মুহূর্তে মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আবার কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

বলল, কোন আশার আলো যে দেখতে পাচ্ছি না ডাক্তার।

এখন তোমার তাই মনে হচ্ছে, কিন্তু কোথা দিয়ে কেমন করে যে সুযোগ এসে যাবে তা তুমি নিজেও বুঝতে পারবে না।

আমার দেশের মানুষ কি আর সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইবে।

তুমি শক্তি জোগালে তারা আবার জাগবে।

তুমি জান না ডাক্তার, যে খাবার দেয়, মানুষ তার কাছে নিজেকে বিক্রি করে। তোমাদের সরকার আমার দেশের সাধারণ মানুষকে খাবার দিয়ে বশ করেছে।

আমার মনে হয় আদিবাসীদের পরাজয়ের প্রধান কারণ তোমার অনুপস্থিতি। আর একটা কারণ, আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রের অভাব। তীর আর বর্শা নিয়ে বন্দুক বা বোমার সঙ্গে লড়াই করা যায় না।

শনিচারি কতক্ষণ বসে বসে কি যেন চিন্তা করল।

তারপর এক সময় বলল, তুমি ঠিক বলেছ ডাক্তার। আধুনিক অস্ত্র শস্ত্র ছাড়া লড়াইতে দীর্ঘস্থায়ী জয়লাভ অসম্ভব।

বললাম, অস্ত্রশস্ত্রের দিকে নজর দাও।

কেমন বিষণ্ণ করুণ একটা হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে।

বলল, সম্পূর্ণ নিঃসম্বল ডাক্তার। আমার যা কিছু সম্বল, সবই ফেলে এসেছি ছোটনাগরায়। আমি জানি, ইংরাজরা তার খোঁজ হয়ত পাবে না, কিন্তু আমার সেগুলি আনার পথ যে বন্ধ হয়ে গেছে।

বললাম, চেষ্টা করে দেখ, একটা কিছু উপায় বের হবেই।

ও আবার ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে ভুলে গেল আমার অবস্থিতি। আমি কাজে বেরিয়ে এলাম হাসপাতালে।

হাসপাতাল থেকে ফিরে ডিসপেনসিং রুমে গিয়ে দেখি শনিচারি গভীর-ভাবে বামিয়ার সঙ্গে কি যেন আলোচনা করছে।

আমাকে দেখে শনিচারি উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

তুমি খুব ভাল ডাক্তার।

কি হল আবার। হঠাৎ আমার প্রশংসা শুরু করলে!

না ডাক্তার, তুমি না বললে আমি হয়ত আর চেষ্টা করার শক্তিই পেতাম না।

নতুন কি পরিকল্পনা নিচ্ছ?

শনিচারি হেসে বলল, সে অতি গোপনীয়। পরে পরে প্রকাশ পাবে। তবে এখন সোনার খনিতে ঢোকার চেষ্টা করছি।

ও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বলল, বামিয়াকে হাসপাতাল থেকে কয়েকদিন বাইরে রাখতে হবে ডাক্তার।

বললাম, বামিয়া কি এখনও আদেশের অপেক্ষায় আছে?

শনিচারি গম্ভীর হল। একসময় মুখ তুলে বলল, জানি, তোমার ওপর আমাদের অত্যাচার দিনে দিনে বেড়ে চলেছে।

তা ভেবে কিন্তু কথাটা বলিনি শনিচারি। এ নিছক কৌতুক।

ও বলল, কৌতুক হলেও কথাটা সত্য।

ওকে সহজ করে দেবার জন্যে বললাম, তুমি বড় বেশী গম্ভীর হয়ে যাচ্ছ আজকাল। বামিয়াকে বাইরে পাঠাবে, এর জন্যে আমার অনুমতির দরকারটা কি পড়ল তা বুঝতে পারছি না। সাধারণ রোগী আর তোমার মধ্যে পার্থক্যটা কি নতুন করে বলে দিতে হবে।

শনিচারি সহজ হল।

বলল, বামিয়াকে ছোটনাগরায় পাঠাব।

সে কি, সেখানে যে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

শনিচারি কপট ক্রোধের ভান করে বলল, এ তোমার ভারী অন্যায় ডাক্তার। বামিয়া চিরদিন তোমার কাছে চাকরী করবে এমন দাসখত সে লিখে দেয়নি। তার এখন ইচ্ছে হয়েছে, ছোটনাগরার নতুন মনিবদের কাছে দু'দিন চাকরী করে।

এতক্ষণে ওদের পরামর্শের বিষয়টা আমার বোধগম্য হল।

শনিচারি ছোটনাগরায় বামিয়াকে পাঠিয়ে তার সঞ্চিত গুপ্তধন উদ্ধারের চেষ্টা করবে, আর তাই দিয়ে কিনবে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র।

হেসে বললাম, বামিয়া তার নতুন মনিবদের চিত্ত আর বিত্ত দুইই হরণ করে ভালয় ভালয় ফিরে আসুক, এই কামনা করি।

ঝর্ণার কলধ্বনির মত হাসির ঢেউ তুলল শনিচারি।

সে হাসিতে আমিও যোগ দিলাম। 'শুধু বামিয়া বসে রইল অনুগত আজ্ঞাবহের মত।

২৫শে ডিসেম্বর ঃ

হঠাৎ ডরোথি আর রেবেকা হাসপাতালে হাজির।

কি ব্যাপার!

ডরোথি অমনি বলল, অসুখ না হলে বুঝি আসতে নেই?

বললাম, তা কেন, তবে আমার কোয়ার্টার ঠিক কুমুডির বাংলোর মত সুসজ্জিত কিংবা আরামদায়ক নয়, তাই বিশিষ্ট অতিথিরা এলে সংকোচ বোধ করি।

রেবেকা আমাদের কথা শুনে মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন।

এবার মুখ খুললেন, ডরোথি হাসপাতালে আসবে বলে ক'দিন থেকে অস্থির করে তুলেছে।

নিজেকে এ জন্যে ভাগ্যবান মনে করছি।

ভাগ্যটা ঠিক কোন পক্ষের তা এখুনি হলফ করে বলা যায় না মিঃ জনসন।

ডরোথি এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। আমি ওদের ড্রইংরুমে এনে বসালাম।

বললাম, ব্যাচিলারের ডেরায় যখন এসে পড়েছেন তখন সবকিছু নিজেদের বরে নিতে হবে কিন্তু।

রেবেকা বললেন, ও ভয় আমাদের দেখাবেন না ডাক্তার। আপনাদেব চেয়ে ঘবকন্নার কাজ আশাকরি আমরা আর একটু ভাল করেই করতে পারব।

ওঁরা ঘরে ঢুকলেন, আমি কিন্তু বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। শনিচারিকে এঁরা কেউ চেনেন না ঠিক, ওকে পেসেন্ট বলে চালিয়েও দেওয়া যায়, কিন্তু হাসপাতালে না রেখে ডিসপেনসিং রুমে রাখার কি কৈফিয়ৎ দেব আমি।

অবশ্য গোপন করা যেতে পারে সবকিছু, কিন্তু তার জন্যে দরকার প্রচুর সাবধানতা।

শনিচারিকে ওদের উপস্থিতির কথা জানাতেই ও বলল, রান্নাঘরের দিকে জানালাটা একেবারে বন্ধ করে দিলে তোমার কোয়ার্টারের সঙ্গে আমার আর কোন যোগাযোগই রইবে না।

বললাম, সবকিছু খুব সাবধানে করে যেতে হবে।

শনিচারি বলল, আমাকে নিয়ে তোমার ভাবনার কোন কারণ নেই, কেবল বামিয়ার জন্যে যা কিছু ভাবনা।

কেন, বামিয়া যে আমার এখানে কাজ করে তাতো ওদের অজানা নয়। সুতরাং তার হঠাৎ এসে পড়াতে ক্ষতি কি?

তুমি সত্যিই বোকা ডাক্তার। বামিয়ার হঠাৎ করে আসাটাকে কেউ লক্ষ্য না করলেও ওর হঠাৎ করে চলে যাওয়াটা কারো লক্ষ্য এড়াবে না।

ওকে একবার সাবধান করে দিলে ও রাতে আসতে পারবে।

সেই ব্যবস্থাই করতে হবে, বলল শনিচারি।

বেলা শেষে আজকাল ডরোথি আর রেবেকাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতে হয়। আমি যত রকমের ফুল আর লতার নাম জেনেছি, তাই ওদের এক এক করে

চেনাই। ডরোথির এসব শিক্ষায় আগ্রহের শেষ নেই। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার ডরোথি যে শিল্পী তা আমার জানা ছিল না। ও সঙ্গে এনেছে ওর ছবি আঁকার সরঞ্জাম। পথে বেরুলেই সঙ্গে নিয়ে চলে স্কেচের খাতা। পাহাড়ী আঁকবাক, শালগাছ, আদিবাসীদের ঘর দোরের ছবি আঁকায় ওর বিশেষ আগ্রহ।

পাহাড়ী বস্তিগুলোতে প্রতিদিন ওদের একবার করে যাওয়া চাই। রেবেকা আদিবাসীদের সহজ সরল জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী। ওদের সমাজ-জীবনের খুঁটিনাটি খবর লিখে রাখেন ওঁর ডায়েরীতে। বিবাহ পদ্ধতি, ধর্মকর্ম, গান, উপকথার ইতিহাস বহু পরিমাণে সংগ্রহ করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে।

ডরোথি স্কেচের পর স্কেচ করে যাচ্ছে। মেয়েদের দল বেঁধে খোঁপায় ফুল গুঁজে নাচ, ছেলেদের আদুল গায়ে তীরধনু নিয়ে শিকার, ঝর্ণা থেকে মাথায় কলস বসিয়ে মেয়েদের ঘরে ফেরা, এইসব ডরোথির বিশেষ প্রিয় সাবজেক্ট।

সন্ধ্যেবেলা কোয়ার্টারে ফিরে আমি একবার হাসপাতালে রাউণ্ড দিয়ে আসি। তারপর বারান্দায় বসে বসে গল্প শুরু হয়। দেশের গল্প। আত্মীয় পরিজনের কথা। লণ্ডনের জীবনযাত্রার ছবি ফুটে ওঠে আমাদের চোখের ওপর।

কতদিন নিজের দেশ দেখিনি। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে কত দূরে সরে এসেছি। মাঝে মাঝে দু'একখানা চিঠি আসে। কতবার ফিরে ফিরে সে চিঠি পড়ি। আমার মেডিক্যাল কলেজের বন্ধুদের চিঠি।

মাকে হারিয়েছি ছেলেবেলা। বাবা প্রচুর অর্থের মালিক। তিনি আবার বিয়ে করলেন। আমার বিমাতার অনেকগুলি সন্তান। তারা লণ্ডনেই লেখাপড়া করছে। নিজের একটিমাত্র বোন। কত আদরই না তাকে করতাম। সে এখন সুখেই টমাসের ঘর করছে।

মনে মনে এমনি আমরা তিনটি প্রাণী হারিয়ে যাই আমাদের ফেলে আসা পুরোনো জীবনে।

গল্পের ভেতর একদিন আমি পিটারের কথা তুলেছিলাম। ডরোথি দেখলাম একটুও আগ্রহ প্রকাশ করল না। ও প্রসঙ্গ থেকে সে নিজেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখতে চাইল। রেবেকা দু'চার কথা বললেন। অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক-ভাবেই আলোচনা করলেন তিনি।

বুঝলাম, পিটার মুছে গেছেন ওঁদের মনের ক্যানভাস থেকে।

ডরোথি ভার নিয়েছে আমার পোশাক পরিচ্ছদের। আমি প্রথম প্রথম বিব্রত বোধ করেছিলাম, কিন্তু রেবেকাই মাঝে পড়ে আমার সংকোচ দূর করে দিয়েছেন।

রেবেকা বললেন, কুমারী মেয়ের কিছু কিছু সংসারের কাজ হাতে কলমে করা দরকার। ডরোথি যদি পোশাকগুলো যত্ন করে রাখতে পারে তাহলে সেটা তার শিক্ষা। সে সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারেন না ডাক্তার।

হেসে বললাম, আপনারা কোন কাজে বিরক্তবোধ না করলে আমার দিক

থেকে বিরত বোধ করার কোন কারণই থাকে না।

ডরোথি আজকাল আমার কাছে কাছেই থাকতে চায়।

সেদিন বলল, আমি আপনার সঙ্গে থেকে হাসপাতালের কিছু কিছু কাজ করতে চাই।

বললাম, বেশ ভাল, কিন্তু কি কাজ করবেন?

কিছু না পারলেও নার্সিং তো করতে পারব।

বললাম, নার্সিং খুব সহজ কাজ নয়। তবে মন বসাতে পারলে সব কাজই সহজ হয়ে আসে।

আমি চেষ্টা করব।

হেসে বললাম, কিন্তু কতদিন সে চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারবেন?

ও বলল, যতদিন না আপনি আমাকে বরখাস্ত করেন।

বললাম, মিঃ হাডসন আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে নিশ্চয়ই খুশী হবেন না।

কি করে বুঝলেন?

এখানে রোগীদের ভেতর আদিবাসীর সংখ্যাই বেশী। ওদের সঙ্গে সরকারের যে ভাবটা চলেছে তাকে কোনমতেই সদ্ভাব বলা চলে না। এ অবস্থায় আদিবাসীর সেবা অমার্জনীয় অপরাধ।

আপনি করছেন কি করে?

আমি প্রথমে ডাক্তার, তারপর সরকারের লোক। আমার কাছে সব মানুষের জাতই এক।

ডরোথি চুপ করে রইল।

বললাম, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল হওয়া তৃপ্তির বা গৌরবের সন্দেহ নেই, কিন্তু সবার জীবন এক ধারায় বয় না।

আমি যদি সে জীবন গ্রহণ করি?

তাতে বাধা দেবার কিছু নেই। তবে আপনি যে জীবন পেয়েছেন তা চেষ্টা করলেই পাওয়া যায় না।

ডরোথি বিস্মিত হয়ে আমার দিকে চাইল।

হেসে বললাম, ফুল যদি তার নিজের গন্ধের কথা জানতে পারত তাহলে সে আত্মগর্বের জন্যে মানুষের কাছ থেকে এতখানি স্তুতি পেত না।

আমাকে বড় বেশী বাড়িয়ে তুলছেন ডাক্তার জনসন।

আপনার শিল্পসত্তাকে আমি শ্রদ্ধা করি জানবেন। ছবি আঁকতে চাইলেই আঁকা যায় না। ও প্রতিভা আসে ভেতরের অলক্ষ্য কোন ক্ষমতার থেকে।

ডরোথি কোন উত্তর না দিয়ে মুখ নীচু করে রইল।

একদিন এসে পড়লেন হাডসন। হৈ হৈ জুড়ে দিলেন। কাজকর্মের বাইরে মানুষটি বিশেষ আমুদে।

বললেন, ডাক্তার তোমার রোগীরা কেমন আছে বল?

বিশেষ কোন জটিল কেস এখন হাতে নেই। মোটামুটি ভালই বলতে

পারা যায়।

আমি কিন্তু তোমার হাসপাতালের সাম্প্রতিক দুই রোগীর কথাই বিশেষ করে জানতে চাইছি।

ডরোথি, রেবেকা আর আমি হেসে উঠলাম।

বললাম, রোগের বিশেষ কোন লক্ষণ এখনও ধরা পড়ছে না।

হাডসন বললেন, রোগ ধরার দু'রকমের চোখ আছে। আমাদের এই দুটো চোখে দেহের রোগ হয়তো ধরা পড়ে, কিন্তু মনের রোগ ধরার আলাদা চোখ চাই।

ডরোথি অমনি বলল, অপবাদটা বড় বেশী সোজাসুজি হয়ে যাচ্ছে।

হাডসনের হাসি আর থামতেই চায় না।

ডরোথি যে বিশেষ ধরণের রোগে ভুগছে, আশাকরি এ কথা না' বলে দিলেও তুমি বুঝতে পারছ ডাক্তার।

মোটেই তা নয়, ডরোথি আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু তা কি করে বিশ্বাস করি বল। আমরা ভুক্তভোগী। তোমার অবস্থা আমরা পার হয়ে এসেছি। অভিজ্ঞতার সঞ্চয় আমাদের আছে। তোমার কিংবা ডাক্তারের নেই।

আবার তেমনি উচ্ছল হাসি ছড়াতে লাগলেন হাডসন।

বললাম, ডাক্তার কিন্তু নিজের চিকিৎসা করতে চায় না।

হাডসন বললেন, এ ব্যাপারে ডিগ্রি না থাকলেও আমার ওপর চিকিৎসার ভার ছেড়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

বললাম, আক্রমণটা কিন্তু প্রথমে আমার দিকে ছিলনা।

হাডসন বললেন, এ এক অদ্ভুত শিকার ডাক্তার জনসন। এ শিকারে একসঙ্গে দু'জনকেই লক্ষ্য করতে হয়।

এবার অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম।

আপনার আর একটা শিকার কিন্তু অনেক দিন দেখিনি। উড়োপাখি শিকার।

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন হাডসন। বললেন, মানুষ শিকারের কাজ এখন বন্ধ আছে, চল সবাই মিলে পশুপাখি শিকার করে বেড়াই।

কবে যাচ্ছেন? ডরোথির গলায় কৌতূহল।

কালই চল।

চারটে ঘোড়া এল। আমরা শিকারে চললাম সদলবলে। আমাদের সঙ্গে রইল আদিবাসী কয়েকটি কুলি কামিন।

সারাদিন বনবাদাড় ভেঙে চলল শিকার পর্ব। ডজন খানেক বন মোরগ, আর কয়েকটা খরগোস কপালে জুটল। বনের মাঝে মিলল একটি খোলামেলা জায়গা। বড় সুন্দর জায়গাটি, পাশেই একটি ঝর্ণা। তার দু'দিকে বড় বড় নুড়ি পাথর পড়ে আছে। পাশে বেশ খানিকটা অংশ সবুজ সমতল।

আমরা কতদিন পরে কাজের বাইরে একই দেশের ক'জন মানুষ একসঙ্গে মিললাম।

গান গাইলেন রেবেকা। চমৎকার সুরেলা গলা। আগেও আমি রেবেকার গান শুনেছি। কিন্তু বনের এই নিভৃত লোকে রেবেকার গান বড় অদ্ভুত শোনাল।

রান্নার ভার পড়ল রেবেকার ওপর।

হাডসন সত্যিই সুখী। মনে হল, রেবেকার জীবন প্রভু যীশুর কৃপায় সুন্দর হয়ে উঠেছে।

মাংস তৈরীর ভার আমার ওপর।

হাডসন বললেন, কেমন অপারেশন কর তা আজকে দেখা যাবে।

ডরোথি আর রেবেকা কাছে এল। আমি জীবদেহের এক একটা অংশ ওদের কাছে বিশ্লেষণ করে বোঝাতে লাগলাম।

ডরোথি বলল, আজকের ঘটনার সবচেয়ে ইনটারেস্টিং বিষয় এই ডিসেকসন পর্ব।

হাডসন বললেন, এটা তোমার মত না সবার সেটা যাচাই করে দেখতে হয়।

রেবেকা বললেন, আমিও ডরোথির সঙ্গে একমত।

হাডসন বললেন, মন্ত্র জান ডাক্তার। ক'দিন হাসপাতালে থেকে ওরা তোমার ভক্ত হয়ে গেছে।

ডরোথি অমনি বলল, আপনিও এমনি হাসপাতালের ভার নিন, তাহলে আমরা আপনারও ভক্ত হয়ে পড়ব।

হাডসনের আবার সেই হাসি।

আমি খোদ চিড়িয়াখানার ভার নিয়ে বসে আছি।

আমাদের চিড়িয়া ভাবলেন নাকি?

আমার চিড়িয়াখানার চিড়িয়া না হলেও বিধাতার চিড়িয়াখানার জীব, এটা অস্বীকার করতে পার না।

হাসি, গল্প, গানে আমাদের সারাদিনের আসর জমে উঠল।

বেলা শেষে ফেরার উদ্যোগ করছি, এমন সময় খবর এল, পথে হাতি দেখা গেছে।

ডাইনে পাহাড়, বাঁয়ে খাদ, এর মাঝে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রাস্তা, ঘোড়ায় চড়ে যাই কেমন করে।

এদিকে বেলা শেষ হয়ে আসছে। অন্ধকার পথে এগিয়ে যাওয়া মুশকিল।

আদিবাসীরা আমাদের বনের ভেতর অপেক্ষা করতে বলে আশ পাশে বস্তির খোঁজে খাদ বেয়ে নেমে গেল। আমরা কতক্ষণ ঐ একই জায়গায় বসে রইলাম। সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলল সমস্ত বনভূমি।

চোখের ওপর পাহাড়ী পথটা মুছে গেল এক সময়। আদিবাসী লোকগুলো আর ফিরে এলনা।

কারো মুখে কথা নেই। বিচিত্র সব কীট পতঙ্গ ডাকতে শুরু করল।

কিসের একটা খস্ খস্ শব্দ হতেই ডরোথি ভয়ে আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরল।

হাডসন বললেন, আমার মনে হয়, কুলিরা পথ হারিয়েছে। ওদের নিশানা দেবার জন্যে ফায়ার করা যাক।

বলার সঙ্গে সঙ্গে হাডসন বন্দুক তুলে ফায়ার করলেন পর পর কয়েকটা।

আধঘণ্টা কাটল। কোন সাড়াশব্দ নেই। একই জায়গায় স্থানু হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। প্রতি মুহূর্ত অপেক্ষা করে আছি যে কোন রকম একটা অঘটনের।

হঠাৎ রেবেকা চীৎকার করে উঠলেন, ঐ যে বনের আড়ালে সারি সারি মশালের আলো দেখা যাচ্ছে।

আমরা উৎফুল্ল হয়ে সেদিকে তাকালাম।

হাডসন বললেন, আমার ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার দেখছি কাজ দিয়েছে।

কিছু সময়ের ভেতর মশালধারীরা এসে পড়ল আমাদের কাছে।

কিন্তু একি, এদের ভেতর আমাদের পরিচিত লোকগুলি কই! দেখলাম, চেনা লোকগুলির একটি মাত্র রয়েছে ওদের সঙ্গে।

ওরা এসে প্রথমেই হাডসনের হাতের বন্দুকটা টেনে কেড়ে নিলে।

হাডসন এ রকম ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না, তাই তিনি হঠাৎ কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

ওরা এবার দু'দলে বিভক্ত হয়ে আমাদের আগে পিছে চলতে লাগল। বুঝতে পারলাম, আমরা আদিবাসীদের হাতে বন্দী হয়েছি।

এবার চড়াই উৎরাই ভেঙে আমাদের চলতে হল। কিছুক্ষণ চলার পর চাঁদ উঠল। আমরা এসে পেঁছিলাম একটা ভ্যালির এক প্রান্তে। দু'দিকে পাহাড় উঠে গেছে, মাঝে গিরিখাদ। ঐ গিরিখাদের ঠিক নীচেই ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর থেকে একটি আলোর রশ্মি এসে পড়েছিল। আমরা কিছু সময়ের ভেতর সেখানে গিয়ে পেঁছিলাম। কাছে যেতে কয়েকটি ছোট ছোট ঘর চোখে পড়ল। পাথরের তৈরী দেয়াল। খড়কুটোর ছাউনি।

সারারাত সেখানে আমরা বন্দী হয়ে রইলাম। রেবেকা আর ডরোথিকে কোথায় যেন ওরা সরিয়ে নিয়ে গেল। ছেড়ে যাবার সময় দেখলাম, ওদের চোখেমুখে ভীতির ছায়া। আমাদের সামনের দরজাটা এক সময় চোখের ওপর বন্ধ হয়ে গেল। আমরা সেই নির্জন রহস্যময় বনের ভেতর বন্দী হয়ে রইলাম।

হাডসনের মুখে কথা নেই। গভীরভাবে কি যেন ভাবছেন তিনি। হয়ত ভাবছেন মুক্তির উপায়, হয়ত বা ভাবছেন পরিণতির কথা।

সামনের দরজা আবার খুলল। কয়েকখানা রুটি আর সেদ্ধ ডিম ওরা রেখে গেল আমাদের সামনে। এবার ঘরের ভেতর বসিয়ে দিয়ে গেল একটা টেমি। টিম টিম করে জ্বলতে লাগল টেমিটা।

হাডসন চুপচাপ বসে আছেন দেখে বললাম, কিছু খান।

এ অবস্থায় কিছু খাওয়া যায়না জনসন। কথা ক'টি বলে আবার চিন্তায় ডুব

দিলেন হাডসন।

কতক্ষণ পরে বললেন, ডরোথি আর রেবেকাকে কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল, ওদের জন্যে দুর্ভাবনা বেড়েই চলেছে।

বললাম, বিশেষ চিন্তার কোন কারণ আছে বলে মনে হয়না আমার। তাহলে এত খাবার দাবার হয়তো দিত না।

মজার অনুমান তোমার জনসন।

বললাম, আমার যা ধারণা হয়েছে তাই বললাম।

আমাদের ঘরের একদিকে খুব ছোট জানালার মত ফাঁকা একটা ফোকর ছিল। তার ভেতর দিয়ে বাইরের চাঁদের আলো এসে পড়েছিল।

হাডসন সেখানে উঠে গিয়ে কি যেন দেখতে লাগলেন। কতক্ষণ কি যেন সব পরীক্ষা করে ফিরে এলেন।

কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বললেন, একটা পাথর সরালেই ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যাবে।

বললাম, ক্ষেপেছেন। আমাদের ঘরের চারদিকে নিশ্চয়ই পাহারা বসেছে। তাছাড়া অপরিচিত পথে গিয়ে কি শেষে বুনো জানোয়ারের মুখে প্রাণটা হারাবেন।

হাডসন বিমর্ষ হয়ে বললেন, তাছাড়া রেবেকা ডরোথি রয়েছে, ওদের ছেড়ে পালান সম্ভব নয়।

বললাম, বিপদ যখন এসেছে, তখন শেষ পর্যন্ত তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করাই ভাল।

এরপর কোন কথা হলনা। আমরা পাশাপাশি দুজনে বসে রইলাম।

রাত তখন কত ঠিক জানিনা, বোধকরি শেষ হয়ে এসেছিল, হঠাৎ দরজা খুলে গেল। আমরা প্রায় চমকে উঠলাম।

একটি লোক আমাদের বাইরে বেরিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল। আমরা ঘরের বাইরে এলাম। আরও কয়েকটি লোক আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল। তাদের নির্দেশে আমরা তাদের সঙ্গে সঙ্গে চললাম। আকাশে উজ্জ্বল চাঁদের আলো। আমরা কয়েক মিনিটের ভেতর একটি খোলা মেলা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। চারদিকে পাহাড় আর বন, মাঝে এই খোলা জায়গাটুকু।

আমরা এসেই দেখলাম, বনের কোল ঘেঁষে অনেকগুলি লোক তীরধনু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা সেই ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ কাণে ভেসে এল। কিছুক্ষণের ভেতর অশ্বারোহিণী এক মহিলা আমাদের একটু দূরে এসে দাঁড়াল। সমস্ত শরীর তার ঘোমটায় ঢাকা।

রহস্যময়ী রমণী বলল, মিঃ হাডসন, স্বেচ্ছায় আমাদের এলাকায় এসেছ, সেজন্য ধন্যবাদ। অনেক চেষ্টা করেও তোমার দেখা পাইনি।

হাডসন বললেন, ধরা যখন পড়েছি, তখন তোমাদের যা খুশি তাই করতে

হাসল মহিলাটি। বলল, আমার দেশের মানুষকে যেভাবে শাস্তি দাও, রা নিশ্চয়ই তোমাদের সেভাবে শাস্তি দিতে পারি ; কিন্তু তাতে কোন কৃতিত্ব ়। কাপুরুষ যারা, তারাই শুধু ব্যক্তি বিশেষের ওপর অত্যাচার করে নন্দ পায়।

একটু থেমে আবার বলল, আর তাছাড়া কোন একটি ইংরাজকে শাস্তি দেওয়া মাদের উদ্দেশ্যও নয়। তোমাকে হত্যা করলে, তোমার জায়গায় আর একজন সবে।

তবে আমাকে নিয়ে তোমরা কি করতে চাও ?

কিছু নয়, শুধু একটি অনুরোধ করব, আমার দেশের মেয়েদের ওপর, মার দেশবাসীর ওপর পশুর মত অত্যাচার করো না।

আমরা সরকারের কর্মচারী। সরকারের নির্দেশ আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন র থাকি।

মহিলা বলল, আমি ইংরাজ জাতিকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তোমরা আমাদের শে যে কাজ করছ, যে কোন শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন ইংরাজ তা সমর্থন করবে না।

হাডসন বললেন, তোমরা সরকারকে স্বীকার করে নিলে কোন অত্যাচারের াই ওঠে না। তাছাড়া ইংরাজ সরকার তোমাদের অনেক সুযোগ সুবিধে করে বে।

বনের হরিণকে তুমি যতই খেতে দাও হাডসন, ঘরের থেকে সে কেবল বনে লাবার চেষ্টা করবে।

হাডসন বললেন, সে নিতান্ত বোকা বলে।

মিঃ হাডসন, যার মন বলে কিছু আছে, সে নিশ্চয়ই তোমার কথা মেনে ব না।

হাডসন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মহিলাটি বলল, একটু কষ্ট করে অপেক্ষা করতে হবে, এখুনি সঙ্গিনী দুটি মহিলাকে হাজির করছি।

মহিলাটি চলে গেল। কিছুক্ষণের ভেতর একটি লোক এসে আমাকে তার যেতে ইঙ্গিত করল। হাডসন রইলেন, আমি চললাম।

কিছু পথ গিয়ে একটি ঘর দেখতে পেলাম। ঘরের সামনে পৌঁছে দিয়ে র লোকটি কোথায় চলে গেল।

কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়েছিলাম, ঘরের ভতর থেকে বেরিয়ে এল শনিচারি।

বললাম, পায়ের ক্ষত নিয়ে এই রাতে এত পথ না এলেই কি হতো না ?

ওরা তো ক্ষেপে গিয়েছিল, হাডসনকে খুন করবে বলে।

আমাকে বাদ দেবার কারণ ?

শনিচারি হেসে বলল, তুমি কি মনে কর, ডাক্তার জনসনকে চিনতে আমার র কারো বাকি আছে।

বললাম, কেমন করে তুমি আমাদের বিপদের কথা জানলে শনিচারি ?

তোমার ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে।

ওর পায়ের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম, রক্তে ওর পোশাক ভিজে গেছে।

বললাম, তুমি হাসপাতালে তাড়াতাড়ি ফিরে না গেলে পা নিয়ে খুবই বিপ পড়তে হবে।

শনিচারি হেসে বলল, তার চেয়েও ডাক্তার জনসনের সেবার লোভে ফি যেতে হবে।

বললাম, কখন যাচ্ছ ?

তোমাদের আগে নিশ্চয়। সেখানে ডাক্তার জনসনকে অভ্যর্থনা জানাব জন্যে একজন লোক অন্তত রইবে।

আবার ফিরে এলাম মিঃ হাডসনের কাছে। এসে দেখি, ইতিমধ্যে রেবেব আর ডরোথি সেখানে এসে গেছে।

আমাদের ঘোড়াগুলো আনা হল। আমরা ঘোড়ায় চড়ে আবার রও হলাম। ওদের কয়েকজন লোক আমাদের হাসপাতাল অবধি এগিয়ে দিয়ে গেল হাডসন কেবল সেই দুর্গম বন-প্রদেশে তাঁর সাধের বন্দুকখানা রেখে আস বাধ্য হলেন। সেদিনের শিকার পর্ব আমাদের এমনি এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ভেতর দিয়ে শেষ হল।

১২ ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯০২

ডরোথি আর রেবেকাকে আমার হাসপাতালে রেখে দিয়ে হাডসন ফিরে গেলে কুমুডিতে। যাবার সময় আদিবাসীদের সম্পর্কে আমাকে খুব হুসিয়ার ক দিয়ে গেলেন।

মনে মনে হেসে বললাম, আদিবাসীদের থেকে আপনাকেই বেশী সাবধা হতে হবে মিঃ হাডসন।

ডরোথি, রেবেকা আর আমি বেলাশেষে আজকাল হাসপাতালের বারান্দা বসে গল্প করি। রেবেকা কিছুতেই আর বাইরে বেড়াতে যেতে রাজী নয় আবার যদি আদিবাসীদের হাতে আমরা ধরা পড়ে যাই।

আমি বলি, আদিবাসীরা কিন্তু লোক খারাপ নয়। সেদিন ওরা আমাকে মেরে ফেলতে পারত কিন্তু কেমন ভদ্রতা করে হাসপাতালে পেঁাছে দিয়ে গেল।

ডরোথি বলল, আচ্ছা, ঐ মেয়েটিই কি শনিচারি, ওদের দলের নেত্রী ?

বললাম, তাইতো শুনেছি।

রেবেকা বললেন, ওকে ঠিক মত দেখতে পেলাম না। সারা শরীর ও কালো পোশাকে ঢাকা।

ডরোথি বলল, ঐ মেয়েটিকে নিয়েই যত হাঙ্গামা, ওকে ধরতে পারলে স গোল চুকে যায়।

রেবেকা বললেন, আমার কিন্তু সেদিন মেয়েটির ব্যবহার বড় ভাল লেগেছিল

কি রকম ?

আমরা যে ঘরে ছিলাম, সেখানে এসে ও বলল, একটি অনুরোধ তোমাদের কাছে করব, তোমরা আমারই মত মেয়ে। আমাদের দুঃখ তোমরা যতটা বুঝবে আর কেউ তেমন বুঝবে না। আমাদের মেয়েদের ওপর যে বর্বর অত্যাচার করা হয়, তার বিরুদ্ধে তোমরা একটু প্রতিবদ কর। নিজের দেশকে ভালবাসা তাদের কোন অপরাধ নয়।

ডরোথি বলল, ওর খাম খেয়ালীর জন্যেই তো তাদের ভুগতে হয়।

রেবেকা বলল, এ তোমার ভুল ধারণা ডরোথি। আমাদের দেশের খুব কম মেয়েই ওর মত সাহস আর তীক্ষ্ম বুদ্ধি রাখে।

ডরোথি কথা না বাড়িয়ে চুপ করে রইল। আমি ইচ্ছে করেই আলোচনার ভেতর নিজেকে জড়ালাম না। শুধু বললাম, লক্ষ্য করেছেন বোধহয়, ও আমাদের দেশের ভাষাতেই কথা বলে।

ডরোথি এবার আমার পক্ষে এসে গেল।

বলল, শুধু আমাদের ভাষায় নয়, ওর উচ্চারণ কি করে এমন বিশুদ্ধ হল, তাই ভাবি।

রেবেকা বললেন, আমি বুঝতেই পারি না, একজন আদিবাসী মেয়ে ইংরাজী ভাষাটা শিখল কি করে।

বললাম, যাদের নেতা হবার ক্ষমতা থাকে, তাদের কাছে আপনাদের ওটুকু বিস্ময় কিছুই না।

শনিচারির প্রসঙ্গ শেষ করলাম। অনেকগুলি কথার ভেতর জড়িয়ে পড়লে নিজের মনের কথাই বেরিয়ে আসবে। তখন কোন ছিদ্র দিয়ে কি অঘটন যে ঘটে যাবে তা বলা যায় না।

ডরোথি আমার খুব কাছাকাছি থাকতে চায়। আমার পরিচর্যার ভার ধীরে ধীরে সে ই হাতে তুলে নিয়েছে। এসব কাজে কাউকে বাধা দেওয়া যায় না। মাঝে মাঝে ও আমার কাছে এসে দাঁড়ায়, কিছু যেন বলতে চায়, কিন্তু আমার ভেতর বিশেষ কোন ভাবান্তর লক্ষ্য না করে অন্য কথার অবতারণা করে। আমি ওর মনের ভাব বুঝতে পারি। ডরোথির শিল্পসত্তাকে আমি শ্রদ্ধা করি; কিন্তু মনের যে আশ্রয়টুকুতে একটি মাত্র নারীকে এনে বসান যায়, সেখানে ডরোথির ছায়া পড়ে না। ডরোথি একদিন পিটারের প্রতি আসক্ত ছিল বলে আমি ওকে দূরে সরিয়ে রেখেছি, এ কথা মনে করলে ভুল হবে। আমি ডরোথিকে ঘৃণা করার কোন কারণই খুঁজে পাই না। তবে মন ভালবাসার ক্ষেত্রে তার নিজের একটা পথ ধরে চলে; সেখানে বাইরের যুক্তি, বিবেচনার কোন ধারই সে ধারে না।

একদিন ডরোথি বলল, আজ বাইরে একটু বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করছে। আপনার আপত্তি না থাকলে আমার সঙ্গে যাবেন কি?

বললাম, আপনার দিদি হাসপাতালের বাইরে যেতে কি রাজী হয়েছেন?

এই বন ছাড়াও তার এমন কেউ আছে, যার জন্যে তাকে এখানে থেকে যেতে হবে।

সে মানুষকে নিশ্চয়ই ভাগ্যবান বলতে হবে, একটি মেয়ে যার জন্যে নিজের দেশের মায়া কাটিয়েও এইখানে থেকে যেতে চায়।

সে মেয়েটির ওপর আপনার কি একটুও মায়া হয়না ? ডরোথি জিজ্ঞাসু চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল।

বললাম, সে মেয়েকে আমি শ্রদ্ধা করি জানবেন।

হঠাৎ একটা শব্দে চমকে উঠলাম। আমাদের একেবারে পাশেই যে শালের গাছটা দাঁড়িয়েছিল, তার গায়ে এসে বিঁধে গেছে একটা তীর। আশ্চর্য, সেই তীরের সঙ্গে বাঁধা একটা সুতো থেকে দুলছে একগুচ্ছ মরশুমী ফুল।

ডরোথি ভয়ে, কৌতূহলে আমার হাতখানা জড়িয়ে ধরে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

আমি পেছন ফিরে তাকালাম। ডিসপেন্সারিং রুমের জানালায় বিদ্যুতের মত এক ঝলক হাসির রেখা দেখা দিয়ে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। ডারোথি আমার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে তাকাবার আগেই জানালাটা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

হাসপাতাল থেকেই আমি খাবার নিয়ে যাই শনিচারির ঘরে। রাতে যখন হাসপাতালের কাজ শেষ করে খাবার নিয়ে ওর ঘরে ঢুকলাম, দেখি, শনিচারি জানালার কাছে বসে গরাদ ধরে সামনের ভ্যালির দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি ভেতরে ঢুকলাম, কিন্তু ও আজ আর ফিরে তাকালোনা। যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল।

খাবারটা টেবিলে রেখে দিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়ালাম।

সারা ভ্যালি বিচিত্র রহস্যময় হয়ে উঠেছে। শীতের শেষ, তবু একেবারে শীত চলে যায়নি। চাঁদের আলো অত্যন্ত উজ্জ্বল, কিন্তু কুয়াশার একটা পাতলা চাদর ভ্যালির ওপর কে যেন পেতে রেখেছে।

সেদিকে বসেছিল শনিচারি।

বললাম, কি ভাবছ ?

আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে ও বলল, দেখ ডাক্তার, কি আশ্চর্য সুন্দর আমার এই দেশ।

তাইতো তোমার দেশকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করেনা শনিচারি।

ও আমার দিকে তাকাল ; তোমার অশেষ অনুগ্রহ ডাক্তার। আমার দেশের মানুষের হয়ে তোমার নতুন জীবনের উদ্দেশ্যে শুভ-কামনা জানাচ্ছি।

একটু থেমে ম্লান একটা হাসি হেসে বলল, কবে দেশে ফিরছ ?

হঠাৎ দেশে ফেরার কথা কেন শনিচারি ; আমি কি তোমাদের দেশের মানুষের সেবা যত্ন ঠিক মত করতে পারছিনা ?

এ কথা বলে আমাদের দেশের মানুষকে অপরাধী করোনা ডাক্তার। আমি শুধু বলছিলাম, মিলিত জীবন সাধারণতঃ মানুষ নিজের দেশেই কাটায়। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, কবে দেশে ফিরছ।

আমি তো মিলিত জীবন অনেক দিনই যাপন করছি শনিচারি।

অবাক দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

বললাম, তোমার দেশের মানুষের সঙ্গে আমার জীবন অনেক আগেই মিলিত হয়েছে। ফুলের উপহার আরও আগে আমার পাওনা ছিল শনিচারি।

ও কেমন বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আমার দুটো হাত ওর হাতের ভেতর টেনে নিয়ে বলল, ক্ষমা কর ডাক্তার, আমি তোমাকে চিনেছি বলে মনে মনে একটা গর্ব ছিল, কিন্তু সে গর্ব আমার আজ ভেঙে গেছে। তুমি আমার চেনার সীমানাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছ।

আমাকে এত বড় করে দেখবার চেষ্টা করে লজ্জা দিওনা। তোমাদের দেশের মানুষের কাছে থাকতে পেরে, তাদের ভালবাসা পেয়ে আমি মনে মনে গর্ববোধ করি শনিচারি। আমি তোমাদেরই একজন, এটুকু অন্তত আমাকে সহজ করে ভাবতে দাও।

শনিচারি মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু আমার হাতখানা সে আরও নিবিড় করে ধরে রইল তার হাতের মধ্যে।

১৪ই মার্চ ঃ

আজও নিজের মনকে প্রবোধ দিতে পারছি না আমি। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই মুখখানা। ডান দিকটা আগুনে পুড়ে ঝলসে গেছে। চৌদ্দ পনের বছরের কিশোর।

যেদিন প্রথম আগুনে পুড়ে এল আমার হাসপাতালে, সেদিন তার ভেতর যে সহ্য শক্তি দেখেছিলাম, তা আমার ডাক্তারী জীবনে নতুন এক অভিজ্ঞতা হয়ে আছে।

সেই মা বাপ হারা কিশোরটি ভাল হয়ে উঠল একদিন। হাসপাতাল থেকে যেদিন ডিসচার্জ করলাম, সেদিন ও এসে আমার কোয়ার্টারের আশেপাশে কেবল ঘুরতে লাগল।

ডেকে বললাম, বামিয়া তুই ভাল হয়ে গেছিস, এখন আর হাসপাতালে থাকতে হবেনা, ঘরে ফিরে যা।

কোন কথা না বলে ও আমার চোখের সামনে থেকে সরে গেল। ভোরে উঠে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, কে যেন হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখি বামিয়া।

সারারাত ছেলেটা কিছু না খেয়ে এখানে পড়ে আছে। কেমন কষ্ট হল। ওকে উঠিয়ে রুটি আর দুধ খাওয়ালাম।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে চুপচাপ মুখ নীচু করে ও বসে রইল দাওয়ার এক

কোণে।

কাছে ডেকে বললাম, কে আছে রে তোর বাড়ীতে ?

ও মুখখানা আরও নীচু করে বসে রইল।

বললাম, বাবা নেই ?

ও মাথা নেড়ে জানাল, নেই।

মা ?

তাও না। মা বাপ, ভাই বোন কেউ নেই তার। কলেরা মহামারীতে সং উজাড় হয়ে গেছে।

বললাম, কি করতিস তাহলে তুই তোর গাঁয়ে ?

বামিয়া এবার মুখ খুলল, গাঁয়ের মাতব্বরের ক্ষেতে কাজ করতাম। দিনে একবেলা করে খেতে দিত। রাতে শুয়ে থাকতাম 'জায়েরা'র আস্তানায়।

বললাম, এখন গাঁয়ে ফিরে যা।

ও চুপচাপ বসে রইল।

মনে হল, হাসপাতালে ক'দিন খেতে পেয়ে ছেলেমানুষ আর কষ্টের ভেতর ফিরে যেতে চাইছেনা।

বললাম, যখন খুব ক্ষিদে পাবে তখন না হয় চলে আসিস এখানে।

ও হঠাৎ উঠে এসে আমার দুটো পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিলে।

পা ছেড়ে দে, কাঁদছিস কেন ?

বামিয়া তেমনি কাঁদতে কাঁদতে বলল, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিও না সাহেব। খেতে না দাও, তবু হাসপাতাল ছেড়ে যেতে বলোনা। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবনা।

সেই থেকে বামিয়া রয়ে গেল আমার কাছে। ও আমার পোশাক আশাক পরিষ্কার করত ; আর হাসপাতালে খাবার দিয়ে আসত। যে কোন কাজ আমার বলবার আগেই ও করে রাখবার চেষ্টা করত। কথা বলতনা বেশী। নীরবে কাজ করে যেত।

শনিচারি আসার পর ঘটনাচক্রে ও সরে গেল আমার কাজের ভেতর থেকে। আমি ওকে আর বাধা দিলাম না। দেশের কাজে বামিয়াকে দীক্ষা দিল শনিচারি। ঘরে বসেই ওকে করে তুলল দক্ষ তীরন্দাজ।

শনিচারিকে কি ভালই না বাসত ও। শনিচারির মনের কোণের একটি পাথর কি করে ও সরিয়ে ফেলেছিল। তার থেকে অজস্র ধারায় ঝরে পড়ত স্নেহ। সেই স্নেহের ধারায় স্নান করত বামিয়া।

কতদিন আড়াল থেকে আমি দেখেছি, বামিয়ার মাথায় চিরুণী দিয়ে দিচ্ছে শনিচারি। একসঙ্গে একই থালায় দুজনে গল্প করতে করতে খাবার খাচ্ছে! বামিয়া ঘুমিয়ে থাকলে মায়ের চোখ মেলে কতক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে ওকে দেখছে শনিচারি।

তাহলে কেন এমন হল। কত যুক্তি দিয়ে মনকে বোঝাবার চেষ্টা করছি

কিন্তু মন কিছুতেই শান্ত হচ্ছেনা। কোথায় যেন একটা অস্থিরতার উৎস-মুখ খুলে গেছে। প্রবল গতি তার। শত চেষ্টাতেও যুক্তির পাথর চাপিয়ে তার প্রবাহ-পথ বন্ধ করা যাচ্ছেনা।

ইদানিং ও আর আমার হাসপাতালে বড় একটা আসত না। কোন দিন রাতে শনিচারিকে খাবার দিতে গিয়ে হঠাৎ দেখতাম, বামিয়া তার কাছে বসে আছে। উত্তেজনার ছবি আঁকা হয়ে থাকত ওর চোখেমুখে। আমাকে দেখে ও মাথা নীচু করত। তেমনি সংকোচ, প্রথম যেদিনটি ও হাসপাতালে বহাল হল, সেদিন যেমন সংকোচ দেখেছিলাম।

হেসে বলতাম, কি বামিয়া, হাসপাতাল ছেড়ে আজকাল কেমন আছ?

মাথা নেড়ে জানাতো, সে ভাল আছে।

বলতাম, তুমি না আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবেনা বলেছিলে?

আমার কথা শুনে ও অপ্রস্তুত হয়ে যেত।

শনিচারি হেসে বলত, ও এখন দেশের কাজ করছে ডাক্তার। দেশ ওর কাছে এখন সব চেয়ে বড়।

বামিয়াকে উৎসাহ দিয়ে বলতাম, দেশের কাজে ডুব দিয়েছ, খুব খুশী হয়েছি বামিযা।

ওর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

শনিচারি বলত, জান ডাক্তার, বামিয়ার মত আর দু'একটা ছেলে পেলে আমি তোমাদের হাত থেকে আমার দেশটাকে ছিনিয়ে নিতে পারতাম।

উত্তর দিতাম, তোমার বামিয়া যথার্থ কাজের ছেলে।

শনিচারি ওকে প্রথমে পাঠাল ছোটনাগরায়। উদ্দেশ্য, শনিচারির মায়ের সঞ্চিত প্রচুর সোনা বামিয়ার সাহায্যে উদ্ধার করা। সেই সোনা দিয়ে কেনা হবে বন্দুক, রাইফেল; লড়াই চলবে সমানে সমানে।

নিঃশব্দে কাজ চলল কিছুদিন। কোন কোন রাতে দেখতাম, বামিয়া এসেছে। হয়ত সঙ্গে এনেছে একতাল সোনা।

শনিচারি সোনার তালটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলত, এটা কি বলতো?

কেন, সোনার তাল।

শনিচারি অমনি মাথা নেড়ে বলত, হলনা ডাক্তার, ওটা হল, পাঁচখানা বোমা আর তিনখানা রাইফেল।

হেসে বলতাম, আজ থেকে নতুন চোখ দিয়েই দেখব।

আচ্ছা ডাক্তার বলতো, ওটা কার সম্পত্তি?

এবার ভেবে চিন্তেই জবাব দিতাম, তোমার মায়ের।

না ডাক্তার, তোমার মাথায় একটুও বুদ্ধি নেই। ওটা হল সারান্দা বনের প্রতিটি অধিবাসীর সম্পত্তি। আমার দেশের মানুষ এ সবের অধিকারী।

বলতাম, হার মানছি। তোমার মনের নাগাল পেতে গেলে আমাকে আরও

কিছুদিন সাধনা করতে হবে।

খিল খিল করে হেসে উঠত শনিচারি।

বামিয়া মাথা নীচু করে বসে থাকত চুপচাপ।

কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছিলাম, ওদের কর্মব্যস্ততা বেড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে শনিচারিকে বাইরে যেতে হত। অবশ্য আমার দৃষ্টি এড়িয়ে ও বেশী দূর যেতে সাহস করত না। রাতে হাসপাতালের পেছনের পাহাড়ে অনেকগুলি লোকের আসা যাওয়ার সাড়া পেতাম। বারান্দায় বসে বসে শুনতাম ঘোড়ার খুরের শব্দ।

অনেক রাতে চুপি চুপি ডিসপেন্সিং রুমের কাছে গিয়ে দেখতাম, শনিচারি তখনও বসে বসে কি যেন করছে।

দরজায় টোকা দিতাম। আমার হাতের শব্দ ওর চেনা ছিল। দরজা খুলে যেত।

ঘরে ঢুকে কোনো দিন দেখতাম, একরাশ নোট নিয়ে হিসেব-পত্র করছে। আবার কোনদিন নিজের হাতে ম্যাপ তৈরী করছে।

বলতাম, তোমার গোপন আড্ডার খবরটা এবার সরকারকে জানিয়ে দিতে হবে।

হেসে ও বলত, আমার আড্ডা উঠে যাবে ঠিক কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে হাসপাতালও ছাড়তে হবে।

আচ্ছা শনিচারি, তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করলে, তোমরা আমাকে শাস্তি দেবে?

শনিচারি কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলত, শাস্তি তুমি নিজের মনের থেকেই পাবে। অন্য কারো কাছ থেকে শাস্তি পাবার দরকারই হবেনা তোমার।

বলতাম, যত অপরাধই আমি করি, তুমি কিন্তু আমাকে শাস্তি দিতে পারবেনা।

শনিচারি গম্ভীর হয়ে বলত, হয় তুমি এখান থেকে যাও, নয় চুপচাপ বসে থেকে আমাকে কাজ করতে দাও। এ দুটোর বাইরে গেলেই আমি তোমাকে ঠিক শাস্তি দেব।

কি শাস্তি দেবে তুমি আমাকে?

এখুনি ঘোড়ায় চড়ে সারা বন বেড়িয়ে আসব। দেখ, ঠিক ঘুরে আসব আমি। তোমার কোন কথাই শুনবনা।

এই আমি যাচ্ছি, তুমি তোমার কাজ কর। আর বেশী রাত্তির জেগে থেকোনা কিন্তু।

আমি উঠে পড়লেই ও হাত ধরে বসিয়ে বলত, কাজ কতদূর এগিয়েছে শুনবে না?

তোমার গোপন ব্যাপার যদি ফাঁস হয়ে যায়।

আবার সেই কথা! তুমি চুপচাপ বসে শোন, আমি বলে যাচ্ছি। তোমার

মনে কোন রকম প্রতিবাদের ইচ্ছে জাগলেই কিন্তু বলে ফেল। তাতে আমার কাজের সুবিধে হবে।

বেশ বল।

শনিচারি বলত, ছোটনাগরা থেকে সে কেমন করে বামিয়াকে দিয়ে সোনা সরাচ্ছে। তার পূর্ব পুরুষদের আদিং বা আত্মা যে বেদীর তলায় রক্ষিত আছে, তারই পাশে আর একটা বেদীর তলায় রয়েছে তাল তাল সোনা। বামিয়া ছোটনাগরায় পুলিশদের কাছে ঘরদোর পরিষ্কারের কাজ নিয়ে ঢুকেছে। এই সুযোগে সে সরিয়ে আনছে সোনা।

এখন সেই সোনা বেচে সংগ্রহ করা হচ্ছে নোট আর টাকা। তারপর শুরু হবে অস্ত্র সংগ্রহ। এ কাজ অত্যন্ত জটিল। কিন্তু ইচ্ছা থাকলে কোন কাজই অসমাপ্ত থাকেনা।

শনিচারি তার পরিকল্পনার কথা বলে যেত, আমি চুপচাপ বসে বসে শুনতাম। লক্ষ্য করতাম, কত সূক্ষ্ম আর তীক্ষ্ম বুদ্ধি ধরে এই অরণ্য-কন্যা।

সেদিন হাসপাতাল থেকে এসে বসেছিলাম বারান্দায়। আমার পাশে বসেছিল ডরোথি আর রেবেকা। রোজকার মত গল্প হচ্ছিল সেদিনও।

হাডসনের কাছ থেকে ডাক এসেছে। ওরা দু'এক দিনের ভেতরেই হাসপাতাল থেকে চলে যাবে।

ডরোথি একটু বিষন্ন। ও আমার কাছ থেকে ওর প্রশ্নের সকৌতুক উত্তরই শুধু পেয়ে গেল, আমার মনের কথা জানতে পারল না। ওর মনের গুরুভার আমি বুঝি। কিন্তু সেই ভার সরিয়ে দেবার মানুষ আমি নই। এ সত্যটুকু আকারে প্রকারে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি. কিন্তু আমার অক্ষমতা, আমি ওকে তা কোনরকমেই বোঝাতে পারিনি।

রেবেকা বললেন, এবার অনেক দিন একসঙ্গে আমরা কাটালাম, এ কথা বহুদিন মনে থাকবে।

বললাম, আপনাদের যাবার পরই কিন্তু দুঃখ শুরু হবে আমার॥

রেবেকা বললেন, আপনার কিসের দুঃখ, মিঃ জনসন?

একা একা ছিলাম একরকম। এখন আপনাদের সেবা পেয়ে বড় বেশী আয়েসী হয়ে পড়েছি। আবার তো সব নিজেকেই ঠিকঠাক করে নিতে হবে।

একটা করুন দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকাল ডরোথি।

মনে মনে ভাবলাম, কথাটা বলে ঠিক করিনি। অন্য একজনের মনের ক্ষতটাকেই খুঁচিয়ে তুললাম শুধু।

বেলা শেষ হয়ে আসছিল। বসন্তকালের এই সময়টুকু এ অঞ্চলে বড় তৃপ্তিদায়ক। ধীরে ধীরে বাতাস বইছিল। শাল ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল পাশের বন থেকে। আমরা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বেলা শেষের প্রকৃতির এই দানটুকু প্রাণ ভরে উপভোগ করছিলাম।

হঠাৎ একটা আওয়াজ ভেসে এল কানে। গুলির আওয়াজ। পর পর

কয়েকটা শব্দ হল। আমরা বারান্দা থেকে পথের ওপর নেমে এলাম। ওদিকের পাহাড়ী রাস্তা ধরে একটি ছেলে প্রাণপণ হাসপাতালের দিকে দৌড়ে আসছে। তার পেছনে তাড়া করে আসছে একটি অশ্বারোহী পুলিশ। সে বার বার ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে ছেলেটিকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। আর একটি অশ্বারোহী সামনের উপত্যকায় নেমে দৌড়ে আসছে। ছেলেটিকে মুখোমুখি ধরবার চেষ্টা করছে সে। তার হাতে ঘুরে চলেছে একটা ফাঁস।

ছেলেটার কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে একবার পাহাড়ে উঠছে, আর একবার পথে নেমে এঁকে বেঁকে দৌড়চ্ছে। কিছু দূরের থেকে চিনতে পারলাম। বামিয়া দৌড়ে আসছে হাসপাতালের দিকে।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ডরোথি আর রেবেকা। আমি চীৎকার করে বামিয়াকে থামতে বললাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা গুলির শব্দ শোনা গেল। বামিয়া পথের ওপর বসে পড়ে আবার উঠে দাঁড়াল। বোধহয় পায়ে লেগেছে গুলি। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কিছুটা এগিয়ে এল। পাশের উপত্যকার অশ্বারোহী তৎক্ষণে প্রায় তার কাছাকাছি এসে গেছে। এমন সময় হঠাৎ দেখলাম, বামিয়া পেছন দিকে উল্টে পড়ে গেল।

কি হল বামিয়ার! গুলির আওয়াজ নেই। ও হঠাৎ পেছন দিকে ছিট্‌কে পড়ল কেন!

দুটি অশ্বারোহী এরপর কি ভেবে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়াল। তারপর তারা বামিয়াকে তুলে নিয়ে আমার হাসপাতালের দিকেই এগোতে লাগল।

এতখানি দূর থেকে কি হল আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। অস্থির উন্মাদনায় তাদের আসার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

বামিয়াকে ওরা হাসপাতালে এনে তুলল। কি আশ্চর্য, আমি স্তম্ভিত হয়ে বামিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটি তীর ওর বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে আছে। তখনও বুকে সামান্য স্পন্দন ছিল। একটু বাতাসের জন্য ও প্রাণপণ জোরে শ্বাস টানছিল।

দৌড়ে গেলাম ডিসপেন্সিং রুমে। চাবি খুলে ঢুকতেই যে দৃশ্য দেখলাম, তার জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না।

মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে আকুল হয়ে কাঁদছে শনিচারি। পাশে পড়ে আছে তার ধনুক। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ও উঠে দাঁড়াল। এমন উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি আমি আর কখনো দেখিনি।

একটা ওষুধ নিতে যাচ্ছিলাম, শনিচারি আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল। বামিয়াকে একটু শান্তিতে মরতে দাও, ডাক্তার। ওকে ওষুধ দিয়ে বাঁচালে ওরা তিলে তিলে মেরে ফেলবে।

কঠিন সুরে বললাম, আমি ডাক্তার, শনিচারি। রোগীর সেবা আমার একমাত্র কাজ। পথ ছাড়, এক মুহূর্ত নষ্ট করার সময় আমার নেই!

ওষুধ নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম। শনিচারি কঠিন পাথরের মত নিশ্চল

হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

চেষ্টা করলাম। আমার সমস্ত শিক্ষা প্রয়োগ করলাম বামিয়াকে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু না, শনিচারির ইচ্ছাই পূর্ণ হল। বুক থেকে তীরটা বের করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বামিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। সে শ্বাসটুকু সে আর ফিরিয়ে আনতে পারল না।

সরকারী পুলিশ নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। তারা অনেক আশা করেছিল বামিয়াকে জীবিত অবস্থায় ধরে নিয়ে যাবে। তার কাছ থেকে আদায় করবে প্রয়োজনীয় গুপ্ত সংবাদ।

কিন্তু কিছুই হল না। বামিয়া জীবন দিয়ে গুপ্তধনের খবরটুকু গোপন রেখে গেল।

তখন গভীর রাত। চারদিক নিস্তব্ধ। কেউ কোথাও জেগে নেই। বারান্দায় পায়চারী করতে করতে ডিসপেনসিং রুমের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। মনে হল, এখুনি হয়ত শনিচারির ঘরে শুরু হবে গোপন পরামর্শ।

কোথাও কোন সাড়া নেই। দরজায় ধাক্কা দিলাম। ভেজান ছিল, নিঃশব্দে খুলে গেল।

ঘরে ঢুকে দেখলাম, শনিচারি অন্ধকার এক কোণে মেঝের ওপর পড়ে আছে। খোলা জানালার ফাঁকে যেটুকু আলো এসে পড়েছিল, তাতে দেখলাম তার রাশীকৃত খোলা চুল ছড়িয়ে পড়েছে। সেই চুলের রাশে ডুবে গেছে তার সমস্ত মুখখানা।

মেঝেতে নতজানু হয়ে বসে শনিচারির মাথায় হাত রাখলাম। ও ধীরে ধীরে উঠে বসল। তারপর কেমন অর্থহীন চোখ মেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বামিয়া শান্তিতেই চলে গেছে শনিচারি। তোমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।

আমার দিকে তাকিয়ে ও অদ্ভুত হাসি হাসল। পরক্ষণেই আবার কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

বললাম, তোমার ইচ্ছার কাছে আমাকে হার মানতে হল, শনিচারি।

ওকে কিছুতেই বাঁচাতে পারলেনা, ডাক্তার?

বললাম, তুমি ত ওকে বাঁচাতে চাওনি।

ওকে মেরে সারা দেশকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম; কিন্তু এখন ভাবছি, ওকে ছাড়া সারা দেশটাই মরে গেল।

শনিচারিকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার ছিলনা। কতক্ষণ শুধু বসে রইলাম নীরবে। ও তাকিয়ে রইল জানালার ফাঁকে উপত্যকার দিকে। দূরের পাহাড় আলো অন্ধকারে রহস্যময়। কি ভাবছে শনিচারি, কে জানে। ঐ ত সেই পাহাড়টা, যার কোলের পথ বেয়ে কয়েক ঘণ্টা আগে বামিয়া প্রাণপণে

দৌড়ে আসছিল। এই সেই জানালা, যার ভেতর দিয়ে ধনু থেকে তীরখানা ছুটে গিয়েছিল ; শনিচারির অব্যর্থ-লক্ষ্য তীর !

হাসপাতালে এখনও শুয়ে আছে বামিয়া। ভোরের আলোর স্পর্শ পেলে সে হয়ত জেগে উঠবে। জেগে উঠেই লজ্জিত হবে। সংকোচে সে ঢুকবে গিয়ে খাবার ঘরে। কত আয়োজন করতে হবে, অথচ ঘুম ভেঙে উঠতে কত দেরী হয়ে গেল তার।

না, সে আর কোনদিন জাগবে না। আমার মিথ্যে কল্পনার পথ বেয়ে সে আর ফিরে আসবে না থলকোবাদের হাসপাতালে।

স্বপ্ন ভাঙল শনিচারির কথায়।

কেন এমন হল ডাক্তার।

নীরবে আমি বসে রইলাম। শনিচারি বলে চলল, আমি তো ওকে মারতে চাইনি। ওকে আমার এই বুকের ভেতর আগলে রাখতে চেয়েছিলাম। আমি চাইনি, কেউ ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তিলে তিলে হত্যা করুক।

বললাম, তাই হয়েছে শনিচারি। আর কেউ তোমার কাছ থেকে বামিয়াকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারেনি।

শনিচারি কিছুক্ষণ থামল। তারপর একসময়ে বলল, কেন তুমি ওকে বাঁচাতে পারলেনা, ডাক্তার। তোমার ওপর কি বিশ্বাস, কি ভরসা আমি রেখেছিলাম।

সাধ্যমত তোমার বিশ্বাসের যোগ্য হবার চেষ্টা করেছি শনিচারি, কিন্তু পারলাম না। যুদ্ধ করেছি, শেষে হার হয়েছে আমার।

আরও কতক্ষণ এমনি কেটে গেল। কত অসংলগ্ন চিন্তার ঢেউ বয়ে গেল দুজনের ওপর দিয়ে।

একসময় শনিচারি আমার দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বলল, তোমাকে অজস্র যন্ত্রণা দিয়ে গেলাম, ডাক্তার। শুধু বিশ্বাস কর, প্রাণের থেকে তোমাকে কোনদিন দুঃখ দিতে চাইনি।

তোমার ভেতর এই আশ্চর্য দেশের মূর্তি আমি দেখেছি, শনিচারি। তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে তোমাকে এখানে আশ্রয় দিয়েছি। বামিয়া মরেছে, সে আঘাত আমার বুকের ভেতর ক্ষত সৃষ্টি করে গেছে। কিন্তু তুমি না থাকলে আমি সে যন্ত্রণার ভার বইতে পারতাম না। তোমার দিকে তাকিয়ে আমি আমার চরম দুঃখের সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি, শনিচারি।

ও আমার মুখের দিকে অবাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল।

আমি যে নিজের ভাইকে হত্যা করেছি, ডাক্তার।

এ হত্যা পৃথিবীর মানুষের ইতিহাসে গৌরবের, শনিচারি।

ও শান্তভাবে মাথা নাড়তে লাগল।

আমি অসাধারণ হতে চাইনা ডাক্তার। আমি গৌরব চাইনা, চাইনা এ বন্য মানুষের নেতৃত্ব। আমাকে শুধু সাধারণ একটি মেয়ে হয়ে বাঁচতে দাও। মা যেমন করে তার সন্তান মারা গেলে আকুল হয়ে কাঁদে, আমার বামিয়ার জন্যে

আমাকে তেমনি করে কাঁদতে দাও।

ঝর ঝর করে শনিচারির চোখ বেয়ে জলের ধারা বইল। ওকে একা কাঁদতে দিয়ে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম।

দূরের পাহাড়ে ভোরের অস্পষ্ট আলোর আভাস। পেছনের পাহাড়ে তখনও জমাট অন্ধকার। একটা বাতাস বয়ে এল। সামনের শালবনের পাতাগুলো কেঁপে উঠল থর থর করে।

তারপর দমকা হাওয়ায় তলাকার শুকনো পাতাগুলো করুণ একটা মর্মর ধ্বনি তুলে উপত্যকার দিকে উড়ে চলে গেল।

২রা এপ্রিল ঃ

ডরোথি আর রেবেকা চলে গেছে। হাডসন এসে ওদের নিয়ে গেলেন। হাসপাতালে এসে খুব দুঃখ করলেন হাডসন।

বললেন, কয়েকটা ঘণ্টা যদি ছেলেটা জ্ঞান ফিরে পেত, তাহলে কত গোপন খবরই না বের করে নেওয়া যেত ওর মুখ থেকে।

বললাম, হত বলা যায়না, মিঃ হাডসন। প্রথম বারের লড়াইতে কত চেষ্টাই তো করলেন, কিন্তু পারলেন এক কণা খবর বের করতে। প্রাণে মবল, তবু মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোল না।

হাডসন কিছুসময় চুপ করে থেকে বললেন, ওদের এবার চূড়ান্ত শায়েস্তা করতে হবে। গ্রামের পর গ্রাম আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়াই হবে আমাদের প্রথম কাজ। যারা সরকারেব কথা মেনে চলবে রোজ হাজিরা দিয়ে যাবে, তাদের জন্যে গড়ে তুলব নতুন আস্তানা। দেখি, বুনো জানোয়ারগুলোকে শায়েস্তা করতে পারা যায় কি না।

হেসে বললাম, চেষ্টা করলে একটা কিছু ফল হয়তো পাওয়া যাবে।

হাডসন সক্ষোভে বললেন, ফল অনেক আগেই পাওয়া যেত। কেবল ঐ মেয়েটার জন্যে বার বার লড়াই লাগছে। তুমি দেখো, ওকে একবার ধরতে পারলে আর কোন হাঙ্গামাই থাকবে না।

বললাম, একটি জ্বলন্ত বাতি থেকে প্রথমে আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু পরে আর ঐ বাতিটার প্রয়োজন হয়না। আমার মনে হয় অরণ্যে যে আগুন জ্বলছে, তার জন্যে এখন হয়তো আর শনিচারির দরকার হবে না।

তুমি জান না, জনসন, এই বনের মানুষগুলো একেবারে অশিক্ষিত। ঐ মেয়েটাই পেছনে থেকে সবকিছু চালাচ্ছে। শুনেছি ওর নাকি যথেষ্ট শিক্ষাদীক্ষা আছে। ওর বাবা আমাদেরই দেশ থেকে শিক্ষিত হয়ে ফিরে এসেছিল।

হেসে বললাম, এতো আমাদের আনন্দের কথা, মিঃ হাডসন। শনিচারি তাহলে আমাদের শিক্ষার ভেতর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

হাডসন এবার দেশের ওপর শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলেন, সে কথা ঠিক, ডাক্তার জনসন; ঐ মেয়েটির কৃতিত্ব দেখে মাঝে মাঝে আমার শ্রদ্ধা হয়। অবশ্য ওর সবটুকু কৃতিত্বই আমাদের পাশ্চাত্য থেকে পাওয়া।

প্রশংসার শেষে হাডসন নিজের দেশটিকে জুড়ে দিয়ে খুশি হলেন মনে মনে।

হাডসন ওদের নিয়ে যাবার পর আমি হাসপাতালের কাজেই সারাদিন নিজেকে ডুবিয়ে রাখলাম। আমার আগের জীবন আবার ফিরে এল। নিজের হাতে পোশাক পরিচ্ছদ পরিস্কার করতে লেগে গেলাম। বাবুর্চির কাজ কখনো কখনো আমি নিজেই করতাম। এমনি করে কাজের ভেতর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে ফেলে মনের দিক থেকে অনেকখানি হালকা হয়ে গেলাম। কেবল যখন শনিচারির ঘরে ঢুকতাম, তখন একটা ভারী আবহাওয়া আমার চারদিকে এসে ভীড় করত। বামিয়া মারা যাবার পর শনিচারি তার অসমাপ্ত কাজে আর হাত দেয়নি। রোজ গিয়ে দেখতাম, হাঁটুর ভেতর মাথাটি গুঁজে শনিচারি বসে বসে কি যেন ভাবছে। ওকে দেখে মনে হত, একটি জ্বলন্ত বনস্পতির জ্বলন্ত ক্রিয়াটা হঠাৎ থেমে গেছে। এখন তার অগ্নিদেহটা শত রেখায় ভেঙে খসে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

বলতাম, আর কাজ করবেনা, শনিচারি ?

ম্লান হেসে ও বলত, হেরে গেছি, ডাক্তার।

হার স্বীকার করলে চলবে কেন, শনিচারি। তোমার ওপর সারা দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

বার বার লড়াই এর ভেতর জয়ের কোন আশাই আমি আর দেখতে পাচ্ছিনা ডাক্তার।

মনে হয়, তোমার মত যদি মানুষের সেবা করে, বা অশিক্ষিত মানুষগুলিকে শিক্ষা দিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম, তাহলে অনেক কাজ হত। আর এতে নিজের মনেও শান্তি খুঁজে পেতাম।

কথার ভেতর লক্ষ্য করতাম, শনিচারি আজকাল কত শান্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু এই শান্ত পরিবেশের মাঝখানেও শনিচারির ভেতর কোথায় যেন একটা ব্যথার ছায়া আমি লক্ষ্য করতাম। নিজের মনের সেই গভীর যন্ত্রণাকে সে নানাভাবে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করত, কিন্তু তার থেকে সে মুক্তি পাবার কোন চেষ্টাই করতনা। আমার মনে হয়েছে, বার বার ব্যর্থতা, বামিয়ার মৃত্যু, সবকিছুকেই ও মনের গোপনে লালন করবার চেষ্টা করত।

আজকাল মাঝে মাঝে ওর কাছে বসে গল্প করি। ও নিবিষ্ট হয়ে আমার গল্প শোনে। আমি আমার দেশের গল্প করি। আমার দেশের নদীর নাম, নগরীর নাম ওকে শোনাই। নগর জীবনের ছবি এঁকে যাই।

এই সময়টুকু মনে হয় ও কিছুটা আনন্দ পায়। অতীতকে ভুলে থাকার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে ও নিজেও আলোচনায় যোগ দেয়।

আমাদের দেশের দু'চারটে নদী আর সহরের নাম ও উল্লেখ করে। এগুলো ওর বইয়ের থেকে জানা নয়, ওর বাবার মুখে ছেলেবেলায় শোনা।

আমি ওর কাছে বাইবেলের গল্প বলার চেষ্টা করেছিলাম একদিন।

ও হেসে বলল, বাইবেলের গল্প আমার মুখস্থ রয়েছে, ডাক্তার। বাবার কাছ থেকে তোমাদের ইংরাজী ভাষাটাই শুধু শিখিনি, বই পড়ার নেশাটাও

পেয়েছি।

আমি অমনি বললাম, তাহলে তোমার দেশের উপকথা আমাকে শোনাও।

ও আমাকে অনেকগুলি বিচিত্র উপকথা শোনাল। কোন কোন উপকথার আশ্চর্য মিল দেখে আমি বিস্মিত হলাম।

মনে হল, সারা পৃথিবীর মানুষ জাতির মধ্যে কোথায় যেন একটা চিন্তার অবিচ্ছিন্ন মিল রয়েছে। প্রকৃতির নদ নদী, সমুদ্র পর্বত যতই ব্যবধানের সৃষ্টি করুক, সেই অদৃশ্য চিন্তাধারার মিলটুকুকে তারা নষ্ট করতে পারেনা।

ইতিমধ্যে একদিন দুপুরে ডরোথি হঠাৎ হাসপাতালে হাজির।

স্বাগত জানিয়ে বললাম, কি মনে করে?

বলল, স্কেচের খাতাখানা সেদিন ফেলে গেছি এখানে। বড় অসুবিধে হচ্ছে, তাই চলে এলাম।

মনে হয়, ডরোথির খাতাখানা ফেলে যাওয়া একটা ছলনা। ও আমার সঙ্গে সবার আড়ালে কোন কিছু বলতে চায়।

হেসে বললাম, স্কেচের খাতা ফেলে না গেলে কি আসতে নেই?

ডরোথি বলল, হাসপাতালে আসার আর একটি মাত্র পথ আছে।

কি?

কোন একটা অসুখে পড়ে যাওয়া।

তাহলে অবশ্য সে পথ দিয়ে আসতে আপনাকে বারণ করব। যদিও যে কোন ভদ্রলোকের পক্ষে যে কোন ভদ্রমহিলাকে আসতে বারণ করা অভদ্রতা।

ডরোথি বলল, আমি যে আপনার এখানে আজ এসেছি, একথা দয়া করে কাউকে না জানালে খুশি হব।

কেন, বাড়িতে কাউকে বলে আসেননি বুঝি?

দিদিকে, এই আসছি বলেই চলে এসেছি।

বললাম, এ সময় একা একা পথে বের হওয়া কি ভাল?

ভালমন্দ বুঝি না, আসাটা আমার প্রয়োজনের তাগিদে। হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে গেল। শনিচারির মনটাকে হালকা করে দেবার জন্যে আমি ছোটখাট দু'একটা কাজের ভার ওকে দিয়েছিলাম। দুপুরে রোগীদের জন্যে ফল আর দুধও সাজিয়ে রেখে যেত। এ সময়টা ও এসে ঢুকত রান্নাঘরে।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডরোথির দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলাম, হঠাৎ দেখলাম ডরোথির মুখে ভাবান্তর উপস্থিত হল। আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রান্নাঘরের দিকে।

মুহূর্তে পেছন ফিরে যা দেখলাম, তাতে সহসা আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

ডিসপেনসিং রুম থেকে বেরিয়ে শনিচারি রোজকার মত কিচেনে আসছিল। হঠাৎ তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেছে ডরোথির।

ও কে, ডাক্তার জনসন?

মুখে হাসি টেনে বললাম, উনি যে আমার সমজাতীয়া নন, তা আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি।

ডরোথি বলল, দয়া করে এ সময় তাড়াতাড়ি আমার স্কেচের খাতাটা এনে দেবেন কি?

ডরোথি তাহলে অন্য কিছু সন্দেহ করেনি। ও নিছক কৌতূহলের বশে শনিচারির একটা স্কেচ করতে চায়।

তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর ঢুকে নির্দিষ্ট স্থান থেকে ওর খাতাটা এনে দিলাম।

ততক্ষণে শনিচারি রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে। ডরোথি স্কেচের খাতাখানা নিয়েই দৌড়ল সেখানে। এগিয়ে যেতে যেতে আমাকে ডাক দিয়ে বলল, আসুন ডাক্তার, মুখের এমন গড়ন আর পাওয়া যাবে না।

রান্নাঘরের ভেতর থেকে ডরোথি ওর হাত ধরে বাইরে টেনে আনল।

ডরোথির পেছনে থেকে আমি শনিচারিকে ইঙ্গিতে কোন কিছু বলতে বারণ করলাম।

শনিচারি বাইরে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল। ডরোথি কাঠের একটা টুলের ওপর বসে রেখায় রেখায় ওকে ফুটিয়ে তুলতে লাগল। স্কেচ শেষ হলে দেখলাম, শনিচারির নিখুঁত চেহারাখানা কাগজের বুকে ফুটে উঠেছে।

আঁকা শেষ হলে শনিচারি চলে যাচ্ছিল। ডরোথি জিজ্ঞেস করল, কি নাম তোমার?

ও ডরোথির দিকে রহস্যময় দু'টি চোখের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম, ও আপনার কথা বুঝতে না পেরে দেখুন কেমন অবুঝের মত তাকিয়ে রয়েছে। ক'দিন আগে ও এখানে এসেছিল কাজের খোঁজে। ওকে রান্নাবান্নার কাজে বহাল করেছি।

ডরোথি বলল, এ ধরণের মুখ কিন্তু আদিবাসীদের নয়। আমি এই মুখখানা এনলার্জ করে আঁকব।

বললাম, অন্য কোন জাতের মেয়ে হবে হয়তো। ভারতবর্ষে মানুষের মুখের চেহারা এত বিভিন্ন, দেখলে অবাক হতে হয়।

ডরোথি এবার আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে পথের দিকে এলিয়ে চলল। আমিও উৎসাহের সঙ্গে নানা কথার অবতারণা করে ওর মন থেকে শনিচারির ছবিটা মুছে দেবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

ডরোথি বলল, আমাদের বাংলোতে কবে যাচ্ছেন বলুন?

বললাম, যবে ডেকে পাঠাবেন।

তাহলে আজই চলুন।

হেসে বললাম, বেশ তাতে আমি রাজি আছি। শুধু আপনার দিদির কাছে গিয়ে বলব, আপনি আমাকে ডেকে এনেছেন।

ডরোথি এবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলল, নিমন্ত্রণ ওখান থেকেই আসবে।

বললাম, তখন যাবার জন্য অবশ্যই তৈরী থাকব।

ডরোথি ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল। আমি দ্রুত ফিরে এলাম ডিসপেনসিং রুমে।

শনিচারি আমাকে দেখে বলল, ধরা পড়লাম এতকাল পরে, এতে অগৌরবের কিছু নেই, কি বল?

বললাম, তা হয়ত নেই, কিন্তু ধরা পড়ার দুর্লভ সৌভাগ্যটুকু তুমি এখনও অর্জন করতে পারনি।

কি রকম?

দেখলে তো, ও তোমার নামটুকু পর্যন্ত জানতে পারল না।

শনিচারি বলল, ডরোথি আবার কুম্‌ডির বাংলোতে গিয়ে গল্প না করে।

হেসে বললাম, সে পথ ও নিজেই বন্ধ করে এসেছে।

কৌতূহলী হয়ে উঠল শনিচারি।

কি রকম?

বললাম, আমার এখানে আসাটা ও গোপন রেখেছে।

হাসি আর থাকতে চায়না শনিচারির। এতদিন পরে ওর মুখে প্রাণ খোলা হাসি শুনতে পেলাম।

বলল, তাহলে এই হাসপাতালটা সবার গোপনীয় স্থান, কি বল ডাক্তার।

হেসে বললাম, আর আমি সেই গোপন জায়গার মালিকানা ভোগ করি, তাই না?

কিছুক্ষণ থেমে কি ভাবল শনিচারি। তারপর বলল, তোমার ভেতর কেমন একটা আকর্ষণ শক্তি আছে, ডাক্তার। সবাই দেখি তোমাকে খুব ভালবাসে।

বললাম, শুধু একজন ছাড়া।

কি করে তুমি বুঝলে?

তাকে আমি জানি বলে।

শনিচারি অমনি বলল, আমি তাকে তোমার চেয়ে কিছু কম জানিনা ডাক্তার।

এরপর কিছুক্ষণ সব চুপচাপ!

এক সময় শনিচারি বলল, ডরোথি খুব ভাল ছবি আঁকে, তাই না?

হঠাৎ কথার মোড় ফিরল। আমি একটু কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

ও আর্ট কলেজে ছবি আঁকা শিখেছে। খুব নিখুঁত ওর হাতের কাজ।

কথা শুনতে শুনতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল শনিচারি।

বলল, আমি যদি ছবি আঁকা শিখতাম, তাহলে আমার দেশের এই পাহাড়, শালের বনের কত সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকতে পারতাম।

বললাম, কত মানুষ মনে মনে তোমার ছবি আঁকছে। তুমি আবার কার ছবি আঁকবে!

শনিচারি হঠাৎ বলল, আমি আমার বামিয়ার একটা ছবি এঁকে রাখতাম। কেন আর্টিষ্ট হলাম না, ডাক্তার।

আবার সেই পুরনো কথায় ও ফিরে এসেছে। এখুনি গভীর এক যন্ত্রণার ভেতর তলিয়ে যাবে ওর এই প্রসন্ন মনটা।

তাই তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে ফেললাম, ডরোথির ছবি দেখলে তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে, শনিচারি।

ও আমার মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল।

তুমি ডরোথিকে খুব ভালবাস, তাই না ডাক্তার ?

এ কথা কেন ?

তার ছবি তোমার খুব ভাল লাগে।

যে গুণী, তার ওপর সকলেরই আকর্ষণ থাকে।

ও কি ভেবে বলল, আমি যদি গুণী হতে পারতাম।

বললাম, ফুল তার নিজের গন্ধ সম্বন্ধে কিছু জানে না বলেই কি বলব, ফুলের গন্ধ নেই।

তাহলে তোমাদের সরকারী লোকেরা কেন আমাকে একটুও পছন্দ করে না !

গুণীরাই গুণীর আদর বোঝে। সরকারী লোক না বুঝলে কিছু এসে যায়না।

তুমি খুব ভাল, ডাক্তার। তোমার মত গুণী আমি দেখিনি।

শনিচারির মধ্যে আমি যেন অন্য কোন এক জীবনের স্পন্দন অনুভব করলাম। নিজের বিরাট শক্তির কথা ভুলে সামান্য ডরোথির মত মেয়ে হতে পারলে ও যেন সুখী হয়। আমি ডরোথিকে ভাল বলেছি, তাই শনিচারির গোপন মনে হয়ত একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা উঁকি দিচ্ছে। ও জীবনের যে দিক সম্বন্ধে এতকাল সচেতন ছিলনা, আজ ধীরে ধীরে সেই দিকের একটি দরজা মনে হল খুলে যাচ্ছে। শনিচারির মনে এক চিরন্তনী নারীকে আমি যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠতে দেখলাম।

১১ই এপ্রিল ঃ

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। তখনও প্রকৃতির অগ্নিলীলা শুরু হয়নি। বসন্ত শালের বনে অজস্র ফুল ফোটানোর খেলায় মেতে আছে। পাখীরা ডালে ডালে ফলের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছে। আদিবাসীদের গাঁয়ে গাঁয়ে মাদলের বোল বাজছে। বাহা পরবের স্রোত বইছে গানের সুরে। আগুন লাগল। সরকারের অশ্বারোহী পুলিশবাহিনী বনের অন্ধিসন্ধি খুঁজে পেতে আদিবাসীদের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে চলল।

হাহাকার উঠল চারদিকে। অসহায় মানুষগুলো পশুর মত খোলা জায়গায় বনের ভেতর আশ্রয়হীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। আকাশ পথে পাখীরা সারান্দা ছেড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গেল অন্য কোন আশ্রয়ের সন্ধানে।

হাডসনের এ পরিকল্পনা সরকারকে অনেকদিনের একটা জটিল সমস্যার হাত থেকে মুক্তি দিল। শুনতে পেলাম, বনের মানুষগুলো দলে দলে সরকারী শিবিরে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। তারা কথা দিচ্ছে, আর কোনদিন সরকারের বিরুদ্ধে

দাঁড়াবেনা। সরকারকে তারা সাহায্য করবে মানুষ দিয়ে, শ্রম দিয়ে আর সাধ্যমত কর দিয়ে।

কথাগুলো আমার কানে এলো। শনিচারি পাছে দুঃখ পায় সেজন্য তাকে আর কোন কথা বললাম না।

যখন দূরে কোথাও আগুন লাগত, তখন ও বারান্দায় বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত সেদিকে।

আমি পাশে বসে থাকতাম।

এমনি বসে থাকতে থাকতে একদিন শনিচারি বলল, জান ডাক্তার, এ আমার পাপের ফল।

এ কথা কেন বলছ, শনিচারি?

অনেক ভেবে দেখছি, যাদের রক্ষা করার ক্ষমতা নেই, তাদের শুধু ধ্বংসের ভেতর ঠেলে দেবার কোনো অধিকার নেই। আমি ওদের দুর্ভিক্ষের সময় খেতে দিতে পারিনি, তাই শুধু উত্তেজনার সৃষ্টি করলে কোন ফলই ফলবে না। অসহায় মানুষগুলো আরও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

বললাম, তুমি যা করেছ, দেশকে ভালবেসেই করেছ। তোমার দেশের মানুষকে সত্যিকারের মানুষের মত বাঁচাতেই তুমি চেয়েছিলে। সেখানে কোন খাদ নেই তোমার চিন্তায়। তবে আজ যাকে পরাজয় বলে মনে করছ, একদিন হয়ত দেখবে, সেই পথেই তোমার জয় আসছে।

শনিচারি নির্বাক বসে তাকিয়ে রইল দূরের আকাশের দিকে; সেখানে সূর্যাস্তের রঙ আগুনের রঙের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যা নামল। জ্যোৎস্নার ঢেউ আকাশ ছাপিয়ে উপচে পড়ল বনভূমির ওপর। কত শান্ত আর স্নিগ্ধ সে স্পর্শ। মনে হল, আর্ত সন্তানের গায়ে মায়ের কোমল হাতের সান্ত্বনা।

আমরা পৃথিবীর এই বিচিত্র রূপের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেলাম। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ বলেই মনে হল।

শনিচারি তাড়াতাড়ি উঠে পাশের ঘরে আত্মগোপন করল।

দেখলাম, ঘোড়ায় চড়ে হাসপাতালের দিকে কে যেন আসছে।

কাছে আসতেই দেখলাম রেবেকা। এগিয়ে গেলাম।

কি ব্যাপার, আপনি এ সময়, একা!

রেবেকা ঘোড়া থেকে নেমে হাঁপাতে লাগল।

সময় নেই ডাক্তার জনসন। জীবনে অনেক উপকার করেছেন আপনি, তাই যদি আপনার কোন উপকার হয় সে জন্যে দৌড়ে এলাম।

বললাম, হাঁপাচ্ছেন আপনি, বসুন এখানে।

রেবেকা বসলেন না। বললেন, এখুনি ফিরে না গেলে সবাই আমাকে সন্দেহ করবে। কথাটা বলেই আমি চলে যাব।

তাকিয়ে রইলাম রেবেকার দিকে।

রেবেকা বললেন, সেই আদিবাসী মেয়েটি নাকি আপনার আশ্রয়েই রয়েছে।

ডরোথি আঁকা একখানা ছবি দেখে ক্যাপটেন স্মিথ তাকে চিনতে পারেন। তিনি নাকি তাকে ছাতমবুরুর লড়াইয়ের সময় দেখেছেন। তারপর ডরোথিকে ওরা জিজ্ঞেস করে সব কথা জেনে নিয়েছে।

আজ শেষ রাতে পুলিশের লোকেরা আপনার হাসপাতাল ঘেরাও করবে। সাবধান থাকবেন ডাক্তার জনসন।

রেবেকা কথা ক'টি বলেই ঘোড়ায় চড়ে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বসে বসে আমি শুধু ভাবতে লাগলাম। গোপনতা কেন ; আজ যদি ওরা আসে তাহলে শনিচারিকে নিয়েই বের হব ওদের সামনে। যদি কোন সেবা করে থাকি সরকারের, তাহলে তার পুরস্কার স্বরূপ চেয়ে নেব এই অরণ্য কন্যাটিকে। ওকে নিয়ে আমার দেশে চলে যেতে চাইলে আশাকরি ইংরাজ সরকার বাধা দেবে না। তাহলে এই সারান্দার মানুষগুলোকে ক্ষেপিয়ে তোলার যে ভয়, তা আর থাকবে না সরকারের।

শনিচারিকে কিছু বললাম না। রেবেকা আর আমার কথাগুলো বোধ করি শোনেনি শনিচারি। তাহলে গভীর চিন্তায় ডুবে আছি দেখেও এমন সহজ মুখ-ভাব নিয়ে ও আমার সামনে এসে দাঁড়াতে পারত না।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

শনিচারি অত্যন্ত শান্তভাবে বলল, আমাকে আজ একটি অনুমতি দিতে হবে ডাক্তার ; আর কোনদিন এমন করে তোমার কাছে চাইব না।

কিসের অনুমতি ?

আগে কথা দাও আমার ইচ্ছা পূর্ণ করবে ?

কথা দিলাম।

এই জ্যোৎস্না রাতে বনে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে বড় ইচ্ছে করছে। চল আমরা দু'জনে একটু ঘুরে আসি।

একটু ভেবে বললাম, ঘোড়া মাত্র একটি ; দু'জনে যাব কি করে ?

আমার ঘোড়া সন্ধ্যে হলেই হাসপাতালের পেছনের পাহাড়ের ধারে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তুমি তৈরী হয়ে এসো, আমি ওদিক দিয়ে পথে বেরিয়ে যাচ্ছি।

আমি পোশাক পরে বেরিয়ে এলাম ঘোড়া নিয়ে। পথের বাঁকে পৌঁছে দেখি শনিচারি তার ঘোড়ায় চেপে অপেক্ষা করছে।

ওর মুখোমুখি হয়েই গম্ভীর গলায় বললাম, পথ হারিয়ে এ অঞ্চলে এসে পড়েছ বুঝি। এ জায়গাটা আদীবাসীদের নেত্রীর পক্ষে খুব নিরাপদ নয়।

আমার কথা বলার ভঙ্গী দেখে ও হেসে ফেলল।

তুমি আমার কথার শোধ নিচ্ছ ডাক্তার জনসন ?

বললাম, মনে আছে শনিচারি, ছোট নাগরার পাহাড়ের বাঁকে যেদিন আমাদের প্রথম দেখা হয়, সেদিন তুমি আমাকে এমনি একটা কথা বলেছিলে।

সেখানেও এমনি পাহাড়ের বাঁকে আমরা ঘোড়ায় চড়ে মুখোমুখি হয়েছিলাম।

বললাম, সেদিন তুমি আমাকে বর্ষার আগেই নদী পার করে দিয়ে গেলে।

আমরা বিদায় নেবার ঠিক পরেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। আমি সারাপথ আসতে আসতে কেবল ভেবেছি, নদীতে বান আসার আগেই তুমি পেরিয়ে যেতে পেরেছ কি না।

শনিচারি বলল, আজও কিন্তু তোমার সেকথা জানা হয়নি।

বললাম, তোমাকে সশরীরে হাসপাতালের ভেতর পেয়ে আর সব কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

পাশাপাশি পথ চলতে চলতে ও বলল, প্রায় সারাটি রাত আমাকে সেদিন কাটাতে হয়েছে নদীর এপারে।

আমি খুবই লজ্জিত শনিচারি।

ও হেসে বলল, এই সামান্য কারণে এতদিন পরে তুমি যদি লজ্জা পাও তাহলে তোমার কাছে আমার লজ্জার যে সীমা থাকে না।

আমরা একটি ঝর্ণার ধারে এসে পৌঁছলাম। এখন ঝর্ণাটি ক্ষীণাঙ্গী, তবু নুড়ির নূপুর বাজিয়ে সে উপত্যকার দিকে ছুটে চলেছে।

শনিচারি সেখানে দাঁড়াল। আমিও তার পাশে এসে দাঁড়ালাম।

কতক্ষণ সে ঝর্ণাটির দিকে তাকিয়ে রইল। এক সময় বলল, জান ডাক্তার, এই ঝর্ণার ধারে একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটা আজও আমার কাছে বড় রহস্য জনক হয়ে আছে।

ঘটনাটি শোনার জন্যে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে।

শনিচারি বলতে লাগল, বেশ কয়েক বছর আগে আমরা একবার এই পথ দিয়ে ছোট নাগরার দিকে যাচ্ছিলাম। তখনও বেলা ছিল। আমরা এই ঝর্ণাটার প্রায় কাছাকাছি এসে একটা চীৎকার শুনতে পেলাম।

কাছে এসে দেখি, ঝর্ণায় জল খেতে এসে হরিণ বাঘের কবলে পড়েছে। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হল এই যে, ভয়ে হরিণটা একটা বাচ্চা প্রসব করে ফেলেছে। আসন্ন প্রসবা ছিল সে। আমরা হৈ চৈ করায় বাঘটা সরে গেল বনের ভেতর। আমি বাচ্চাটাকে তুলে নিলাম কোলে। হরিণটা তখুনি মারা গেল। বাচ্চাটা নিলাম, কিন্তু তাকে লালন পালন করা এক সমস্যা। যাহোক অনেক চেষ্টায় বাচ্চাটা বড় হল। দেখতে দেখতে সে বিরাট আকার ধরল। শিং জোড়া হল তার দেখবার মত। ওকে ছেড়ে দিতাম ; সারাদিন ঘুরে ফিরে ও আবার ঠিক ফিরে আসতো আমার ঘরে।

একদিন চরতে গিয়ে ও আর ফিরে এলো না। পরের দিন চারদিকে লোক পাঠালাম ওর খোঁজে।

এক রহস্যময় খবর পাওয়া গেল। এই ঝর্ণার ধারে আমার হরিণটি মৃত অবস্থায় পড়ে আছে, আর তার ধারাল শিংয়ের ভেতর বিঁধে আছে একটা চিতা বাঘ। বাঘটাও মারা গেছে।

আমি অবাক হয়ে শুধু ভাবতে লাগলাম, আমার আস্তানার কাছেপিঠে এত ঝর্ণা থাকতে হরিণটা এত দূরেই বা এল কেন!

এ রহস্যের সমাধান আজও পাইনি।

কথাটা শুনে আমিও বিস্মিত হলাম। হরিণটা কি তার মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিল।

আমরা ঝর্ণাটা পেরিয়ে এলাম।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রাস্তা। ওপরে বন, নীচে উপত্যকার কোথাও কোথাও বন ; আবার কোথাও লোক বসতি। আমরা অনেক পথ পার হয়ে চললাম।

এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল শনিচারি। পাহাড়ের ওপর থেকে একটা সর্টলিক্ নীচে ভ্যালির দিকে নেমে গেছে। ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, খুব সাবধানে আমার পেছন পেছন নেমে এসো।

আমি ওকে অনুসরণ করে নীচে নামতে লাগলাম। আমরা খুব ধীরে ধীরেই নামলাম। ঘোড়ার পায়ে তলা থেকে মাঝে মাঝে নুড়ি পাথর ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়তে লাগল। নামতে নামতে শনিচারি আমাকে বার বার হুসিয়ার করে দিল।

এক সময় আমরা নেমে এলাম পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের উপত্যকায়। কিছু পথ বনের ভেতর দিয়ে চলার পর আমরা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পেঁছিলাম। মনে হল এ স্থানটা একটা আদিবাসী গ্রাম ছিল।

শনিচারি বলল, এ গ্রামখানা সরকার আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে। দেখছ না, ভাঙা দেওয়াল, কালো কালো পোড়া চিহ্ন।

বললাম, এই নির্জন কবর ভূমিতে হঠাৎ এলে কেন ? এখানে তো কোন মানুষ আছে বলে মনে হয় না।

ও কতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, দেবতা জেগে আছেন ডাক্তার, আর রয়েছে মৃত মানুষের আত্মা।

কতক্ষণ এদিক ওদিক ও যেন কি খুঁজতে লাগল। এক সময় আমরা গাঁয়ের শেষে এসে পেঁছিলাম। এখানে পোড়া জিনিসের আর কোন চিহ্ন নেই। এক জায়গায় কতকগুলো গাছ জটলা করে দাঁড়িয়েছিল। শনিচারি সেখানে এসে ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়ল। ঐ গাছগুলোর নীচে অজস্র পাথর ঠিক বেদীর মত করে বাঁধান রয়েছে।

ও তারই তলায় প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে পড়ল। আমি দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। অর্ধ উচ্চারিত একটা সুরেলা ধ্বনি মাঝে মাঝে আমি শুনতে পচ্ছিলাম।

একসময় ওর প্রার্থনা শেষ হল। ধীরে ধীরে ও উঠে এল বেদীর কাছ থেকে। জ্যোৎস্নালোকে আমি দেখলাম, ওর মুখ বেদনায় থম থম করছে ; কিন্তু একটি বিশেষ দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে ওর মুখে।

ও ঘোড়ায় উঠল। আমরা আবার ফিরে চললাম।

একসময় ও বলল, জান ডাক্তার, যে বেদীর কাছে বসে আমি এতক্ষণ প্রার্থনা করলাম, ওখানে আমার বামিয়া রাতে এসে ঘুমিয়ে থাকত। কোন আশ্রয় ছিল না আমার বামিয়ার। বন দেবতা 'জায়েরা' তাকে রাতের আশ্রয় দিত। ওর

আত্মার জন্য প্রার্থনা জানিয়ে গেলাম।

আমরা আবার সেই সল্ট লিক্ ধরে পাহাড়ের ওপর উঠে এলাম।

শনিচারি বলল, ঐ যে দূরে পাশাপাশি দুটো পাহাড় দেখছ, ওর তলায় যে উপত্যকা, সেটি আমার জন্মস্থান। আমার কত দিনের খেলার আশ্রয়। সব ফেলে এসেছি ডাক্তার। ঘোড়া থেকে নেমে ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। একসময় বলল, জান ডাক্তার, এই সময়ে সারা বন জুড়ে চলত বাহা পরব। এই বনভূমির প্রতিটি গ্রাম থেকে বাহা পরবের দল আমাদের ঐ ছোট নাগরায় গিয়ে ভীড় জমাত। মেয়ে পুরুষের নাচ গান আর উৎসব আনন্দে ক'দিন ছোটনাগরার আকাশ বাতাস, বন পাহাড় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হত।

ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। যেন কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, হাজার হাজার মাদলের শব্দ ভেসে আসছে। ভেসে আসছে, শত শত অরণ্য কন্যার কণ্ঠের বিচিত্র সুরধ্বনি।

শনিচারিও তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে। গুণ গুণ করে তার সুরেলা গলা তুলতে লাগল বিচিত্র সুরের ঢেউ।

আমি ঘোড়া থেকে নামলাম। শনিচারি আমাকে লক্ষ্য করল না। সে আপন মনে সেই জ্যোৎস্না ধোয়া আকাশের নীচে অরণ্যবাসরে তার অতীত দিনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে চলল।

আমি মুগ্ধ হয়ে রাজকুমারী শনিচারিকে দেখতে লাগলাম।

একসময় পাহাড়ের কাছে গিয়ে লতাগুল্মের থেকে কিছু ফুল সংগ্রহ করে আনলাম।

আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম শনিচারির কাছে। ও তখনও নিজের ভেতর মগ্ন হয়েছিল। কাছে গিয়ে ওকে স্পর্শ করলাম। কেমন মোহাচ্ছন্ন চাহনি মেলে ও আমার দিকে তাকাল। এ দেশের মেয়েরা যেমন করে খোঁপায় ফুল গোঁজে, আমি তেমনি করে ওর খোঁপায় একরাশ ফুল পরিয়ে দিলাম। ও কেমন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি ওর হাত ধরলাম। দু'জনে একবার তাকালাম ছোটনাগরার সেই ধূমল পাহাড়ের দিকে।

একসময় ফিরে এলাম আমাদের পরিচিত জগতে। থলকোবাদের হাসপাতালে যখন এসে পৌঁছলাম তখন চাঁদ অস্ত গেছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এসেছে।

আমরা রাতে খেতে বসলাম একই সঙ্গে। ও আমাকে পরিবেশন করতে লাগল। ওর চোখেমুখে আজ যেন কিসের তৃপ্তি উপচে পড়ছে।

আমিও মনে মনে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

বিছানায় যাবার সময় ও আজ এল আমার কাছে।

বলল, তুমি শোও ডাক্তার, আমি আজ তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই।

ও বসে বসে আমার চুল নিয়ে খেলা করতে লাগল। কি যাদু ও হাতের.. আমি ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল একটা ভারী জিনিস ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ার শব্দে।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। ল্যাম্প জ্বেলে ঢুকলাম শনিচারির ঘরে। ঘর শূন্য। বেরিয়ে এলাম পথের ওপর। অন্ধকার তখনও জমে আছে। আলো নিয়ে খুঁজতে লাগলাম। ঐ ত, শনিচারি পড়ে আছে পথের ওপর। রক্তে ভেসে যাচ্ছে পথ। হাসপাতালের পেছনে খাড়াই পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে।

তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে কোলে তুলে নিলাম ওর দেহটা। পরীক্ষা করলাম. শেষ অবস্থায় এসে পেঁাছেছে।

শ-নি-চা-রি· ··

থর থর করে আমি কাঁপতে লাগলাম।

অতি ক্ষীণ আহত গলায় ও বলল, আমি মরতে চাইনি ডাক্তার।

তবে কেন এমন করলে ?

তোমাকে খু-উ-ব ভালবাসি, তাই।

এ বনের থেকে তোমাকে মুক্ত করে আমার দেশে নিয়ে যাব মনে করেছিলাম শনিচারি।

তোমার দেশে! অস্পষ্ট যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করল ও।

হাঁ, শনিচারি আমার দেশে। সেখানে নিয়ে গিয়ে তোমাকে আমি বিয়ে করব মনে করেছিলাম।

যন্ত্রণার ভেতরেও একটা করুণ হাসি ফুটে উঠল শনিচারির মুখে। ও একেবারে কাছে আমার মুখটা নিয়ে যেতে ইঙ্গিত করল ও।

কাছে গেলাম। ও ধীরে ধীরে বলল, আজ এই শেষ মুহূর্তে তোমাকে গ্রহণ করলাম ডাক্তার। পঙ্গু হয়ে, তোমার বিপদের কারণ হয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারলাম না। কথা দাও, আমার দেশের মানুষকে আমার মতই তুমি ভালবাসবে। কোনদিন তাদের ছেড়ে যাবে না।

ওর হাতখানা আমার দুটি হাতের মধ্যে তুলে নিলাম।

ও নীরব হয়ে গেল।

অন্ধকার সরে গিয়ে পাহাড়ের আড়ালে, আবির্ভাব হচ্ছে জ্যোতির্ময় আলোর। আমি নতজানু হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

আপনি ডাক্তার জনসনের ডায়েরী পড়া শেষ করে যখন উঠে দাঁড়াবেন, তখন সেই বৃদ্ধ পাদ্রীটি আপনার সামনে এসে, ঐ বেদী বাঁধানো আদিংয়ের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তারপর আপনার হাত থেকে ঐ ডায়েরীখানা নিয়ে মৃদু হাসি হাসতে হাসতে ঢুকে যাবেন চার্চের ভেতর।

ফিরে আসতে আসতে আপনার মনে হবে, ইনিই কি ডাক্তার জনসন। আমারও তাই মনে হয়েছিল।

রিসেপশনিস্ট

কিংশ্বক সামনে তাকিয়ে দেখল অন্ধকারের সমুদ্রে ট্যুরিস্ট বাংলোটা ঝলমলে জাহাজের মত জেগে আছে।

এইমাত্র যে বাসখানা জম্মু থেকে তাদের এনে ট্যুরিস্ট বাংলোর সামনে পেঁাছে দিল, তার আলোগুলো তখনও নেভেনি। জাহাজ সংলগ্ন বোটের মত মনে হচ্ছিল গাড়িখানাকে।

কিন্তু কি করবে কিংশুক। এইমাত্র একটা ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া তার শিরা উপশিরার রক্ত চলাচল ক্রিয়াটাকে প্রায় বন্ধ করে দিল।

গায়ে বেশ খানিকটা টেম্পারেচার আর মনে তার চেয়েও বেশী জোর নিয়ে সে কলকাতা ছেড়েছিল। সারা ট্রেনে বিশ্রাম নিতে নিতে আর ওষুধ খেতে খেতে এসেছে সে, কিন্তু এইমাত্র বাসে শ্রীনগরে পেঁাছে সে বুঝতে পারল, কাজটা তার ভাল হয়নি। সম্পূর্ণ একা একটা মানুষের অসুস্থ অবস্থায় কলকাতা থেকে বেরিয়ে আসা মস্ত বড় একটা ঝুঁকির ব্যাপার বইকি।

এমন একটা ঠাণ্ডা তার ক্লান্ত শরীরটাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল, যার হাত থেকে সেই মুহূর্তে রক্ষে পাবার কোন উপায়ই সে দেখতে পেল না।

কুলিরা মাল টানাটানি করে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। যাত্রীরা প্রায় সবাই যে যার পূর্বনির্দিষ্ট আস্তানার দিকে রওনা হয়ে গেল। কিংশুক, তার হোল্ডলখানার ওপরে বসে রইল জড়-পিণ্ডের মত। দাঁতে দাঁত চেপে, দু'হাতের চেটোয় কান ঢেকে সে অন্ধকারের সমুদ্রে নিঃসঙ্গ একটা বয়ার মত ভেসে রইল।

টাঙ্গাওয়ালাটা কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়ালই করেনি কিংশুক।

সাব, আপ ইস জাড়েমে বৈঠ কর ক্যায়া কর রহে হে। কাঁহা চলিয়ে গা: চলিয়ে।

কিংশুক জানাল, তার যাবার নির্দিষ্ট কোন জায়গা নেই, সে এই ঠাণ্ডায় বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে, তাই ট্যুরিস্ট অফিসে গিয়ে যে আস্তানার খোঁজ করবে সে ক্ষমতাটুকুও তার নেই।

হামারে সাথ আইয়ে জনাব,—বলে টাঙ্গাওয়ালা কিংশুকের হাতখানা ধরে তুলল। কিংশুককে ধরে নিয়ে সে পেঁাছে দিল ট্যুরিস্ট অফিসের বারান্দায়।

আলোয় ঝলমল ঘরখানার ভেতর ঢুকে কিংশুক হঠাৎ বেশ সুস্থ বোধ করল। বাইরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে ঘরের ভেতর এসে পড়ার জন্যেই বোধকরি এ অনুভূতি।

অনেকেই ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল তখনও।

ট্যুরিস্ট অফিসার প্রত্যেকের অনুসন্ধানের উত্তর একই রকম মাথা নেড়ে দিয়ে যাচ্ছিল। তার একটিমাত্র অর্থ ছিল, স্যরি, নো ভেকেন্সি।

কিংশুক কোনরকমে ভীড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে বলল, একটা কোন হোটেল বা

হাউসবোটের সন্ধান দিতে পারেন দয়া করে ?

কোন কথা না বলে ট্যুরিস্ট অফিসার নীচু হয়ে ড্রয়ার থেকে টাইপ করা একটা কাগজের সীট টেনে নিয়ে কিংশুকের দিকে এগিয়ে দিতে গিয়ে বলল, সিজন্ টাইম, আশা কম, চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

হাতে কাগজখানা নিয়ে টাইপ করা অক্ষরগুলোর ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিল কিংশুক।

হোটেল ডালভিউ।

ঐখানেই চোখটা আটকে গেল। আর বেশী দেখার মত সময় শরীর কিংবা মনের অবস্থা কোনটাই ছিল না।

বাইরে বেরিয়ে এসে টাঙ্গাওয়ালাকে বলল, হোটেল ডালভিউমে চালিয়ে।

টাঙ্গায় খানিক পথ যাবার পরেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

একেবারে অচেনা অন্ধকারের রাজ্য। আকাশের আলোগুলো সন্ধ্যে থেকেই জ্বলেনি। ঠাণ্ডা হাড়-কাঁপানো দমকা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির মিহি গুঁড়োগুলো কপালে এসে লাগছিল। রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে এক একটা ল্যাম্প পোস্টের আলো দূর আকাশের ম্লান নিষ্প্রভ এক একটা হলুদ তারা যেন। ঘোড়ার খুরের শব্দ, বৃষ্টির এলোমেলো ঢেউ, টিমটিমে আলোগুলোর কাঁপা কাঁপা চাহনি, সব মিলিয়ে কিংশুকের মনে হল, সে যেন রাতের গাঙে নৌকোয় ভেসে চলেছে। এদিকে ওদিকে টেমি জ্বালিয়ে ভাসছে ছোট ছোট অনেকগুলো ডিঙি নৌকো।

একসময় হোটেল ডালভিউ-এর সামনে এসে টাঙ্গাটা দাঁড়াল।

কিংশুক নেমে এল। টাঙ্গাওয়ালা তার পেছন পেছন হোল্ডলখানা বয়ে নিয়ে এল হোটেলের অফিস রুমে।

একটি মেয়ে বসেছিল, দেখে মনে হল রিসেপশনিস্ট।

অফিস ঘরে ঢুকেই কিংশুক বুঝতে পারল সে ভুল করেছে। এ হোটেল তার জন্যে নয়। ওয়েস্টার্ন স্টাইলের হোটেল। পাশেই বার। নীলাভ আলোর কোমল ছোঁয়ায় দারুণভাবে স্বপ্নাচ্ছন্ন। বিলিতী অর্কেস্ট্রার সিম্ফনি ঢেউয়ের মত উঠে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

এখন কোন উপায়ই আর তার হাতে নেই। এসব হোটেলের চার্জ যে তার ধরাছোঁয়ার বাইরে তা সে জানে। তবু কিংশুক এগিয়ে গেল। কারণ নতুন করে আস্তানা খোঁজার মত শক্তি তার ছিল না। যেটুকু পুঁজি নিয়ে সে বেরিয়েছে তাতে এসব হোটেলে বেশীদিন থাকা তার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়। তা হোক, এই রাতটুকুর মত অন্ততঃ বাঁচতে পারলেই সে খুশী। তারপর সারা কাশ্মীরকে না দেখেই সে গুডবাই জানিয়ে ফিরে যাবে। সেটা হবে তার বোহেমী কাজের প্রায়শ্চিত্ত।

রিসেপশনিস্ট মেয়েটির কাছে এগিয়ে যেতেই সে অভ্যস্ত এক চিলতে হাসি হেসে বলল, স্যরি।

সারা মুখখানায় অদ্ভুত যন্ত্রণার ছবি ফুটে উঠল কিংশুকের।

মেয়েটি লক্ষ্য করল। পাশে পড়ে থাকা বাঁধানো খাতার পাতা উল্টে বলল, নামটা বলুন, ওয়েটিং লিস্টে তুলে নিচ্ছি, কাল বিকেল নাগাদ পেয়ে যেতে পারেন। আজ নিরুপায়।

মেয়েটি ইংরেজীতেই কথা বলছিল।

কিংশুক তখন কোন রাজ্যেই নেই। স্বভাব ভদ্রতায় তবু সে নামটা উচ্চারণ করল, কিংশুক মুখার্জী।

নামটা লিখতে গিয়ে মনে হল যেন মেয়েটি একটু থামল। তারপর একটানে লিখতে লিখতেই বলল, কলকাতা থেকে আসছেন?

বিশুদ্ধ বাংলায় মেয়েটি কথা বলে উঠল। এমন বিস্মিত বোধকরি আর কোনদিন হয়নি কিংশুক।

হঠাৎ একরাশ কথা দমকা হাওয়ার মত ছড়িয়ে দিল সে।

ঠিক ধরেছেন, কলকাতা থেকেই আসছি। দারুণ অসুবিধেয় পড়ে গেছি, শরীরটাও বিগড়েছে। অচেনা-অজানা জায়গা, এ রাতে একটা আশ্রয় না পেলে কি যে হবে ভাবতেও পারছি না। আচ্ছা দেখুন, ভগবান কি আশ্চর্য যোগাযোগটাই না ঘটিয়ে দিলেন, আপনিও যে বাঙালী একেবারেই ভাবতে পারিনি।

মেয়েটি হেসে সামনের চেয়ারে বসতে বলল কিংশুককে।

ঝড়ের অন্ধকার সমুদ্রে যেন বাতিঘরের আলোটা দুলছে কিংশুকের চোখের সামনে। একটা আশ্বাসের আলো ফুটে উঠল তার মুখে।

মেয়েটি থুতনীতে বুড়ো আঙুলের চাপ দিয়ে তর্জনী আর মধ্যমার ফাঁকে ধরে থাকা পেন্সিলটা গালে ছুঁইয়ে রেখে বলল, আমি কাশ্মীরী।

কিংশুক এবার আর কোন কথা বলতে পারল না। একটি কাশ্মীরী মেয়ে কি করে এমন বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণে কথা বলে যেতে পারে, তা তার সমস্ত ধারণার বাইরে বলে মনে হল।

কিংশুক চেয়ে আছে মেয়েটির দিকে। মনের ক্ষীণ আশ্বাসটুকু মুছে গেছে। মাথার ওপর নীলাভ আলোটা অনেক ম্লান মনে হচ্ছে এখন। তার চেয়েও বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে কিংশুকের মুখখানা।

মেয়েটি উঠে চলে গেল ভেতরে।

কিংশুক বাইরে গিয়ে টাঙ্গাওয়ালাকে আর একটুখানি অপেক্ষা করতে বলে এল। মেয়েটি ফিরে এলেই সে বিদায় জানিয়ে বেরোবে।

বাইরে সমানে বৃষ্টি পড়ছে। নিজের পোশাকটাও যেন বরফের তৈরী বলে মনে হচ্ছে কিংশুকের। মাথাটা অনেক ভারী হয়ে উঠেছে। এদিক-ওদিক ফেরালেই একটা অস্বস্তি কাঁটার মত বিঁধছে।

মেয়েটি এলো না, এলো ট্রেতে কফি নিয়ে বেয়ারা। কিংশুকের সামনে রেখে খাবার ইংগিত করে সবিনয়ে মাথাটি দুলিয়ে চলে গেল।

কিংশুক মেয়েটির জন্য অপেক্ষা করবে না গরম কফির কাপটা তুলে নেবে তাই ভাবছিল, মেয়েটি ঘরে ঢুকল।

নিন কফি খান।

ধন্যবাদ জানিয়ে কিংশুক তুলে নিল কাপটা। ঠাণ্ডায় গরম কফিটুকু কয়েক চুমুকেই সে শেষ করে ফেলল।

এই মুহূর্তে তার মনে হল, সে তার খুইয়ে ফেলা শক্তিটুকু ফিরে পেয়েছে।

উঠে দাঁড়িয়ে কিংশুক বলল, মনে থাকবে আপনার আতিথেয়তার কথা।

কিংশুক উঠে দাঁড়াতেই মেয়েটি তার দিকে কেমন একটুখানি অবাক চোখে তাকাল। তারপর স্বল্প কথাটুকু যখন শেষ হল কিংশুকের তখন মেয়েটি বলল, উঠছেন কোথায়, বসুন।

আবার আশ্বাসের ইংগিত। কিংশুক বসে পড়ল চেয়ারে।

মেয়েটি আর কোন কথা বলল না। সামনের ফাইলগুলোকে টেনে নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

প্রায় পনেরো মিনিট নির্বাক বসে রইল কিংশুক। বড় রহস্যময় মনে হচ্ছে তার সমস্ত ব্যাপারটা। থাকতেই যদি দেবে তাহলে এত দেরি করছেই বা কেন! আর না দেবার মতলব থাকলে এতক্ষণ বসিয়েই বা রাখবে কেন! ভাবতে গিয়ে সব তালগোল পাকিয়ে গেল কিংশুকের।

মেয়েটির দিকে সে আড়চোখে তাকাল। নির্বিকার মুখ, ফাইলে চোখ ডুবিয়ে বসে আছে। কিংশুকের মনে হল মুখখানাতে যেন দূর বাংলা দেশের আদল।

পেছনে পায়ের সাড়া বেজে উঠতেই কিংশুক ফিরে তাকাল।

একটি সুঠাম কাশ্মীরী যুবক এগিয়ে এসে দাঁড়াল মেয়েটির সামনে। চোখমুখে প্রশান্তির ছাপ। একটিমাত্র প্রশ্নচিহ্ন আঁকা হয়ে আছে সে মুখে।

মেয়েটি নিজের সীট ছেড়ে উঠল না, কিংবা যুবকটিকেও বসতে বলল না।

শুধু কিংশুককে দেখিয়ে দিয়ে বলল, ভদ্রলোক বিপদে পড়েছেন, একটা কিছু ব্যবস্থা কর এঁর। তোমার হাউসবোটে জায়গা থাকলে অন্য কোথাও পাঠিও না যেন।

ওপরওয়ালার নির্দেশ অধস্তন পুলিস কর্মচারীরা যেমন নীরবে নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে নেয়, ঠিক তেমনি করে যুবকটি একটুখানি মাথা দুলিয়ে কিংশুককে বলল, আপনার মালপত্র টাঙ্গায় রয়েছে। টাঙ্গা ছেড়ে দিন, রাস্তার বাঁ দিকে গেলেই আমার হাউসবোট 'হানিমুন'।

কিংশুক বাইরে বেরিয়ে ভাড়া চুকিয়ে টাঙ্গাওয়ালাকে বিদায় করল।

যুবকটি ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। সে বলল, একটুখানি ভিজতে হবে আপনাকে। মালগুলো আমি তুলে নিচ্ছি শিকারায়, আপনি সাবধানে নীচে নেমে আসুন।

কিংশুক আর একবার মেয়েটির কাছে গিয়ে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে এল।

কিছু না বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মিষ্টি করে হাসল মেয়েটি।

আলোর মালায় সাজানো হাউসবোট 'হানিমুন'। ড্রইং, ডাইনিং থেকে দু'খানা বেডরুম পর্যন্ত সারা হাউসবোট দামী কার্পেটে মোড়া। নির্বাচিত পর্দা আর সজ্জিত ফুলদানিতে হাউসবোটখানা বাসর ঘরের মত সেজে আছে। মধুচন্দ্রিমার উপযুক্ত বলতে হবে হাউসবোট এই 'হানিমুন'কে।

ক্লান্ত শরীরে এত ভাল লাগার অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে আসছিল। সামান্য কিছু রাতের খাবার খেয়ে রিমঝিম বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল কিংশুক।

রাতে জ্বর এল। টেম্পারেচার উঠে গেল অনেকখানি। পরের দিন জ্বরে প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইল কিংশুক।

সন্ধ্যার দিকে ঘোলাটে চোখ মেলে জল ঢালা কাঁচের ওপারে কয়েকটি আবছা মুখের মত সে যেন দেখতে পেল।

একখানা মুখ খুব চেনাচেনা লাগছে তার। কোথায় যেন দেখেছে সে এই মুখ। স্পষ্ট মনে করতে কষ্ট হচ্ছে। খুব কোমল নীলাভ একটা আলোর নীচে স্থির হয়ে থাকা প্রজাপতির মত দাঁড়িয়ে আছে সেই মুখের মালিক।

একটা লোক কি যেন সব লিখে চলেছে। মাঝে মাঝে আর একটা লোককে কি যেন বলছে।

প্রজাপতিটা নড়ে উঠল। কার্টুন ছবির মত সব কিছু কিংশুকের চোখের ওপর থেকে নাচের ভঙ্গীতে সরে গেল।

কিংশুক চোখ বুজল। চোখ মেলতেই দেখে প্রজাপতিটা আবার কোন্ ফাঁকে ঘরে এসে ঢুকেছে।

কিংশুকের মাথায় কে যেন হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। প্রজাপতিটা রঙীন পোশাক পরা একটি মেয়ে হয়ে গেছে। মাথায় কোমল ডানার ছোঁয়া দেওয়ার মত ক্রমাগত হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। বড় চেনা মেয়েটি। কোথায় কবে যেন নিশ্চিত দেখা হয়েছিল এ মেয়েটির সঙ্গে। ভাবতে গিয়ে যন্ত্রণায় কাতর হল কিংশুক। মুখখানাতে কষ্টের ছাপ ফুটে উঠল। চোখ বন্ধ হল তার।

বেশ ক'দিন পরে জ্বর ছাড়ল। মনে হল কিংশুকের, সে যেন পুরো একটি বছর কঠিন রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

সেই যুবক, যে তাকে হোটেল ডালভিউ থেকে হাউসবোট 'হানিমুনে' এনেছে, সে এ ক'টি দিন প্রায় সারাক্ষণ রয়েছে তার সঙ্গী হয়ে। মনসুর তার নাম। মালিক আর কর্মচারী দুটি পদই তার এই হাউসবোটে। মুখে বিনীত হাসি, হাতে কাজ সারাক্ষণ।

মনসুরকে সামনে দেখেই কিংশুক বলে উঠল, ভাইসাব, তোমার হাউসবোট-খানা খুবসুরৎ জেনানা, কিন্তু এক জেনানার এজলাসে কতক্ষণ বন্দী হয়ে থাকা যায় বল?

হাসল মনসুর, ঠিক কথা, তবে মরিয়মের হুকুম না পেলে আপনাকে তো বোটের বাইরে নিয়ে যেতে পারব না সাহেব।

কিংশুক অবাক হয়ে তাকাল মনসুরের মুখের দিকে।

মরিয়ম, কই আমি তো চিনি না তাকে!

মনসুর যেন আকাশ থেকে পড়ল।

মরিয়মকে চেনেন না সাহেব, ও-ই তো আপনাকে আমার এ হাউসবোটে পাঠিয়েছে!

লজ্জা পেল কিংশুক। সত্যি 'ডালভিউ' হোটেলের সেই বাংলাভাষী কাশ্মীরী মেয়েটিকে ভুলে যাওয়া তার উচিত হয়নি। তবে দোষ বড় একটা নেই তার। সেই বৃষ্টির রাতে, অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় মেয়েটির নাম জানা বোধকরি সম্ভব ছিল না, তার পক্ষে। নিজেকে নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত ছিল সে। অপটু দেহটাকে কোনরকমে টেনে আনতে পেরেছিল এই হাউসবোটে। তার পরের ক'টা দিন তার কাছে অস্পষ্ট; এলোমেলো বৃষ্টির হাওয়ায় মুছে যাওয়া, উড়ে যাবার মত।

কিংশুক বলল, মাপ কর ভাই, নামটা জানা হয়নি ওর। মরিয়ম সে রাতে তোমার কাছে না পাঠালে শ্রীনগরের পথে পড়েই মরতে হত।

মনসুর বলল, যে কদিন আপনার তবিয়ৎ ঠিক ছিল না, মরিয়ম রোজ খবর নিতে আসত। ও-ই তো ডাক্তার দাওয়াই সব করেছে।

কিংশুকের চোখের ওপর একটা অস্পষ্ট ছবি ছায়া ফেলল, ধীরে ধীরে সে ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ডাক্তার, মরিয়ম, মনসুর সবাই তার বিছানার পাশে ভীড় করে দাঁড়িয়ে।

কিংশুক বলল, অন্ততঃ মরিয়মের কাছে যেতে দাও, তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসব।

মনসুর বলল, মরিয়মের কাছে যেতে গেলেও তার কাছ থেকে অনুমতি আনতে হবে।

হাসি পেল কিংশুকের। জীবনে নিজের অনুমতি নিয়েই পথ চলার অভ্যেস তার, অন্য কারো অনুমতি নিতে হবে, এ একেবারে তার ভাবনার বাইরে। তবু, আজ ভাল লাগছে তার কথাটা শুনতে। আড়ালে থেকে যে উপকার করে গেল তার অনুমতি নিতে হবে বইকি।

অনুমতি নেবার জন্য যেতে হল না। লাঞ্চের পর বাইরের ঘরে সোফায় গা এলিয়ে বসেছিল সে, একটা শিকারা এসে হাউসবোটের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। 'হানিমুনের' সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল যে মেয়েটি সে কিংশুকের চেনা, হোটেল ডালভিউয়ের রিসেপশনিস্ট মরিয়ম।

উঠে দাঁড়াল কিংশুক। হাত জোড় করে সকৃতজ্ঞ ভঙ্গীতে কাত করল মাথাটা।

মরিয়ম নমস্কার জানিয়ে একমুখ হেসে বলল, এখন সুস্থ বোধ করেছেন নিশ্চয়।

কিংশুক বলল, আপনার অনেক অনুগ্রহে।

মরিয়ম ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, খোদা হাফেজ। তাঁর দয়ায় আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

কিংশুক বলল, এই জ্বর নিজে যতটা ভুগলাম, তার চেয়ে অনেক বেশী ভোগালাম আপনাদের।

মরিয়ম পাশের চেয়ারে বসার উপক্রম করতে করতে বলল, এতে কারো হাত ছিল না। অসুস্থ যে কোন মানুষই সব সময় সব জায়গায় সেবা পাবার যোগ্য। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।

মরিয়ম বসল, কিংশুক তার পাশের সোফাটায় বসে পড়ল।

মরিয়ম বলল, আপনি কিন্তু ভীষণ লাকি।

এবার চমক লাগার পালা কিংশুকের।

কি রকম ?

মরিয়ম বলল, আপনি এলেন, আর রাত কাটতে না কাটতেই সাত দিনের মেঘ বৃষ্টি তুষারপাত হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ঐ যে দেখুন, সামনের পাহাড়-গুলোর মাথায় বরফ ঢেলে দিয়ে সরে গেছে বৃষ্টির মেঘ। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। জানেন, এবারের মত এত ট্যুরিস্টের ভীড় কয়েক বছরের ভেতর দেখা যায়নি। আর দু'একদিন বৃষ্টি চলতে থাকলে কাশ্মীর খালি করে সব পালাত, ভাগ্যিস রোদ্দুর উঠল।

কিংশুক বলল, ট্যুরিস্টরা থাকায় আপনাদের যেমন একটা লাভ হল, আমাদের মত সাধারণ ভ্রাম্যমানদের তেমনি কিছুটা ক্ষতি হল বইকি।

কি রকম ? মরিয়মের চোখে মুখে জিজ্ঞাসা উপচে পড়ল।

এই বলছিলাম, কাশ্মীর খালি হয়ে গেলে হোটেলের রেট কিছু কমত, তখন হয়ত হাউসবোট 'হানিমুন' থেকে হোটেল ডালভিউতে দু'একটা দিন কাটিয়ে আসা যেত।

মরিয়মের হাসি ঝক্‌ঝকে রোদ্দুরে পাতলা কাচের ভাঙা টুকরোর মত ঝিন্‌ঝিন্ করে ঝিকিয়ে বেজে উঠল।

হাসি থামলে মনসুর, মনসুর ডাক দিতে দিতে বলল, শুনে যাও, তোমার সাহাবকে তুমি খুশী করতে পারনি।

মনসুর এক ডাকে হাজির। তার চোখমুখে অবাক ছবি ফুটে উঠেছে।

কিংশুক তো অপ্রস্তুত। সে অমনি বলে উঠল, না ভাইসাব. কথাটা তা নয়, মরিয়ম আমার কথার অর্থটা ধরেছেন অন্যরকম।

মরিয়ম অমনি বলে উঠল, আমি তো মনে করেছিলাম আপনাকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছি বলে আপনি বড় রকমের একটা অভিযোগ এনেছেন।

কিংশুক এবার সশব্দে হেসে উঠল। মনসুর ছাড়া মরিয়মও সে হাসিতে যোগ দিল।

কিংশুক বলল, মনসুরভাই কিন্তু আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে।

দুটো চোখের চাহনি চড়ুই পাখির মত উড়িয়ে দিতে এববার মনসুরকে দেখে নিল মরিয়ম।

মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, কি রকম ?

কিংশুকে গলায় কৌতুকের সুর, এই যেমন, আপনার ফরমান না পেলে জেল

ফাটক থেকে কারোরই ছাড়া পাবার উপায় নেই।

মরিয়ম বলল, যাঁরা কাশ্মীরে দু'দিনের জন্য আসেন তাঁদের ভালমন্দর ভারটা থাকে আমাদেরই ওপর। তাই ইচ্ছে করলেও একটা অঘটন ঘটাতে দিই না আমরা। এখন আপনি সুস্থ হয়েছেন, কেউ আপনাকে আর বন্দী করে রাখবে না।

কিংশুক বলল, বাঁচালেন। একটু ঘুরে বেড়াতে পারলে একেবারে সুস্থ হয়ে উঠব।

মরিয়ম বলল, মনসুর, এলাম তোমার খোটে, অন্ততঃ এক কাপ কফি।

মনসুর মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিংশুক বলল, আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই।

মরিয়ম বলল, ও কথা বলবেন না খাঁটি বাঙালী হয়ে। বাংলা ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানাবার শব্দের অভাব আছে, এ আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন!

ওর কথা বলার ধরণ দেখে কিংশুকের হাসি আর যেন থামতেই চায় না। হাসতে হাসতেই বলে চলল, খুব ভুল করেছি আমি, খুব ভুল করেছি, আমার মনেই ছিল না যে আপনি অর্ধেক কাশ্মীরী আর অর্ধেক বাঙালী।

মরিয়ম কিন্তু এ কথার কোন জবাব দিল না। ভাবলেশহীন মুখ করে বসে রইল চেয়ারে।

কিংশুকের হাসি থেমেছে। সে এখন লক্ষ্য করছে মরিয়মকে। মেয়েটির মুহূর্তে ভাবান্তর ঘটে যায়। আগের মানুষটির সঙ্গে এক মুহূর্ত পরের মানুষটির কোন মিলই নেই।

কি যেন ভাবছে মরিয়ম। চোখ দুটো পেতে রেখেছে পায়ের তলায় পাতা কার্পেটের নক্সার ওপর।

কিংশুকের মনে হল, যে দু'চারটি কাশ্মীরী মেয়ে ইতিমধ্যে তার চোখে পড়েছে, চেহারায় বা আচরণে তাদের সঙ্গে কোথায় যেন বেশ কিছুটা তফাত আছে মরিয়মের। মরিয়মের যে আকর্ষণ আছে তা ওর রূপের অতিরিক্ত অন্য কিছু একটা ক্ষমতা, যা আর পাঁচটি কাশ্মীরী মেয়ের ভেতর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এসব কথা কিংশুকের মনে হচ্ছিল, আর মনে হচ্ছিল মরিয়মের বুদ্ধি ঝলকানো মুখের হঠাৎ মগ্নতাটুকু দেখে।

কফি নিয়ে এল মনসুর। মরিয়ম মুখ তুলে কফির কাপটা হাতে ধরে বলল, জানেন মিঃ মুখার্জী, বাড়িয়ে বলছি না, মনসুরের হাতে তৈরী কফির জুড়ি বোধ করি সারা কাশ্মীরে নেই।

মনসুরের দিকে তাকাল কিংশুক। গ্রীক দেবতা এ্যাপোলোর গালে যেন প্রথম অরুণের লাল আভাটুকু এসে পড়েছে বলে মনে হল তার।

এত সুন্দরও মানুষ হয়! কিংশুকের রূপের অখ্যাতি নেই, কিন্তু একটি মেয়ের উপস্থিতিতে মনসুরের সামনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকাও দারুণ অস্বস্তির ব্যাপার বলে মনে হল কিংশুকের।

মরিয়মের কথার উত্তর দিল কিংশুক, কফি তৈরীতেই কেবল অদ্বিতীয় নয় মনসুর, ওর সেবাযত্নের বুঝি তুলনা হয় না।

মনসুর এবার কাজের অছিলায় সরে গেল।

মরিয়ম মুখখানা কাত করে আড়চোখে ওর চলে যাওয়াটুকু দেখতে লাগল।

পরক্ষণেই কিংশুকের দিকে তাকিয়ে বলল, মিঃ মুখার্জী, যে কোন দিক থেকেই মনসুরের জুড়ি নেই। যত উঁচু পাহাড়ই হোক ও ধীরে ধীরে তার চূড়ায় উঠবেই। সবাই ওকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবে শুরুতে, তারপর যখন ওরা হাল ছেড়ে দিয়ে হাঁপাবে তখন দেখা যাবে সমান ধীর গতিতে মনসুর এগিয়ে চলেছে লক্ষ্যের দিকে। এ শুধু সামনের কোন পাহাড়ে ওঠা নয়, জীবনেও এমনি করে স্থির পা ফেলতে ফেলতে এখানে উঠে এসেছে। আরও উঠবে, এতটুকু ক্লান্ত না হয়ে ও অনেক ওপরে উঠবে।

কিংশুক দেখল কথাগুলো বলতে গিয়ে মরিয়ম তার চারদিকে উচ্ছ্বসিত আবেগের ঢেউ তুলছে।

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে ফেলে অথবা বলা ঠিক হয়নি ভেবে মরিয়ম চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ।

কিংশুকের মনে এই মুহূর্তে একটি পাপ জন্ম নিল। অতি সূক্ষ্ম ঈর্ষার একটা তার মস্তিষ্ক থেকে হৃদয়ের মধ্যে ব্যথার একটা ছিদ্রপথ তৈরী করে ফেলল।

সে জানে এ ঈর্ষার কোন ভিত নেই। মরিয়মের সঙ্গে কত অল্প তার পরিচয়, মনসুর তাকে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তুলেছে, তবু একটি সুন্দরী মেয়ের মুখে কোন পুরুষের অতিরিক্ত প্রশংসা যে কোন দ্বিতীয় পুরুষের মনে বুঝি সূক্ষ্ম ঈর্ষার ঢেউ তোলে।

কিংশুক তার মনের ভাব আর পাঁচটি পুরুষের মত গোপন রেখে মুখে খুশীর ভাব ফুটিয়ে বলল, আপনার কথা যে কতখানি সত্য তার কিছু প্রমাণ অন্ততঃ এ ক'দিনে পেয়েছি।

মরিয়ম আর কোন কথা বলল না। একসময় চুমুক দিয়ে কফিটুকু শেষ করে উঠে দাঁড়াল। নমস্কার করে বেরিয়ে গেল বোট থেকে।

কিংশুক মরিয়মের এই নীরবে চলে যাবার ব্যাপারে একটু বিস্মিত হল। হোটেল ডালভিউতে একবার সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারের ডাক না দিক, অন্ততঃ এখন যাই, কিংবা পরে দেখা হবে গোছের কিছু একটা কথা তো বলে যেতে পারত।

কিংশুকের মনে হল, বেজায় মুডি এই মেয়েটা।

দুপুর গড়ালে বাইরে একটু বেরোবার জন্য তৈরী হয়ে নিচ্ছিল কিংশুক, এমন সময়, মিঃ মুখার্জী আছেন নাকি, বলে বাংলা ভাষায় ডাক দিলেন এক ভারী গলার ভদ্রলোক।

কিংশুক তো অবাক। এখানেও বাঙালীর আক্রমণ!

সে তাড়াতাড়ি মাথার অবাধ্য চুলগুলোকে চিরুনির তীব্র ক'টা টানে শায়েস্তা করে বেরিয়ে এল ড্রইংরুমে।

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসেছিলেন চেয়ারে, তাঁর একটু দূরে একটি মেয়ে সোফায় বসে ফিল্ম্ ফেয়ারে চোখ ডুবিয়ে।

অপরিচিতকে দেখে যতটুকু বিস্ময় চিহ্ন ফোটে চোখে ততটুকু ফুটিয়ে তুলে নমস্কার করল কিংশুক।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, চিনতে পারলেন না, অবশ্য যে রকম বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন তাতে না চেনারই কথা। আমি ডাক্তার সান্যাল।

কিংশুকের মুখ একমুহূর্তে কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল।

আপনি কষ্ট করে এসেছেন, আমিই মনসুরের কাছ থেকে আপনার ঠিকানা নিয়ে চেম্বারে দেখা করে আসব ভেবেছিলাম।

ডাক্তার সান্যাল হেসে বললেন, চেম্বারে কেন, বাড়িতে চলুন। ঐ আমার মেয়ে বিতস্তা, আপনাকে কিন্তু ও-ই আবিষ্কার করেছে প্রথম। আমি আপনাকে বাঙালী রোগী হিসাবে জেনেছিলাম, আর আমার মেয়ে আপনাকে জেনেছে শিল্পী হিসাবে। আপনার নাম আমার মুখে শুনেই ও বলেছে এই অদ্ভুত নামে একটি মাত্র আর্টিস্ট আছেন। কাগজে ও আপনার এগজিবিসানের ছবি দেখেছে।

মেয়েটি ফিল্ম্ ফেয়ার থেকে চোখ সরিয়ে এক মুখ হাসির সঙ্গে চোখ বিস্ময় ফুটিয়ে বলল, মোটেই আমি 'অদ্ভুত' কথাটা ব্যবহার করিনি বাবা।

ডাক্তার পিতা হাসলেন।

কিংশুক বলল, যদি বলতেনও তাহলে অন্যায় হোত না। কিংশুক নামটা, শুনে শুনে অভ্যস্ত নামাবলীর ভেতর পড়ে না। তাই কিছুটা অদ্ভুত বই কি!

মেয়েটি মিষ্টি করে হেসে বলল, তাহলে আমার নামটাও আপনার বিচারে অদ্ভুতের কোঠায় গিয়ে পড়বে। নামটা নিশ্চয়ই আপনার অনেকদিনের শোনা নয়।

কিংশুক হেসে বলল, এই প্রথম!

ডাক্তার সান্যাল বললেন, ওর মায়ের দেওয়া নাম। ঝিলমের ধারে আমার বাড়ি, ওর জন্ম থেকে ঐ নদী দেখছে ও। তাই ওর মা মেয়ের নাম দিলেন বিতস্তা। ঝিলমের পোশাকী নাম ওটি।

বিতস্তা হেসে বলল, সিন্ধুর পঞ্চসখীর এক সখী আমি।

কিংশুক বলল, আমার নামটা কমন নয় ঠিক কিন্তু নামের ভেতরে নিন্দার ভাগই বেশী।

বিতস্তার গলায় বিস্ময়, কি রকম!

কিংশুক বলল, আমার নামের অর্থ হল পলাশ। ঐ গাছের ফুলের শুধু বাহারই আছে, গন্ধ নেই বলে আদরও নেই।

ডাক্তার সান্যাল মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, একেবারে ভুল ধারণা। পলাশের মত উপকারী বৃক্ষ বড় একটা দেখা যায় না। আমাদের দেশের লাক্ষা শিল্পটি প্রধানতঃ পলাশ গাছকে নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে। এর বীজ, ছাল, আঠা সবই নানা ধরণের ওষুধের উপকরণ। হিন্দুশাস্ত্র মতে পলাশ অত্যন্ত পবিত্র বৃক্ষ। যাগযজ্ঞ হোমে উপনয়নে পলাশের কাঠ নইলে চলে না। এ হেন

পলাশকে বলছেন কিনা গুণহীন।

কিংশুক অবাক হয়ে বলল, দারুণ একখানা কথা বলেছেন তো। আত্মরক্ষার একটা অমোঘ অস্ত্র পাওয়া গেল।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, বাইরে বেরোবার উদ্যোগ করছিলেন বলে মনে হচ্ছে, চলুন আমার ডেরায়। সান্ধ্যভ্রমণ আর সান্ধ্য চা দুটোরই ব্যবস্থা হবে।

কিংশুক বলল, এ ক'দিন একরকম নজরবন্দী হয়েই ছিলাম, আজ স্বয়ং ডক্টর সান্যাল মুক্ত করে নিয়ে যেতে চাইছেন। এ সুবর্ণ-সুযোগ কি কখনো ছাড়া যায়।

বিতস্তা হাসির ঢেউ তুলে উঠে দাঁড়াল।

ওরা বেরিয়ে পড়ল শিকারায় চেপে।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, পায়ে চলার পথে কিন্তু আমরা অনেক আগেই যেতাম, তাতে অবশ্য আপনি কিছু দেখতে পেতেন না। তাই অনেকটা জলের পথ কেটে আমরা এগোব।

বিতস্তা বলল, বেলা পড়ে এসেছে, চলুন ডালের জলে আলোর খেলা দেখবেন। তারপর ফিরব আমরা ঝিলমের পথে।

শিকারায় যেতে যেতেই চোখে পড়ল হোটেল ডালভিউ। কিংশুক উৎসুক চোখে ওদিকে তাকিয়ে বলল, আমার আসার দিনে যে বিপর্যয়ের ভেতর পড়েছিলাম, তাতে ডালভিউ হোটেলের রিসেপশনিস্ট মেয়েটির সঙ্গে দেখা না হলে প্রাণ বাঁচানই দায় হত।

বিতস্তা অদ্ভুত চোখ মেলে তাকাল কিংশুকের দিকে।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, মরিয়মই তো আপনার অসুখের খবর নিয়ে গিয়ে আমাকে চেম্বার থেকে প্রায় টেনে এনেছিল। ওর চোখে মুখে কথাবার্তায় সে কি উদ্বেগ। আমি তো প্রথমটায় ভাবলাম, বুঝি ওর একেবারে আপনার কেউ সাংঘাতিক কোন অসুখে পড়েছে।

কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল কিংশুকের মন।

বিতস্তা বলল, সব কিছুতেই ওর বাড়াবাড়ি। কলেজ থেকে আমরা যখন পিকনিকে কোথাও যেতাম তখন রান্না, পরিবেশন, সব কিছুর ব্যাপারে ওর ঝাঁপিয়ে পড়া চাই। কারো কাজ ওর পছন্দ হয় না, নিজের হাতে সব করা চাই।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, অপরিচিত ভদ্রলোকের জন্য সেদিন মরিয়ম যা করেছে তাতে প্রশংসা না করে পারা যায় না বিতস্তা।

আমি তার নিন্দে করছি না বাবা, শুধু নিজে সব কিছু করব, এ ধরণের একটা মনোভাব ওকে পেয়ে বসেছে। জানেন কিংশুকবাবু, ও দারুণ খেয়ালী। কলেজ থেকে বেরিয়ে উঠে পড়ে লেগে ও ট্যুরিস্ট অফিসের একটা বড় চাকরী যোগাড় করল। তার ক'দিন পরেই ওপরওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে কাজটা ছেড়ে দিল। এখন শালিমারবাগের পাশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাঠশালা বসিয়েছে।

কিংশুক বলল, পাঠশালা চালায় কখন আর হোটেলের কাজই বা করে

কখন ?

বিতস্তা বলল, বোধহয় পার্ট টাইম কাজ করে ও হোটেল। ইংরেজীটা ভালই বলে, আদবকায়দা কেতাদুরস্ত, তাই ওয়েস্টার্ন স্টাইলের হোটেলে সহজেই চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, এ সবই কিন্তু মেয়েটির গুণ।

বিতস্তা গম্ভীর গলায় বলল, তুমি আমাকে ভুল বুঝনা বাবা।

কথাগুলো এলোমেলো ঘূর্ণি হাওয়ার রূপ নিচ্ছে দেখে কিংশুক একেবারে হাওয়া বদল করে দিলে।

সত্যি কি সুন্দর সূর্যাস্তের ছবি। আপনি ঠিকই বলেছিলেন বিতস্তা দেবী।

ডাক্তার সান্যাল হেসে বললেন, আপনার চেয়ে অনেক ছোট ও, নাম ধরেই ডাকবেন।

কিংশুক হেসে ববল, ঠিক আছে, তবে আপনার চেয়ে অনেক ছোট আমি, তাই আমাকেও নাম ধরেই ডাকবেন।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, আমিও তাই ভাবছিলাম এতক্ষণ।

বিতস্তা বলল, দেখুন, পীরপাঞ্জাল মাথায় বরফের হীরা ঝলকানো মুকুট এঁটে কেমন জলের আয়নায় নিজের চেহারা দেখছে।

কিংশুক সেদিকে কতক্ষণ আর চোখ ফেরাতে পারল না। জলের রঙ প্রায় এক হয়ে গেছে। জলের বুকে আর আকাশের বুকে যেন সমজ পীরপাঞ্জাল পরস্পরকে তাকিয়ে দেখছে।

কিংশুক বলল, দেখবার মত ছবি।

শিকারা ভেসে চলেছে। চারদিকে থৈ থৈ করছে ডালের জল। সাতদিন একটানা বৃষ্টি আর বরফ পড়ার ফলে সমুদ্র-সবুজ রঙ নিয়ে ডাল চোখের দৃষ্টিকে ঘন ঘন কেড়ে নিচ্ছে। শেষ বেলায় রোদটুকুতেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জলের তলা থেকে উঠে আসা লম্বা লম্বা জলজ উদ্ভিদ। কিংশুক মুখ নীচু করে দেখতে লাগল। জলের তলাটা যেন মুক্তাঙ্গন। অতি হাল্‌কা সবুজ পোশাকে নিজেদের সাজিয়ে সারি সারি জলজ উদ্ভিদ হেলেদুলে নেচে চলেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে রুপোলী মাছ এঁকে বেঁকে চলেছে তাদের পাশ কাটিয়ে। ডালের জল ঠিক যেন সবুজের আভা লাগা একখণ্ড স্বচ্ছ কাঁচ।

কিছুক্ষণের ভেতরেই সূর্যের রঙ পাল্‌টে গেল। লালের ছোঁয়া লাগল ডালের জলে। শিকারার সামনে দেখা গেল কয়েকখানা নৌকো এগিয়ে আসছে। কিংশুক দেখল, ছোট ছোট নৌকোয় বোঝাই হয়ে আছে অজস্র ফুল পাতা ঘাস। মেয়েরাই চালিয়ে নিয়ে আসছে সে নৌকো। এক সুরে গান ধরেছে তারা। মনে হল গ্রীষ্ম দিনের পদ্মগুলো শরতে কাশ্মীরী কন্যার মুখ হয়ে ফুটে উঠেছে!

ওরা হাসি ছড়াতে ছড়াতে হাওয়ার গান ওড়াতে ওড়াতে চলে গেল।

বিতস্তা বলল, দেখুন দেখুন কিংশুকদা, জলের ওপর তাড়া খেয়ে জল-পিপিগুলো কেমন উড়ে যাচ্ছে।

কিংশুক দেখল, পাখিগুলো জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে, আর তাদের পাখার ছড়ানো ছিটানো জলবিন্দুগুলো ঠিক মন্তোর দানার মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সত্যি চোখ ফেরানো যায় না।

কিংশুক বলল, তোমাকে একশোবার প্রশংসা না করে পারছি না বিতস্তা। এমন একখানা ছবি দেখালে, যা দেখে সারাটা জীবন অতৃপ্ততে ভরে থাকবে।

বিতস্তার চোখে বিস্ময়। বলল, ভাল লাগেনি আপনার ছবি। সারাজীবন অতৃপ্তিতে ভরে থাকবে বলছেন।

কিংশুক হেসে বলল, তৃপ্তি পেলেই তো সব ফুরিয়ে গেল। যার জন্যে কলকাতায় বসে মনটা শূন্য হয়ে যাবে, এমন ছবিই তো চিরদিনের। আজকের এই ডালের জল, পীরপাঞ্জাল, শেষ সূর্যের সোনা, নৌকোবিহারিণী মেয়েরা, এমনকি ঐ জলপিপির ঝাঁক আমাকে বারবার কাশ্মীরে আসার জন্যে অলিখিত নিমন্ত্রণ জানাবে।

বিতস্তা অমনি বলে উঠল, তাহলে তো দারুণ মজা হবে।

কিংশুক বলল, কেন ?

বিতস্তা বলল, আপনাকে বারবার কাশ্মীরে আমাদের মধ্যে পাওয়া যাবে।

কথাটা বলেই কিন্তু বিতস্তা লজ্জা পেয়ে গেল। কিংশুকের সঙ্গে আলাপ তার সবে শুরু, তাছাড়া বাবা রয়েছেন একই শিকারায়। পরিস্থিতিটা এ ধরনের উচ্ছ্বাস প্রকাশের অনুকূল নয় বলে মনে হল বিতস্তার।

কিংশুক বলল, সঞ্জীবচন্দ্র প্রতিবেশীদের দুরাত্মা বলেছেন, কিন্তু বাংলাদেশের বাইরের বাঙালীদের পরম সজ্জনের সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন। বেড়াতে বেরোলেই সে পরিচয় পাওয়া যায়।

আবার বিতস্তা প্রগলভ হয়ে উঠল, আমরা কিন্তু মোটেও ভাল মানুষ নই।

হাসল কিংশুক। বলল, বাঙালীর দেখা পাব এ আশা নিয়ে তো আসিনি, তাই ভালমন্দর বিচারও করব না, নির্ভয়ে থাকতে পার।

ডালের গেট পেরিয়ে শিকারা এসে ঢুকল ঝিলমে। কিছু পথ পেরিয়ে এসে নামল ওরা যে জায়গায় সেখানে চিনার গাছে তাল তাল অন্ধকার বাসা বেঁধেছে। একটু দূরে একটা ল্যাম্পপোস্ট চাল্‌সে পড়া চোখে তাকিয়েছিল।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, একটু সাবধানে এসো কিংশুক, পথটা উঁচু নীচু, তাছাড়া আলোটাও নদীর ধার অবধি এসে পৌঁছয় না।

একটু দূরেই ডাক্তার সান্যালের আস্তানা। কিংশুকের আলাপ হল ডাক্তার সান্যালের স্ত্রীর সঙ্গে। কিছুক্ষণের ভেতরে আপনি তুমির পাট চুকলে শ্রীমতী সান্যাল প্রস্তাব করলেন, আমার এখানে এসে উঠতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে তাহলে সংকোচ না করে চলে এসো, আর যদি অস্বস্তি বোধ কর তাহলে রোজ অন্তত একবার করে চায়ের আসরে এসো।

কিংশুক দেখল বিতস্তা তার মুখের ওপর আগ্রহে ভরা দুটো বড় বড় চোখ পেতে বসে আছে। সে চোখে কি করুণ মিনতির কোন ছবি দেখতে পেল কিংশুক।

ও বলল, আপনার স্নেহের ডাক এড়িয়ে যাবার সাধ্য আমার নেই, তবে বেড়াতে এসে কাউকে বিব্রত করার ইচ্ছেও নেই আমার। কখন্ কোথায় বেড়িয়ে বেড়াব, ঠিক থাকবে না তার। সময়ের হিসেব কষে ঘোরাফেরা করাও অসম্ভব। আপনাদেরও ঝক্কি পোহান আর আমারও তটস্থ হয়ে থাকা। তার চেয়ে রোজ পারি আর না পারি, ঘন ঘন চায়ের আসরে হাজির থাকার চেষ্টা করব, কথা দিচ্ছি।

সেদিন অনেক গল্পগুজব, বাংলাদেশের অনেক কথা হল, শেষে যখন কথায় কথায় প্রহর গড়িয়ে গেল তখন চেম্বার থেকে ফিরে ডাক্তার সান্যাল কিংশুককে না খাইয়ে ছাড়লেন না।

ফেরার পথে কিছুটা এগিয়ে টাঙ্গার ব্যবস্থাও করে দিলেন।

ডালভিউ হোটেলের সামনের পথে টাঙ্গা আসতেই কিংশুক নেমে পড়ে ভাড়া চুকিয়ে দিলে। টাঙ্গা চলে যেতেই পায়ে হাঁটতে লাগল কিংশুক।

সেই মুহূর্তে তার বিতস্তার কথা মনে পড়ছিল না। ডাক্তার সান্যালের কৌতুক কিংবা মিসেস সান্যালের সস্নেহ আদর যত্নও নয়। তার চোখের ওপর একটি ছবি ফুটে ওঠার স্বপ্নই সে দেখছিল, সে ছবি মরিয়মের। সকালে মেয়েটি হাউসবোটে এসেই হঠাৎ কথার মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে চলে গেল। মেয়েটিকে তাই আবিষ্কারের একটা নেশায় পেয়ে বসল কিংশুকের।

পথ থেকে একটা বারান্দা আর দুটো দরজা পেরিয়ে রিসেপশান রুম। পথে দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করল কিংশুক। না, মরিয়মকে দেখা গেল না তার নির্দিষ্ট চেয়ারে আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে বসে থাকতে।

কিংশুক পায়ে পায়ে সরে যাবারই মনস্থ করল, কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আবার পথের ওপর থমকে দাঁড়াল। মরিয়মকে দেখে যাবার প্রবল একটা আগ্রহ তাকে টেনে আনল হোটেল ডালভিউয়ের বারান্দায়।

ওয়েটার যাচ্ছিল বারের দিকে, কিংশুক তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল মরিয়মের কথা।

ওয়েটার যা বলল তার অর্থ হল, বারে ড্যান্স হচ্ছে, মরিয়ম বসেছে পিয়ানোতে। অবশ্য মরিয়মও নাচে যোগ দেবে। এখন ওকে রিসপশান রুমে পাওয়া অসম্ভব।

ওয়েটার চলে গেল। হোটেল থেকে নেমে এল কিংশুক। একটা অতি মৃদু যন্ত্রসংগীতের সুর তার কানে এসে বাজছিল। পরমুহূর্তে পীরপাঞ্জালের দিক থেকে একটা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া তার গরম পোশাক ভেদ করে একেবারে বুকের হাড়ে গিয়ে বিঁধল। শীত তার নির্মম শাসন চালাচ্ছিল সারা কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে। অক্টোবরের মাঝামাঝি এত বরফ কাশ্মীরে দেখা যায় না। শ্রীনগরের পথের ধারে ধারে বরফের চাঁই এখনও পড়ে রয়েছে। ভোরবেলা হাউসবোটের ছাদে সাদা পুরু একখানা চাদর কে যেন বিছিয়ে দিয়ে যায়।

কিংশুক প্রায় জনশূন্য পথের ওপর দিয়ে হাঁটছিল। মন জুড়ে তার কয়েকটি প্রশ্নের কলধ্বনি।

মরিয়ম কি ক্যাবারে গার্লের কাজও করে নাকি! পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের সেই ব্যক্তিত্বময়ী মেয়েটি তা হলে হোটেলবাসীদের চিত্ত বিনোদনও করে!

আবার ভাবল কিংশুক, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন অতি বিচিত্র। যে মেয়েটি এক অসুস্থ মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়ে তার গভীর শ্রদ্ধা কেড়ে নিল, তাকেই আবার দেখা গেল কয়েকটি অপ্রকৃতিস্থ মানুষের ক্ষুধার্ত চোখের সামনে নিজেকে অবলীলায় বিলিয়ে দিতে।

কিংশুকের মনে সূক্ষ্ম একটা দুঃখবোধ জন্ম নিয়ে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে লাগল। হাউসবোটে পৌঁছে বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে তার কেন যেন মনে হল, সে এক পরাভূত সম্রাট। বিরাট এক যুদ্ধ জয়ের সমস্ত পরিকল্পনা শুরুতেই বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।

ভোরবেলা নতুন জন্ম হল কিংশুকের। সে এখন হঠাৎ উড়ে আসা কাশ্মীরের সুন্দর পাখিগুলোকে আর আমন্ত্রণ জানাবে না, অবাক চোখে তাকাবে না, তাদের কোমল পাখার তলায় শুয়ে রঙীন স্বপ্ন বুনবে না।

মনসুরকে বলল কিংশুক, ড্রাই ফুড দিয়ে দাও আমার ব্যাগে,পহেলগাঁও রওনা হব এখুনি।

মনসুর মাথা চুলকে বলল, সাহাব, খাবার রেডি করে দিতে আমার বেশী সময় লাগবে না, তবে আপনি কি কাল বাসের টিকিট কেটে এনেছেন?

কিংশুক বলল, স্ট্যাণ্ডে গেলে অনেক বাস মিলে যাবে। পহেলগাঁও-এর বাসে চেপে বসলেই হল।

মনসুর বলল, শুনেছি, দুদিনের জন্যে পহেলগাঁও-এর বুকিং ফুল হয়ে আছে।

কিংশুকের গলায় বিস্ময় বেজে উঠল, ফুল হয়ে আছে, তবে উপায়!

মনসুর বলল, ট্যাক্সিতে যেতে চাইলে তার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

কিংশুক জানে, এখুনি অনেকগুলো টাকা তাকে গুণে দিতে হবে, তাহলেও মনের ইচ্ছাটুকুকে সে পূর্ণ করবেই। তাই বলল, তুমি ট্যাক্সি নিয়ে এসো, আমি আজই যেতে চাই।

ট্যাক্সি চলেছে। ঊর্ধ্বমুখী পপ্‌লার গাছগুলো মাথায় এখনও কিছু কিছু পাতা জাগিয়ে রেখেছে। কাণ্ডের রঙগুলো লক্ষ্য করছিল কিংশুক। সাদা আর হাল্‌কা বাদামী রঙ পর পর পাকে পাকে উঠে গেছে।

থামাও, থামাও।

ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে গেল। কিংশুক কিন্তু নামল না। ঝুলি থেকে সে খাতা বের করে দুটো হাঁটুর ওপরে রেখে স্কেচ করতে লেগে গেল। সামনে অগণিত ভেড়ার পাল। তার মাঝে ঝোলা ফারাণ পরা যীশুখৃষ্ট যেন এগিয়ে আসছেন। বুকে চেপে ধরে আছেন একটি সাদা মেষশাবক।

মেষপালকের সঙ্গে সঙ্গে মেষগুলো চলে গেল। শিল্পী কিংশুক মুখার্জীর স্কেচে কিন্তু সেগুলো বন্দী হয়ে রইল।

ট্যাক্সি চলেছে। পথের দুধারে জাফরাণের ক্ষেত। ভায়োলেট শাড়ি বুনে কে যেন বিছিয়ে রেখে দিয়েছে মাঠে মাঠে। কাজ করছে মেয়ে পুরুষে মিলে। দূরে পাহাড়ের মাথায় গুজর মেয়েরা ঘড়া ঘড়া দুধ ঢেলে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

পাহাড়ে উঠেছে গাড়ি, এক একটা বাঁক পেরোলেই এক এক রকমের ছবি ফুটে উঠছে।

উপল ছড়ানো ছোট নদীর বাঁকে বাঁকে দুতিনটি করে পাইন গাছ দাঁড়িয়ে। থাকে থাকে সবুজ পাতার মন্দির গড়েছে যেন। ওদিকে ঘাসের বোঝা পিঠে নিয়ে এগিয়ে এলো একদল মেয়ে। ওরা থেমে থাকা ট্যাক্সি আর তার আরোহীর দিকে একবার তাকালো, তার পর দ্রুত চলে গেল আঁকা বাঁকা পাহাড়ী পথ নেমে।

স্কেচ করে যাচ্ছে কিংশুক। অফুরন্ত নেশায় বিভোর হয়ে সে যেন কাজ করে চলেছে। মেয়েগুলো তার হাতের জাদুতে গতিশীল ঝর্ণা হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তে।

পহেলগাঁও-এ পেঁছে ট্যাক্সি থেকে নামল কিংশুক। এখন ঘণ্টা চারেক সে কাটাবে এখানে। রঙ তুলি সঙ্গে নিয়ে ড্রাইভারকে আরাম করতে বলে বেরিয়ে পড়ল সে।

লীডার নদীর উপল ছড়ানো কূলে ও নেমে গেল। অনেক নীচে নেমে এসে পেছন ফিরে দেখল ও। গভর্নমেণ্ট রেস্ট হাউসের ওপারে পাইন বন। তার মাথায় বহু দূর প্রসারিত তুষার পাহাড় জেগে আছে। বরফ যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে অতি হালকা বেগুনীর আভা; ক্রমশঃ একটা অস্পষ্ট পিঙ্ক রঙের সঙ্গে মিশে গেছে ভায়োলেট রঙটা। তারপর ঝলমল করছে উজ্জ্বল সাদা রঙ। নীল আকাশের তলায় সাদা বরফ যেন কেটে বেরিয়ে এসেছে।

কিংশুক দেখল আর একটা জগৎ ওরই ভেতর ফুটে উঠেছে। সবুজ পাইন বনের পরে ভায়োলেট আর পিঙ্কের রাজ্যে আর একটা অস্পষ্ট রেখার পাইন অরণ্য। মাথায় নেই পাতার সমারোহ, শুধু ধূসর কয়েক সারি কাণ্ড পটে আঁকা ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। একটা যেন আশ্চর্য রহস্যময় রাজ্যের সন্ধান দিচ্ছে তারা।

রঙ ছড়িয়ে ছবি আঁকতে লাগল কিংশুক। হুবহু ছবি সে কখনো আঁকে না, তাই বারবার তাকাতে হয় না তাকে সাবজেক্টের দিকে। সে পাইন বন আর তুষার পাহাড় রঙের তুলি বুলিয়ে আঁকল। তারপর সরু নিবের আঁচড়ে সৃষ্টি করল এক স্বপ্নময় জগৎ।

ছবি শেষ করে ঝোলায় ভরে কিংশুক এসে বসল লীডার নদীর একটা বড় পাথরের চাঁইয়ের ওপর। লীডারের আসল নাম নীল গঙ্গা। কিংশুকের মনে হল নামটা যথার্থই দেওয়া হয়েছে। ওপরের নীল আকাশটা যেন তরল স্রোত হয়ে পাহাড়ের বুকে এঁকে বেঁকে নেমে চলেছে।

খাবার বের করে খেতে লাগল কিংশুক, আর লীডার নদীর ওপারের বরফের

পাহাড়টাকে মাঝে মাঝে দেখতে লাগল।

মিঃ মুখার্জী ?

পিছনে তাকিয়ে কিংশুক দেখল, কিছু দূরে একটি মেয়ে। উৎরাইয়ের টাল নিপুণভাবে সামলাতে সামলাতে এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

কাছে এসে দাঁড়াল মরিয়ম।

কিংশুক কি খুশী হল সেই মুহূর্তে ? যে পাতাখানা সে ডাল হ্রদের জলে আজ সকালেই ফেলে দিয়ে এসেছিল, সে পাতাটা হঠাৎ ভাসতে ভাসতে কি করে নেমে এল নীল গঙ্গার স্রোতে।

এক রাশ কথা নিয়ে এসেছিল মরিয়ম, কিন্তু কিংশুকের চোখে মুখে উৎসাহের অভাব দেখে থেমে গেল ও।

শুধু বলল, একাই এসেছেন, না ডাক্তার সান্যালেরাও রয়েছেন ?

কিংশুক অবাক হল। ডাক্তার সান্যাল আর বিতস্তার সঙ্গে শিকারা-বিহারের কথা তাহলে কানে গিয়েছে মরিয়মের। কে দিল ওকে এ খবর। মনসুরই জানে। কথায় কথায় ও-ই মরিয়মকে বলে থাকবে।

কিংশুক বলল, আমার সঙ্গে আর কাউকে না দেখে নিরাশ হলেন নিশ্চয়।

মরিয়ম দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ম চোখে দেখছিল কিংশুককে।

বলল, না, আশা নিরাশার কথা নয়, কাল শেষ বেলায় শিকারায় যেতে দেখলাম আপনাদের, তাই বলছিলাম।

কিংশুক এবার সুর পাল্টে বলল, আপনি তো দারুণ মেয়ে দেখছি, দেখেও একবার ডাক দিলেন না।

মরিয়ম এখন সহজ হতে পারবে। সে কিংশুকের পাশাপাশি একটা পাথরের ওপর বসল।

বলল, মিঃ হিথের তখন আমার ছবি তোলার নেশায় পেয়ে বসেছিল। আমাকে হোটেলের পাশে জোড়া পপলার গাছের ফাঁকে দাঁড় করিয়ে নানা এ্যাঙ্গেল থেকে ছবি নেওয়া হচ্ছিল, আর ঠিক সেই সময় আপনাদের শিকারা আমাদের হোটেল পাস করে চলে গেল।

কিংশুক বলল, বলুন তো আমি তখন কোনদিকে তাকিয়েছিলাম ?

মরিয়ম বলল, হোটেলের দিকে চোখ ছিল আপনার।

কিংশুক বলল, এখন বলুন তো দেখি কেন আমি হোটেলের দিকে তাকিয়েছিলাম ?

মরিয়ম একটু ভেবে বলল, প্রথম রাতের বিপর্যয়ের কথা মনে করে।

কিংশুক বলল, এমনও তো হতে পারে, যিনি ঝড়ের রাতে বাতিঘরের নিশানা দিয়েছিলেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায়।

মরিয়ম কথা পাল্টে নিয়ে বলল, বড় কালচার্ড মেয়ে বিতস্তা, তাই না ?

কিংশুক বলল, এখনও আমি তার এতটা পরিচয় পাই নি। তবে একটি মেয়ে যখন অন্য একটি মেয়ের প্রশংসা করে তখন আমি প্রশংসাকারিণীর ভেতরই সত্যিকারের কালচার দেখতে পাই।

মরিয়ম প্রখর বুদ্ধি রাখে। সে মুহূর্তে ধরে ফেলল কিংশুকের ইংগিত। দুটো চোখ বিদ্যুৎ ঝলকের মত ঝিলিক দিয়ে উঠল তার। কিংশুকের চোখে বড় সুন্দর লাগল মরিয়মের চোখের এই ছবি।

আবার শান্ত হয়ে গেছে মরিয়ম। বড় শীতল বলে মনে হচ্ছে এখন তাকে। দূরের পাহাড়গুলোর দিকে চোখ রেখে সে তলিয়ে গেছে নিজের ভেতর।

কিংশুক এক সময় শীতলতা ভেঙে বলল, আপনার অনেক গুণ। নাচতে বাজাতে আপনি সমান দক্ষ।

মুহূর্তে চোখে অবাক চাহনি আর মুখে মিষ্টি হাসি টেনে মরিয়ম বলল, আমার সব গুণের কথাই তাহলে জানা হয়ে গেছে আপনার!

কিংশুক বলল, কাল ইচ্ছে ছিল আপনার পিয়ানো শোনার, কিন্তু বারে ঢোকার রেস্ত ছিল না, তাই মনের ইচ্ছে মনে চেপে রেখেই ফিরতে হয়েছে।

আপনি ড্রিঙ্ক করেন?—সোজা প্রশ্ন করে বসল মরিয়ম।

উল্টো প্রশ্ন করল কিংশুক, কি মনে হয় আপনার?

না, আর যাই করুন, ড্রিঙ্ক করেন বলে তো মনে হয় না।

যারা ড্রিঙ্ক করে তাদের আপনি চিনতে পারেন?

হাসল মরিয়ম, বলল, মাছ না দেখে শুধু মাছের গন্ধ শুঁকে মেছুনীরা বলে দিতে পারে কি মাছ। তেমনি ড্রিঙ্ক যারা করে তাদের দেখলেই আমরা অনায়াসে বলে দিতে পারি।

কিংশুক গলায় বিদ্রুপের সুর মিশিয়ে বলল, এ আপনার অশেষ অভিজ্ঞতার ফল।

মরিয়ম কিংশুকের শ্লেষটুকু বুঝে নিয়ে বলল, দেখুন মিঃ মুখার্জী, এখন যদি বলি ড্রিঙ্ক আমি করি না, তাহলে নিশ্চয়ই আমার ওপর আপনার বিশ্বাসটুকু রাখা কষ্টকর হবে। তাই ও প্রসঙ্গের ইতি এখানেই টানতে চাইছি। তবে একটা কথা আমার মনে হয়, পৃথিবীতে যারা মানুষ চিনেছি বলে বড়াই করে সবচেয়ে বোকা বোধ করি তারাই।

পরিস্থিতিটাকে একেবারে লঘু করে দিয়ে বলল কিংশুক, পাহাড়ী জায়গায় বড় তাড়াতাড়ি ক্ষিদে পেয়ে যায়, কিছু যদি মনে না করেন তাহলে সামান্য যা আছে তাই বের করি।

মরিয়ম এতক্ষণে সহজ হল। সে অমনি হেসে বলল, দেখি শাহানশার ভাণ্ডারে কি আছে!

কিংশুক বলল, মাখন রুটি সবে খেতে শুরু করেছিলাম, এখনও ফলের ভেতর কলা আর আমিষের ভেতর ডিম সেদ্ধ দুটো আছে। আপনি এর থেকে কিছু নিলে খুশী হব।

মরিয়ম বলল, দাঁড়ান আসছি।

এই বলে সে পা চালিয়ে ওপরে ট্যুরিস্ট বাংলোর দিকে উঠে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল হাতে একটা টিফিনের কৌটো নিয়ে।

কৌটো খুলতেই বেরোল ফিস ফ্রাই আর স্যাণ্ডউইচ।

মরিয়ম বলল, আসুন ভাগ করে খাই।

কিংশুক নিজের প্যাকেট মরিয়মের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, আমাকে প্রথম অতিথি আপ্যায়নের সুযোগ দিন।

মরিয়ম একটি ডিম সেদ্ধ তুলে নিয়ে বলল, এবার আমার থেকে আপাততঃ একখানা ফিসফ্রাই তুলে নিন।

কিংশুক তাই করল।

মরিয়ম বলল, ডিম আমার অত্যন্ত প্রিয়।

কিংশুক বলল, ফিসফ্রাই আমার মাংসের কাটলেটের চেয়েও ভাল লাগে।

দুজনের ঐ দুটো বস্তু খাওয়া শেষ হলে কিংশুক বলল, আসুন, এবার দুজনের সংগ্রহ মিশিয়ে ফেলা যাক।

মরিয়ম মহা খুশী। বলল, দারুণ পরিকল্পনার মাথা আপনার। দিন, আমার হাতে আপনার খাবারগুলো দিন।

কিংশুকের হাত থেকে খাবারগুলো নিয়ে নিজের কৌটোটা ভরে ফেলল মরিয়ম।

এবার ভরা কৌটোখানা কিংশুকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এখন এটা রাখুন আপনার জিম্মায়। ইচ্ছে মত সদ্ব্যবহার করুন।

কিংশুক মাথা নেড়ে বলল, কোন কিছুর দায়িত্বই ঘাড়ে নিইনি এখনও, আপনার কৌটোর দায়িত্ব নেওয়াও তাই সম্ভব নয়। ওটা আপনার জিম্মাতেই রইল। ইচ্ছে হলে ওর থেকে কিছু প্রসাদ দিতে পারেন।

ওরা দুজনে হাসি গল্পের ভেতর খাবারগুলো শেষ করে ফেলল।

খাওয়া শেষ হলে কিংশুক বলল, একা একাই এলেন বেড়াতে?

মরিয়ম বলল, পহেলগাঁও আমার পাঁচশো বার দেখা হয়ে গেছে। হোটেল থেকে বাস ভাড়া করে হিপিদের এক পার্টি এসেছে, তাদের গাইড হয়ে আসতে হয়েছে আমাকে।

কিংশুক বলল, হিপিদের সঙ্গে সময়টা হৈ হৈ করে কেটে যাবে।

মরিয়ম বলল, পনেরোটা দিন জ্বালিয়ে মারছে। হোটেলের প্রোপ্রাইটার পয়সা লুটছেন, তাই খাতিরের অন্ত নেই। সব ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে আমাকে।

কিংশুক বলল, আমি কিন্তু আজ বাসে টিকিট না পেয়ে ট্যাক্সি করে এসেছি।

মরিয়ম বলল, আমি দেখেছি। টুরিস্ট বাংলোর বাইরে বসেছিলাম, আপনার ট্যাক্সি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

কিংশুক বলল, আমাকে চিনতে পেরেছিলেন?

মরিয়মের মুখে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, আপনার চেহারা বোধহয় এড়িয়ে যাবার নয়।

কিংশুক বলল, কাশ্মীরের মানুষের মুখে আমাদের প্রশংসা শুনলে বিশ্বাস করতে সময় লাগে।

হাসল মরিয়ম। বলল, একদিনে বেশী প্রশংসাবাক্য আর শোনাব না। এখন চলি, পরে শ্রীনগরে দেখা হবে।

মরিয়ম একটুখানি গিয়েই ফিরে এল। এসেই বলল, দেখুন, জিজ্ঞেস করব

বলে ভুলে গিয়েছিলাম কথাটা ; এখন মনে পড়েছে।

একটু থেমে বলল, ওপর থেকে আপনাকে কিছু একটা করতে দেখেই নেমে এসেছিলাম, কি করছিলেন আপনি এমন নিবিষ্ট হয়ে ?

কিংশুক কোন কথা না বলে ব্যাগ সদ্য আঁকা রঙীন ছবিখানা বের করে মেলে ধরল মরিয়মের চোখের সামনে।

মরিয়ম নানাভাবে ছবিখানা দেখল। তারপর ছবিখানা হাতে রেখেই তাকাল কিংশুকের দিকে। মুখে তখন তার ফুটে উঠেছে একটা মুগ্ধতার ছবি।

আপনি শুধু শিল্পী নন, সত্যিকারের একজন জাত শিল্পী। আমার বাবাও আপনারই মত গুণী শিল্পী ছিলেন। তিনি অবশ্য দামী শালের ওপর দামী কাজ করতেন। কাশ্মীরের দু'জন সবচেয়ে নামকরা শিল্পীর ভেতর তিনি ছিলেন একজন। বিশেষ করে রঙ মেলাবার কাজে তাঁর নাকি জুড়ি ছিল না। আপনার কাজ দেখে বাবার কথা বড় বেশী করে মনে পড়ছে।

কিংশুক বলল, একটু আগেই না বলেছিলেন, একদিনে বেশী প্রশংসাবাক্য শোনাবেন না। এখন এত প্রশংসা শুনে মাথাটা আবার না বিগড়ে যায়।

মরিয়মের মুখ থেকে তখনও ভাল লাগার আলোকটুকু মুছে যায়নি। সে বলল, সত্যি অপূর্ব আপনার রঙের কাজ, রেখার টান।

কিংশুক বলল, আমাকে অন্ততঃ একটা প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করতে দিন।

মিষ্টি হেসে তাকাল মরিয়ম।

কিংশুক বলল, আপনার বাংলা বলার বাঁধুনি আর মিষ্টি উচ্চারণ অবাক করে দেবার মত।

মরিয়ম কিংশুকের হাতে তার ছবিখানা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, এখন সত্যিই তাহলে পালাতে হয়, আপনি যেভাবে প্রশংসা শুরু করলেন।

পায়ে পায়ে চলে যাচ্ছিল মরিয়ম।

কিংশুক ডাক দিয়ে বলল, এই যে বললেন না তো কোথায় কি করে শিখলেন এমন সুন্দর বাংলা বলা।

মরিয়ম চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল, তারপর চলার গতি আরও বাড়িয়ে দিয়ে মুখখানা একবার হেসে ফিরিয়ে বলল, সে কথা এখন নয়।

মরিয়ম অদৃশ্য হয়ে গেল, কিংশুকের আর কিছু ভাল লাগল না। সে শুধু কয়েকটা ঘোড়া, আরোহী আর সহিসের স্কেচ দ্রুত টানে শেষ করে ট্যাক্সির কাছে ফিরে এল।

তখন শ্রীনগরের আকাশে অনেক রোদ্দুর, কিংশুক ফিরে এল হাউসবোটে। বোটের ভেতরে ঢুকেই কিন্তু যাকে দেখল তাকে সেই মুহূর্তে তার আকাঙ্ক্ষিত অতিথি বলে মনে হল না।

ফেমিনার দুটো পাতায় মুখ ডুবিয়ে বসে আছে বিতস্তা। কাশ্মীরী সিল্কের একটা দামী শাড়ি পরেছে, গায়ে সুন্দর কাজকরা ঘি রঙের আলোয়ান।

কিংশুক ঢুকল, তবু বিতস্তা মুখ তুলল না দেখে কিংশুকের মনে হল ওর

আগমন বিতস্তা দূরে থেকেই টের পেয়েছে। এ হল না দেখার অনিপুণ অভিনয়।

কিছুক্ষণ পরেই চোখেমুখে বিস্ময়চিহ্ন এঁকে তাকাল বিতস্তা।

কখন ফিরলেন ?

কিংশুক হেসে বলল, ফেমিনা থেকে তোমাকে পুরস্কৃত করা উচিত। এমন নিবিষ্ট পাঠিকা দুর্লভই শুধু নয় পত্রিকার পক্ষে গর্বেরও কারণ।

বিতস্তা কিন্তু কিংশুকের এই কথায় খুব একটা খুশীর ভাব দেখাল না। সে ফেমিনা কোলের ওপর রেখে দিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে আমার কথা বলাই ঠিক হয় নি।

কিংশুক বলল, কি অপরাধ করেছি আমি!

বিতস্তা বলল, কি কথা হয়েছিল কাল? রাত পোহাল আর অমনি সব ভুলে বসে রইলেন!

সত্যি মনে পড়ছে না,—মাথা চুলকে কিংশুক বলে উঠল।

বিতস্তা বলল, আপনাকে আমার কাশ্মীর ঘুরিয়ে দেখাবার কথা ছিল না? আপনি বলেছিলেন, ঠিক আছে। এখন দেখি একা একাই বেরিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ও হো, এই কথা, বলেই হাসল কিংশুক। ব্যাগটা পাশের টেবিলে রেখে বসে পড়ল সোফায়। বলল, কাশ্মীর শুধু পহেলগাঁও নয়, আরও অনেক দর্শনীয় স্থান নিয়েই ভূস্বর্গ কাশ্মীর। এর পরের গুলোতে তোমাকে গাইড হিসেবে পেলে নিশ্চয়ই ভূস্বর্গ রমণীয় হয়ে উঠবে।

বিতস্তা মনে মনে খুশী হল, তবু বলল, আমার চেয়ে ভাল গাইড পাবেন এখানে।

কিংশুক বলল, কি রকম?

বিতস্তা হোটেল ডালভিউ-এর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ যে ওখানে রয়েছেন, মিসেস মরিয়ম। গভর্ণমেণ্টের রেজিস্টার্ড গাইড।

কিংশুকের কানে একটা কথা বেসুরো বেজে উঠল, বিতস্তা মরিয়ম নামের আগে মিসেস কথাটা বসাল, তবে কি মরিয়ম বিবাহিতা! অবশ্য মুসলমান মেয়েদের মধ্যে বিবাহিতা আর কুমারীর ফারাক বোঝা শক্ত।

পরক্ষণেই মনের এরকম চাঞ্চল্যে বিশেষ সঙ্কুচিত হল কিংশুক। মরিয়মের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তার ভাবনার কিই বা থাকতে পারে।

বিতস্তার কথার উত্তর দিল কিংশুক, দরকার নেই রেজিস্টার্ড গাইডের। বাঁধা বুলি শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে উঠতে হবে। তার চেয়ে একেবারে কোন গাইড না নিয়ে এই দুটো চোখ আর কান খোলা রেখে ঘুরে বেড়ানই ভাল।

বিতস্তা বলল, তাহলে আমাকেও সঙ্গে নিচ্ছেন না?

কিংশুক বলল, পথ দেখাতে কাউকে আমি নিজের থেকে ডাক দেব না, তবে যদি কেউ দয়া করে এগিয়ে আসে তাহলে নিশ্চয় ফিরিয়ে দেব না তাকে।

বিতস্তা বলল, আজ আর কোন প্রোগ্রাম আছে আপনার?

কিংশুক বলল, আছে, অবেলায় নিদ্রাদেবীর আরাধনা করা।

বিতস্তা বলল, তাহলে চলুন আমার বাড়ি, মা খুব খুশী হবেন।

বিতস্তার প্রস্তাবে খুশী হল না কিংশুক। তবু ভদ্রতা রাখতে বলল, আজ সন্ধ্যায় মাসীমার ওখান থেকেই খেয়ে আসব। তোমার রাগটাও তাহলে আর থাকবে না।

এ রকম একটা কথা কিংশুকের মুখ থেকে শুনবে আশা করেনি বিতস্তা, তাই খুশী যেন উপচে পড়ল ওর চোখেমুখে।

সত্যি আপনি যাবেন কিংশুকদা, শুধু যাওয়া নয় খেয়েও আসবেন, কি সৌভাগ্য আমার !

কিংশুক বলল, আমারই লাভ, খাবার খরচ কিছু বাঁচবে।

চলুন তাহলে এইবেলা ওঠা যাক, বলল বিতস্তা।

কিংশুক বলল, এই তো এলাম এত পথ পাড়ি দিয়ে, কান থেকে এখনও ট্যাক্সির আওয়াজ মিলিয়ে যায়নি, একটু সবুর কর, চা খাও, তারপর যাওয়া যাবে।

একথা সেকথা, চা কেকের পাট চুকলে বিতস্তা আর কিংশুক বেরল পথে। আজ আর শিকারা নয়, হাঁটা পথেই যাবে দু'জনে ডাক্তার সান্যালের বাড়ি।

পথে চলতে চলতে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল বিতস্তা। ওর আজকের খুশী ও যেন ধরে রাখতে পারছিল না, চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলছিল।

পথে আগুন জ্বেলেছে চীনারের সারি সারি গাছ। সেপ্টেম্বর অক্টোবরে চীনারের গাছ রূপের আগুন জ্বালে। একই গাছের পাতায় হরেক রকমের রঙের খেলা। কোথাও সবুজ, কোথাও সোনালী হলুদ আবার কোথাও বা বাদামী রঙ।

চীনায় গাছের ঘন পাতার ফাঁকে একটা পাখি শীস দিয়ে উঠতেই দাঁড়িয়ে গেল বিতস্তা। কান পেতে শুনতে লাগল সে ডাক। বলল, দোয়েলের ডাক আমার খুব ভাল লাগে। একটু শীত পড়লেই শ্রীনগরের ধারে কাছে ওরা থাকবে না। এ পাখিটা কেমন করে জানি না দলছাড়া হয়ে থেকে গেছে।

কিংশুক বলল, ঠিক আমার মত। লোকে সঙ্গী-সাথী নিয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়, আর আমি নিঃসঙ্গ ঘুরে বেড়াচ্ছি।

বিতস্তাকে এই মুহূর্তে কিংশুকের মন্দ লাগল না। মেয়েটি প্রকৃতির গাছ পাতা পাখির খবর নেয়, নিতান্ত আটপৌরে সংসারী নয়, তাই বুঝি ভাল লাগল।

একটা চীনার পাতা পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে কিংশুকের হাতে দিতে দিতে বলল বিতস্তা, দেখুন, পাতাটা ঠিক হাঁসের পায়ের পাতার মত, তাই না কিংশুকদা ?

কিংশুক বলল, তোমার নজরের প্রশংসা করছি বিতস্তা। এ পাতাটা তোমার দান মনে করে রেখে দিলাম আমার পকেটে। ছবি আঁকতে গিয়ে কাজে লাগবে।

বিতস্তা একটুখানি হাসবার চেষ্টা করল কিন্তু হাসতে পারল না। চোখের পাতা তার মনে হয় ভারী হয়ে উঠল। কিংশুকের মুখ থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে

সামনের দিকে চলতে লাগল। কিংশুক বিতস্তার পাশাপাশি চলতে চলতে ভাবল, বিতস্তা নিঃসঙ্গ। বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে একরকম নির্বাসিতের জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে সে। বাবার একটিমাত্র মেয়ে, তাই বিয়ের সূত্রে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিতে ডাক্তার সান্যালের মন চাইছে না। এদিকে কুরূপা না হলেও সৌন্দর্যের লীলাভূমি শ্রীনগরে বিতস্তা কিছুটা বেমানান বইকি। সব দিক থেকে বিচার করে কিংশুকের মনটা হঠাৎ কোমল হয়ে উঠল বিতস্তার ওপর।

প্রসঙ্গ পাল্টে নিল বিতস্তা, ঐ যে খালের ওপর সার বাঁধা সব নৌকো দেখছেন, ওগুলো শ্রীনগরবাসীদের সংসার। জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে সব এই জলের ওপর ভাসমান নৌকোয়।

কিংশুক বলল, জীবন নদীতে ভেসে থাকা সংসার তরণীর সার্থক প্রতীক এই দৃশ্য, কি বল ?

একটু থেমে আবার বলল, আচ্ছা বিতস্তা, তুমি এদের বিয়ের উৎসব দেখেছ ?

বিতস্তা বলল, বড় বড় বিয়ের অনুষ্ঠানে আতসবাজীর খেলা দেখবার মত। সারি দিয়ে সাজান শিকারা আর নৌকা চলে। আলোর খেলায় রাতের আকাশটা মনে হয় যেন হাজার হাজার ঝকমকে হীরে জহরৎ ছড়ানো।

কিংশুক বলল, নদীর ওপর কোন উৎসবের ছবি নিশ্চয়ই অবাক হয়ে দেখবার মত। আমার দেখতে খুব ইচ্ছে করে।

বিতস্তা অমনি হেসে বলল, কাশ্মীরে বিয়ে করলেই আপনার ইচ্ছা পূরণ হয়ে যাবে কিংশুকদা।

কিংশুক অমনি বলল, কে আর মেয়ে দেবে বল এই ভবঘুরে আর্টিস্টকে।

বিতস্তা বলল, এমন করে নিজের দর বাড়াবেন না কিংশুকদা, আপনার মত পাত্র পেলে কনের বাবারা সারা ঝিলমটাই আলোর মালায় সাজিয়ে দেবে।

কিংশুক বলল, এতদিনে নিজের দামটা জানতে পেরে বিশেষ গর্ববোধ করছি বিতস্তা।

বিতস্তা কথান্তরে গেল, জানেন কিংশুকদা, এদের বিয়ের মোটামুটি একটা নিয়ম আছে।

কি রকম ?

বিতস্তা বলল, শালের কাজ যারা করে তারা শালওয়ালার বাড়িতেই সাধারণতঃ মেয়ের বিয়ে দেয়। আবার যারা হাউসবোটের মালিক তারা হাউস-বোট থেকেই পাত্রপাত্রী খুঁজে নেয়। কাঠের কাজ যারা করে তারাও ঐ একই বৃত্তির লোকের ঘরেই মেয়ের বিয়ে দেয়। অবশ্য এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়।

কথা বলতে বলতে ওরা বড় রাস্তায় এসে পড়ল।

একটা বাস আসছে দেখে ওরা পথের ধারে দাঁড়িয়ে গেল।

বাসটা কাছাকাছি আসতেই একটা হাত বেরিয়ে এল। হাত নাড়তে নাড়তে বাসের ভেতর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, গুড্ লাক্ বিতস্তা।

বাস চলে গেলে কিংশুক বলল, তোমার পরিচিত কেউ নিশ্চয়ই ?

বিতস্তা বলল, আবার কে, মরিয়ম। সারা কাশ্মীরে বুঝি এমন কোন

জায়গা নেই যেখানে তাকালেই ওকে দেখা যায় না। ছেলেরাও যা করতে সাহস পায় না, ও তাই অনায়াসে করে বসে।

একটুখানি থেমে আবার বলল বিতস্তা, মেয়েদের এতখানি ডাকাবুকো হওয়া কি সাজে।

কিংশুক বলল, আজই পহেলগাঁও-এ ওকে আমি দেখেছি।

কথাটা শুনে বিতস্তার কেমন যেন একটু ভাবান্তর হল। সে আর কোন কথা না বলে হাঁটতে লাগল।

সত্যি, জলপথে আসা যেন নাসিকা বেষ্টন করে আসা, হাঁটা পথে কত সহজে পেঁৗছে গেল ওরা।

বিতস্তা বাইরের থেকেই ডাক দিলে, মা, রান্নার ব্যবস্থা কর, কিংশুকদা আজ এখান থেকে খেয়ে যাবেন।

কিংশুক বলল, দারুণ মেয়ে তো তুমি, ঢুকতে না ঢুকতেই খাবার কথাটা ঘোষণা করে দিলে।

বিতস্তা বলল, আপনাকে তো বেশীক্ষণ আটকে রাখা যাবে না, তাই আগে-ভাগে রান্নার আয়োজনটা করে রাখতে বলছি।

কিংশুক বলল, আমি বুঝি শুধু খাবার লোভেই এলাম তোমার এখানে?

বিতস্তা বলল, অন্য কোন লোভ আপনার আছে কিনা জানি না, তবে আপনি যে ভোজনরসিক সেটুকু জানতে আমার বাকী নেই।

কিংশুকের চোখেমুখে বিস্ময়। বিতস্তা হেসে বলল, বেড়াতে বেরোবার আগে মনসুরকে খাবার মেনুটা বলে দিয়ে যান না আপনি? আর রোজ নতুন নতুন রান্নার বরাদ্দ।

কিংশুক বিতস্তার হাসিতে যোগ দিয়ে বলল, এত খবর সংগ্রহ হয়ে গেছে এর মধ্যে।

বিতস্তা বলল, আপনার যিনি বউ হয়ে আসবেন কিংশুকদা, তার ভাগ্যে দুর্ভোগ আছে মেলা।

কিংশুক বলল, শুধু ঐ জন্যেই বিয়েটা আমার আর হয়ে উঠছে না।

বিতস্তার মা বেরিয়ে আসতে আসতে কথাটা লুফে নিয়ে বললেন, তোমার মত ছেলের আবার বিয়ে হয় না! এমন চেহারা, এত গুণ। এবার আর পালিয়ে পালিয়ে না বেড়িয়ে একটা বিয়ে থা করে ফেল। বল তো আমিই মেয়ে দেখে দি!

কিংশুকের মনে হল শ্রীমতী সন্যাল যতদূর এগিয়ে এসেছেন, এবার নিজের মেয়ের কথাই না পেড়ে বসেন। তাহলে পরিস্থিতি রক্ষা করাই দায় হয়ে উঠবে।

কিংশুক তাড়াতাড়ি করে বলল, আগে মা মাসীর হাতে তো ভালমন্দটা খেয়ে নিই, তারপর বউ আনা যাবে ঘরে। বউ এলে তো এটা খেয়ো না, ওটা করো না, এতে ফ্যাট বেশী আছে, ছানাটা খাও প্রোটিন আছে ওতে ইত্যাদি ইত্যাদির ঠেলায় প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত।

বিতস্তা হেসে বলল, আচ্ছা বাবা ঠিক আছে, বউ এনে দরকার নেই এখন,

চলুন বাগানে বসে গল্প করা যাক্। মা, তুমি রাতের খাবার আগে আমাদের কিছু খেতে দেবে না?

শ্রীমতী সান্যাল বললেন, তোমরা বস, আমি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি!

ডাক্তার সান্যালের বাড়িটা বেশ ছিমছাম। কাঠের ফ্রেমে বাঁধা বাড়ি, কাঁচের শার্সি, বাইরে ভেতরে সী-গ্রীন রঙের পেন্ট লাগান। দরজা জানালায় সাদা রঙ। রুচি মাফিক পর্দা ঝুলছে। জানালার ফাঁকে হাল্‌কা পর্দা উড়ে গেলে ড্রইংরুম থেকে ফ্লাওয়ার ভাসের ফুলগুলো এক একবার উঁকি দিচ্ছে।

কিংশুক আর বিতস্তা বসে আছে। কিংশুকের এই এক চিলতে বাগান আর ছবির মত সাজান বাড়িখানা ভারী ভাল লেগেছে। বাগানের একপ্রান্তে দুটো পপ্‌লার গাছ দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। ডালে পাতায় দুজন দুজনকে ছুঁয়ে আছে। ওর ফাঁক দিয়ে একটু দূরে ঝিলমের একটা বাঁক দেখা যায়।

কিংশুকের মনে হল, এই ছবির দেশে বাকী জীবনটা শুধু ছবি এঁকে এঁকে কাটিয়ে দিলে কেমন হয়। এড্‌ভারটাইজিং এজেন্সীর অফিসে দশটা পাঁচটা কমার্শিয়াল ছবির ড্রইং না করে মনের তাগিদে ছবি এঁকে গেলে আর কিছু না হোক ক্ষোভ মিটবে জীবনের।

বিতস্তা নিজের স্কুল কলেজ জীবনের কথা অনর্গল বলে যাচ্ছিল, আর কিংশুক তার দিকে চেয়ে কিছু শুনছিল, কিছু বা নিজের ভাবনা নিয়ে জাল বুনছিল।

কিংশুক বিতস্তার দিকে একসময় চেয়ে চেয়ে ভাবল, কেমন হয় এই মেয়েটিকে বিয়ে করলে? নিশ্চিন্ততা আসবে জীবনে, একটি সুখী সংসারের মালিকও হতে পারবে সে।

পরক্ষণেই আবার তার মনে হল, সুখ আর আনন্দ তো এক নয়। বাইরের সম্পদ, নিশ্চিন্ত আরাম মানুষকে সুখ দিতে পারে, কিন্তু আনন্দ দেবার শক্তি কতটুকু আছে তার। কঠিন রোগশয্যায় শুয়ে একটি কবিতা লিখে কবি যে আনন্দ পায়, অথবা অভুক্ত শিল্পী মনের তাগিদে ছবি এঁকে যে আনন্দ কুড়িয়ে পায়, মানুষকে রোজকার জীবনের সুখ কি সেখানে পেঁছে দিতে পারে? মুখোমুখি বসে আছে যে মেয়েটি, সে ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা সুখী সংসার হয়ত গড়ে তুলতে পারে কিন্তু কতটুকু পারবে সে শিল্পী কিংশুকের মনটাকে মুঠো মুঠো আনন্দে ভরে দিতে। একটা বিপুল প্রাণশক্তি যখন ফাল্গুনের শিমুল শাখায় পাগলকরা রঙের আগুন জ্বালে, তখন সে ছবি শিল্পীর সমস্ত প্রাণটাকে কেড়ে নিতে পারে। কিংশুকের মনে হল ততখানি প্রাণের জোয়ার কোনদিনই আসবে না বিতস্তার ভেতর। রূপে রসে হয়ত মগ্ন হতে পারে বিতস্তা কিন্তু অকারণ আনন্দে ভেসে চলে যাবার মত প্রাণশক্তি কোনদিনই অর্জন করতে পারবে না সে। বিতস্তা শান্ত সংসারী, বিতস্তা অক্লান্ত দুর্বার নয়।

কিংশুকের সেই মুহূর্তে মনে হল, এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় সুযোগটুকু সে আর কোনরকমেই গ্রহণ করবে না।

বিতস্তার একটা কথা হঠাৎ কানে ভেসে আসতেই উদ্‌গ্রীব আগ্রহ নিয়ে সেদিকে চেয়ে রইল কিংশুক।

বিতস্তা বলছিল মরিয়মের কথা।

জানেন কিংশুকদা, ঐ মরিয়ম মেয়েটা বড় লঘু। বিরাট পয়সাওয়ালা এক শালকরের পরিবারে ওর বিয়ে হয়েছিল, তিনটে বছর কাটতে না কাটতেই স্বামীকে ছেড়ে চলে এল ও। আমরা দেখেছি ওর স্বামীকে বিয়ের সময়ে, চোখ ফেরানো যায় না, এত সুন্দর। কি করে যে ও ছেড়ে আসতে পারল ওরকম স্বামীকে তা ভেবে অবাক হয়ে যাই।

কথাটা শুনে কিংশুকের কোন বিরূপ অনুভূতি জাগল না। সে বরং মরিয়মের পক্ষ নিয়ে বলল, দোষটা যে কার তা কেমন করে বোঝা যায় বল! সব দোষ মরিয়মের নাও তো হতে পারে।

বিতস্তার গলার স্বরে এবার কিছুটা উত্তেজনার উত্তাপ দেখা দিল। ও বলল, অবিকল আপনারই মত বাবাও দেখি মরিয়মের কোন দোষ দেখতে পান না। ছেলে হয়নি বলে নাকি স্বামীর সংসারে মরিয়মের আদর প্রতিপত্তি কমে, যায়, মাঝে মাঝে তাকে নাকি স্বামীর নির্যাতনও ভোগ করতে হত, তাই বাবা বলেন, সংসার ছেড়ে সে চলে এসেছে।

আমরা কিন্তু ওকথা পুরোপুরি বিশ্বাস করি না। ওকে বিয়ের আগে কতদিন দেখেছি মনসুরের সঙ্গে শিকারায় রাতে ভিতে ঘুরে বেড়াতে। এমনকি বিয়ের পরেও ওকে মনসুরের হাউসবোট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে। আর এখন তো কথাই নেই, ফরেনারদের সঙ্গে গাইড সেজে সাঁঝসকালে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিংশুকের মনে একটা তোলপাড় শুরু হয়ে গেল।

মনসুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে মরিয়মের, এ কথা মিথ্যে নয়, তবে তা কোন গোপন সুড়ঙ্গে কতদূর অবধি বিস্তৃত তা সে জানে। একবার কিংশুকের মনে হল, মেয়েরাই বুঝি মেয়েদের সঠিক রূপটা দেখতে পায়।

কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না কিংশুক। চুপচাপ ঝিলমের দিকে চেয়ে বসে রইল।

ডাক্তার সান্যাল ফিরে এসেছেন। ঘরের ভেতর তাঁর দরজা গলার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। কিছুক্ষণের ভেতরেই তিনি নেমে এলেন পেছনের বাগানে।

এই যে কিংশুক, তোমার আসাতে খুব খুশী হয়েছি, আরও খুশী হয়েছি তুমি এখানে খেয়ে যাবে শুনে।

কিংশুক বলল, হাউসবোটে বিতস্তার সঙ্গে দেখা। ও শুধু বাড়িতে ডাকল, খাবার কথা কিছু বলল না, তাই নিজে থেকেই রাতের খাবারের নিমন্ত্রণটা নিয়ে নিলুম।

বিতস্তা বলল, মোটেও তা না। ভদ্রলোককে বাড়িতে ডাকলেই তাঁকে খাইয়ে ছাড়তে হয়, এ হল অলিখিত নিয়ম।

মেয়ের কথা শুনে হেসে উঠলেন ডাক্তার সান্যাল। বললেন, কথাটা তোমাদের বাংলাদেশে হয়ত সব সময় খাটে না কিন্তু এই সুদূর কাশ্মীরে কোন বাঙালী আমার এখানে এসে না খেয়ে ফিরে যাবে, এমন অঘটন আজও ঘটে নি।

কথার ভেতর বিতস্তা উঠে গেল মাকে বোধকরি সাহায্য করতে। কিংশুক এখন ডাক্তার সান্যালের মুখোমুখি।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, কতদিন থাকবে ভেবেছ কাশ্মীরে?

কিংশুক বলল, তেমন কিছু ভেবে বেরোইনি, তবে মাস দুয়েকের ছুটি হাতে নিয়ে এসেছি। ভাল না লাগলে ফিরে যাব তাড়াতাড়ি, আর ভাল যদি লাগে তাহলে ডিসেম্বর অবধি থেকে যেতে পারি।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, শিল্পী মানুষ তুমি, কাশ্মীরের অপার সৌন্দর্য তোমাকে আটকে রেখে দেবে।

কিংশুক হাসল। ডাক্তার সান্যাল এবার অন্য প্রসঙ্গে এলেন।

কিংশুক, সোজাসুজি একটা প্রশ্ন করব তোমাকে?

কিংশুক ডাক্তার সান্যালের দিকে তাকিয়ে নড়ে চড়ে বসল।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, এই আমার মত কাশ্মীরে তুমি থেকে যেতে পারবে? কোন অভাব তোমার থাকবে না। ছবি আঁকার অজস্র উপাদান পাবে। ইচ্ছে যদি কর চাকরি কিংবা ব্যবসা কোনটারই অভাব হবে না।

কিংশুক সহজভাবেই নিল ডাক্তার সান্যালের এই কথাগুলো। বাংলাদেশের বাইরে একটি পিতা তার একমাত্র মেয়ের বিয়ের জন্য কতখানি চিন্তিত তা অনুমান করতে তাকে বেশী বেগ পেতে হল না।

কিংশুক বলল, বিধবা মা রয়েছেন দেশে। মন্দিরে এখনও বিগ্রহের নিত্য পুজো চলে। মা ঐ মন্দির ছেড়ে জীবনের শেষদিনগুলোতে আমার সঙ্গে বাইরে আসতে চাইবেন না। আর মাকে ফেলে রেখে এতদূরে থাকাও আমার পক্ষে তাই সম্ভব হবে না।

ডাক্তার সান্যাল চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলেন, তারপর আবেগে প্রায় ভেঙে পড়ে কিংশুকের একখানা হাত ধরে ফেললেন, একটি ছেলে বিতস্তার জন্যে যোগাড় করে দিতে পার বাবা, আমার সব পাবে সে। ব্যবসা করতে চাইলে ওষুধের দোকানও আমি তাকে করে দেব। শুধু আমাদের কাছে থাকতে হবে তাকে। যতদূর সম্ভব সুখে রাখতে চেষ্টা করব।

কিংশুক বলল, কথা দিচ্ছি আপনাকে, কলকাতা ফিরে আমি নিশ্চয়ই বিতস্তার জন্যে খুব ভাল একটি ছেলের সন্ধানে থাকব। আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না। বিতস্তাকে আমার খুবই ভাল লেগেছে, ওর জন্যে কিছু করতে পারলে আমি খুবই তৃপ্তি পাব।

ডাক্তার সান্যালের মুখটা মনে হল কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। আর কিংশুক বন্ধুবান্ধব থেকে আত্মীয়স্বজন, চেনাজানা প্রায় সব অবিবাহিতের মুখ খুঁজে বেড়াতে লাগল।

রাতে খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে ফিরে আসছিল কিংশুক, মনটাও ভাল ছিল না তার। একটি মেয়েকে গ্রহণ না করতে পারার কথা স্পষ্ট করে বলতে হয়েছে তাকে, এ যেন কোন মানুষের পক্ষে বিশেষ এক অস্বস্তির ব্যাপার।

পথ চলতে চলতে অন্যমনস্ক হয়ে কখন পেরিয়ে এসেছিল ডালভিউ হোটেল, পেছন থেকে চাপা গলায় মরিয়ম ডাক দিল, এই যে মিঃ মুখার্জী।

কিংশুক পেছন ফিরে দেখে মরিয়ম তার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে বলল, পেছন থেকে ডাক দিলে আপনাদের তো আবার যাত্রা পাল্টে নিতে হয়। যেখান থেকে আসছিলেন সেখানে ফিরে গিয়ে আবার যাত্রা শুরু করুন।

কিংশুক বলল, সেখানে যাবার পথ নিজেই বন্ধ করে দিয়ে এসেছি।

মরিয়ম ব্যাপারটা পুরোপুরি আন্দাজ করতে পারল না। সে বলল, আজ নিশ্চয়ই দারুণ জমেছিল আপনাদের। সেই বিকেলে বেরিয়েছিলেন বিতস্তার সঙ্গে আর এই রাত নটা বাজিয়ে ফিরলেন।

কিংশুক বলল, দূর বিভুঁইএ আপনার জন পেলে কার না ভাল লাগে।

মরিয়ম বলল, এখন আমার ছুটি, বাড়ি ফিরছি, চলুন না কিছুটা হাঁটতে যাওয়া যাক্।

কিংশুক বলল, আপনাকে এগিয়ে দিতে পারলে খুশীই হব।

মরিয়ম পহেলগাঁওয়ের পোশাক কখন বদলে ফেলেছে। শাড়ির ওপর পরেছে সাদা কাজ করা কার্ডিগান। মাথায় স্কার্ফ বাঁধা।

ওরা দুজনে চলেছে প্রায় জনহীন পথে।

মরিয়ম বলল, কাল কোথায় প্ল্যান করেছেন?

কিংশুক বলল, কিছুই ঠিক করিনি, তবে সোনমার্গ যাবার ইচ্ছে আছে, হয়ত ওখানেই চলে যেতে পারি।

মরিয়ম বলল, কাল আমার ছুটি, মানে আমার হোটেলবাসীদের পুরোপুরি বিশ্রাম আর টুকটাক কেনাকাটার দিন।

কিংশুকের ইচ্ছে করছিল মরিয়মকে সঙ্গী হতে অনুরোধ জানায়, কিন্তু যদি কোন কাজের অজুহাত দেখায় তাহলে মনের কোথাও গিয়ে বাজবে, তাই ওকে নিজের থেকে আর ডাক দিল না।

কিংশুক বলল, ছুটির দিনগুলো বেশ আরামে আলসেমীতে কাটে, তাই না?

মরিয়ম বলল, ছুটির দিনে আমার আবার ছুটি থাকে না, সেদিন নিজের দিকে তাকাতে হয়, ধোলাই ইস্ত্রি ঘর সাফাই সব কাজ একহাতে করি।

কিংশুক বলল, সাহায্যকারী বাড়্তি লোক নেই কেউ?

মরিয়ম বলল, রাখতে পারা হয়ত যায়, কিন্তু কেমন যেন পছন্দ হয় না ওদের কাজ।

কিংশুক হঠাৎ হেসে উঠল।

মরিয়ম অবাক হয়ে বলল, হাসলেন যে?

কিংশুক বলল, নিজের হাতে সবকিছু করা, অন্যকে কিছু করতে না দেওয়া, এসব সুবাদ আপনার চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রখর বুদ্ধি মরিয়মের। মুহূর্তে ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়ে বলল, কমপ্লিমেন্টটা বিতস্তা দিয়েছে নিশ্চয়ই। ওর মত গুণী মেয়ে ছাড়া কে দেবে!

বিতস্তার মুখে আপনার দক্ষতার অনেক কথা শুনেছি।

মরিয়ম কিছু সময় কোন কথা না বলে চুপচাপ হাঁটতে লাগল। এক সময় পথে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, আপনার ফ্যামিলিতে কে কে আছেন?

কিংশুক বলল, একমাত্র মা, তাও কলকাতায় থাকেন না, থাকেন দেশের বাড়িতে।

মরিয়ম বলল, আপনি তো ব্রাহ্মণ, একটি ভাল মেয়ে আছে, বিয়ে করবেন?

কিংশুক বলল, আপত্তি নেই, তবে একটি ছোট সংস্কার আছে আমার।

কি রকম?—বলল মরিয়ম।

কিংশুক বলল, যে মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে তার অতীত বর্তমান, জাতধর্ম কিছুই আমি দেখব না, শুধু কোন নদীর নামে তার নাম না হলেই হল। এই যেমন শিপ্রা, রেবা, গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী ইত্যাদি।

মরিয়ম খুব একচোট হাসল। হাসি থামলে বলল, বিতস্তা নিশ্চয়ই আপনার মনের এ সংস্কারের কথা জানে না এখনও।

কিংশুক একটু ভেবে নিয়ে বলল, মনে হয় এতক্ষণে জানতে পেরেছে। আমি ডাক্তার সান্যালকে সবিনয়ে আমার অক্ষমতার কথাটা জানিয়ে এসেছি।

মরিরম বলল, ছেলেরা একটু বেশী রকমের নিষ্ঠুর হয়।

কিংশুক অবাক হবার অভিনয় করে বলল, মেয়েদের চেয়ে বেশী!

মরিয়ম বলল, একশো বার।

কিংশুক বলল, মানতে পারলাম না।

ওরা কথায় কথায় অনেক পথ এসে গিয়েছিল। একটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে মরিয়ম বলল, তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম মুখার্জী, রাতও অনেক হয়েছে, এখন হাউসবোটে বিশ্রাম করগে। হঁ্যা, শোন, যদি আপত্তি না থাকে তাহলে কাল গাইড হয়ে তোমার সঙ্গে সোনমার্গ যেতে চাই।

কিংশুক বলল, আমি গরীব মানুষ, তোমার মত রূপসী নিপুণা গাইডের দাম কি দিতে পারব!

মরিয়ম চলে যেতে যেতে বলল, নিজের দাম আর বাড়িও না মুখার্জী। তোমার সঙ্গটা যে অনেক বেশী দামী তা তুমি নিজে ভাল করেই জান।

মরিয়ম দূর থেকেই বলল, আমিই ট্যাক্সি নিয়ে আসব এখন, তুমি শুধু মনসুরকে বলে রেখ, ড্রাইভারকে নিয়ে চারজনের খাবার তৈরী করতে। তাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে, আমি বলেছি বলে বল।

মরিয়ম অদৃশ্য হয়ে গেল আর কিংশুক ফিরে আসার পথে ভাবতে লাগল, কেমন সহজ কথাবার্তার ভেতর দিয়ে মেয়েটি 'আপনি'টাকে 'তুমি'তে নামিয়ে আনল।

সোনমার্গের পথে ট্যাক্সি ছুটে চলেছে। কিংশুক আর মরিয়ম বসেছে পেছনের সীটে। সামনে ড্রাইভারের পাশে মনসুর। পেছনে নাচতে নাচতে সরে যাচ্ছে নদীনালা, পথ-প্রান্তর, গাছপালা।

মরিয়ম বলল, বরফ পড়ে পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সোনমার্গের, আজ দুদিন

মাত্র খুলেছে। বাস এখনও যেতে পারছে না। জীপ, ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার কোন রকমে যেতে পারে। মিলিটারীতে জীপের জন্য রাস্তা তৈরী না করলে এ যাত্রায় সোনমার্গ যাওয়া হয়ত তোমার সম্ভব হত না মুখার্জী।

কিংশুক বলল, আমার লাক্‌টা ভাল বলতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গী-ভাগ্যও।

মরিয়ম বলল, সে তো আগেই আমি বলেছি, কাশ্মীরে আসার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ঝড় বৃষ্টি মুছে গেল। আবার এখন সোনমার্গের বরফঢাকা পথও গেল খুলে।

কিংশুক বলল, শোন মরিয়ম, মাঝে মাঝে আমি কিন্তু গাড়ি থামিয়ে তোমাদের বিরক্ত করব।

মরিয়ম বলল, তোমার খুশীমত থামিও, কিন্তু কেন ?

কিংশুক বলল, স্কেচ করার সাবজেক্ট পেলে হাতের কলমটা খাতার পাতায় আঁচড় কাটতে চায়। তাছাড়া কাশ্মীরের সব স্মৃতিকেই আমি অক্ষয় করে রাখতে চাই।

মরিয়ম বলল, তুমি যখন আঁকবে তখন আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে দেখব।

কিংশুক বলল, সব সময় নয়।

মরিয়ম অনুযোগের সুর তুলে বলল, ও কথা বলছ কেন ? একজন শিল্পী যখন কাজ করে তখন কি অপূর্ব তন্ময়তা ফুটে ওঠে তার ভেতর। আমার সেই মুহূর্তগুলো ভোলার নয় বলে মনে হয়! আমি কাশ্মীরের শাল, কাঠ, পেপারমেসির কাজ যারা করে তাদের কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকি, কাজ দেখি। শিল্পী আর তার হাতের কাজ দুটিই আমাকে সমান আকর্ষণ করে।

কিংশুক বলল, নিশ্চয়ই দেখবে, তবে তোমাকে সাবজেক্ট হতে হবে মাঝে মাঝে, তখন তো আর দেখতে পাবে না।

মরিয়ম বলল, ওরে বাবা, ও আমায় দিয়ে হবে না। তোমার ছবির আমি হব মডেল!

কিংশুক বলল, ছবিতে আমি যদি মরিয়ম নামের একটি মেয়েকে আঁকি তাহলে সে ছবি সাধারণ একটা পোর্ট্রেটের বেশী কিছু হবে না, কিন্তু যদি মরিয়মের ভেতর দিয়ে কাশ্মীরের একটা ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারি তাহলে সেটাই পাবে আসল ছবির মর্যাদা। আমি তোমাকে আঁকব না মরিয়ম, তোমার ভেতর দিয়ে একটা ঋজু সুন্দর পপলার গাছ, একটা ছুটে চলা ঝর্ণার জলধারাকে ধরে রাখার চেষ্টা করব।

একটু থেমে কিংশুক হেসে বলল, খুব কাব্য করছি বলে মনে হচ্ছে, তাই না মরিয়ম ?

মরিয়ম অবাক হয়ে শুনছিল। সে বলল, তোমার এ কথাগুলো সত্যিই কবিতা, আর নিশ্চয়ই এগুলো ফেলে দেবার কবিতা নয়।

অনেকগুলো টুকরো টুকরো ছবিকে ওরা পথের বাঁকে বাঁকে ফেলে এলো। দু' এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে কিংশুক স্কেচ করল, উপলছাওয়া নদীর বাঁকে পাইন গাছের। দুটো পাহাড়ের মাঝে থমকে থাকা মেঘের। পাহাড়ের

খাঁজে খাজে ক্ষেতিকারদের ছোট ছোট ঘর বাড়ি আর কর্মরত মেয়ে পুরুষের।

পাহাড়ের ওপরে উঠছে গাড়ি। নীল নদীধারা চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে ঘন সবুজ পাইন বনের ফাঁকে ধবধবে সাদা বরফের মুকুট উঁকি দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। কিংশুক চেয়ে আছে নির্বাক। এ জগৎ স্কেচের নয়। এখানে নীল আকাশ, সবুজ পাইন, হাল্কা পিঙ্ক আর দুধসাদা বরফের পাহাড় রঙ চাইছে। কিংশুক আঁকবে সে ছবি। এখন মনের পাতায়, তারপর সেই পাতা সামনে মেলে যেখানে কোন দৃশ্য থাকবে না সেখানে বসে আঁকবে। তাই চলার পথে রঙের ছবি আঁকছে কিংশুক মনে মনে।

এক সময় কিংশুক দেখল মরিয়ম তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ও বলল, কি দেখছ মরিয়ম ?

তোমাকে।

কিংশুক বলল, আমাকে ! আমার ভেতর এমন নিবিষ্ট হয়ে দেখার কি আছে !

মরিয়ম বলল, তুমি যখন ঐ পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিলে তখন আমি দেখছিলাম তুমি কত গভীরে ডুবে যেতে পার।

কিংশুক বলল, অমন করে আমাকে লজ্জা দিও না মরিয়ম।

এবার আমরা সোনমার্গে ঢুকব। সরু পথের ওপর থেকে বরফ কেটে কেটে পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে। অতি সন্তর্পণে তার ওপর দিয়ে ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে চলল।

একটা বাঁকের মুখে এসে গাড়িটাকে ব্রেক কষে দাঁড় করাল ড্রাইভার।

একপাল চমরী গাইএর পিঠে বাঁধা বোঝা, তাদের পেছনে খচ্চরের পিঠে চেপে আসছে গুজর ব্যবসায়ীরা। মেয়ে পুরুষ মিলে বিশ পঁচিশ জনের মত।

তারা এগিয়ে আসছে, আর থেমে থাকা গাড়ির ভেতর থেকে দ্রুত রেখার টানে তাদের স্টীল করে ধরে রাখছে কিংশুক।

হঠাৎ কখন গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে মরিয়ম বুঝতে পারেনি কিংশুক। কিছুক্ষণ পরে ছবির পাতা থেকে মুখ তুলে দেখল সমস্ত দলটা থেমে গেছে। মরিয়ম তাদের মেয়েদের সঙ্গে কথা কইছে।

কিংশুক নিবিষ্ট হয়ে দেখতে লাগল। মেয়েরা প্রচুর গয়না পরেছে। বিচিত্র সব গড়ন। পোশাকের রঙ হাল্কা আর ঘন বাদামী। ওদের মুখে যাযাবর মানুষের ভাব। খোলা আকাশ, সোনালী রোদ্দুর, বরফ আর দূর পথের ছবি আঁকা আছে ওদের চোখে।

আবার চলতে শুরু করল ওরা। একটি মেয়ে খচ্চরে চড়ে আসছিল, তার হাতখানা ধরে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে এল মরিয়ম। কিংশুক দেখল তরুণী গুজর মেয়েটির মুখ থমথম করছে।

ওরা চলে গেল ; মরিয়ম গাড়িতে উঠে এসে বসল।

কিংশুক দেখল মরিয়ম চুপচাপ। চোখ দুটোতে জল চিক্‌চিক্‌ করছে।

গাড়ি এগিয়ে চলল। কিংশুক কোন কথা বলল না।

একসময় রুমালে চোখ মুছে মরিয়ম স্থির হয়ে বসল।

জান মুখার্জী, ঐ মেয়েটার স্বামী আর দেবর তুষার ঝড়ে মারা গেছে।

একটু থেমে বলল, কয়েকদিন আগেকার কাগজে কারাকোরামের এদিকে তুষার ঝড়ে একদল ব্যবসায়ীর মৃত্যুর খবর বেরিয়েছিল। দুটি বড় দলের একটি, উপত্যকার মুখে দুটো পাহাড়ের মাঝখানে রাতের আস্তানা গেড়েছিল। আর অন্য দলটি ছিল তাদের খানিক পেছনে একটি পাহাড়ের খাঁজে।

রাতে তুষার ঝড় শুরু হল। উপত্যকার মুখে যারা ছিল প্রবল ঘূর্ণির তোড়ে ছিট্‌কে গভীর খাদের কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর অন্য দলটি সোজাসুজি বাতাসের প্রবল ঘূর্ণি থেকে কোন রকমে রক্ষা পেয়ে গেল। এই মেয়েটির স্বামী আর দেবর ছিল উপত্যকার মুখে: মেয়েটি সে রাতে পেছনের দলে তার বান্ধবীর সঙ্গে ছিল। সকালে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যেতে ওরা দেখল কোথাও কেউ নেই, শুধু বিরাট পুরু বরফের আস্তরণ পাহাড়ের গায়ে বিছানো আছে।

কিংশুক বলল, তবু দেশে ফিরে না গিয়ে এদিকে এল ওরা!

মরিয়ম ম্লান হেসে বলল, বাঁচার তাগিদে। ওরা ইয়ারখন্দের বণিক। শীতকালটা কাটিয়ে যায় শ্রীনগরের ছ'নম্বর সেতুর কাছে ইয়ারখন্দ সরাইতে। তখন মধ্য এশিয়ার সঙ্গে আমাদের দেশের পায়ে চলার পথটা বরফে ঢাকা থাকে। শীতকালে কেনাবেচার কাজ শেষ করে একটু বসন্তের হাওয়া দিলেই ওরা চলে যায়।

কিংশুক বলল, সভ্য জগতে যাতায়াত ব্যবস্থার এত উন্নতি তবু ওরা কিন্তু আদিম ব্যবস্থাটাকে বজায় রেখেছে। বিরাট কিছু লাভের ব্যবসা নিশ্চয়ই ফেঁদে বসেনি ওরা, তবু কী ভীষণ কষ্টের জীবনটাকে স্বীকার করে নিয়েছে।

মরিয়ম বলল, জান মুখার্জী ওরা তাঁবু পর্যন্ত সঙ্গে রাখে না। পথে প্রচণ্ড শীতেও ওরা ঐ পশুগুলোকে জড়ো করে তাদের ভেতর জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে।

কিংশুক বলল, বিচিত্র মানুষের সমাজ, অদ্ভুত জীবনযাপন প্রণালী।

মরিয়ম বলল, যে, মেয়েটির স্বামী মারা গেছে সে আমার চেনা। কয়েক বছরের যাতায়াতের ফলে ওর সঙ্গে আমার একটা ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে। গত বছরও ওকে আমি দেখেছি ওর স্বামীর সঙ্গে বাজারে পশমের জিনিস বিক্রি করতে। আমাকে দেখতে পেয়ে ওর স্বামী প্রথমে মিষ্টি হেসে মাথা নাড়ল, তারপর স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমার দিকে। ঐ মুখখানা কিংশুক, এই মুহূর্তে আমি ভুলতে পারছি না।

গাড়িটা এসে ঢুকে পড়ল তুষার ঘেরা একটা প্রান্তরে।

ছোট দু'খানি বাড়ির ছাদে পুরু বরফের ধবধবে সাদা আস্তরণ। সোনমার্গ প্রান্তরের চারদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পথ থেকে প্রান্তর ঢেকে বরফের ধবধবে সাদা চাদরখানা বিছানো রয়েছে পাহাড়ের চূড়ো অবধি। পাইনের গাছগুলো পাহাড়ের শিরা বেয়ে সারি দিয়ে বহু উঁচুতে উঠে গেছে। তাদের শাখায় পাতায়

বর্শা ফলকের মত ধবধবে তুষার ফলক।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল ওরা পথের ওপর। এখানেই পথের শেষ।

ওরা ছোট ঘরটার সামনে এগিয়ে এসে দেখতে পেল কয়েকখানা চেয়ার পাতা রয়েছে। ওখানেই বসে পড়ল ওরা। ভেতর থেকে চা পরিবেশন করছিল। ওরা জলযোগ ওখানে বসেই সেরে নিল।

কিংশুক বলল, সত্যি সোনমার্গ এক এবং অদ্বিতীয়।

মরিয়ম বলল, রিভার সিন্ধু এই প্রান্তরকে আধখানা চাঁদের মত বেড় দিয়ে রয়েছে। নদীর বেলাভূমিতে এককালে নাকি সোনা পাওয়া যেত, যার থেকে এই উপত্যকাটার নাম হয়েছে সোনমার্গ, বা সোনার প্রান্তর।

মরিয়ম একদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ উৎরাইটা হিমবাহ নেমে আসার পথ।

কিংশুক দেখল, যেন একটা দুধের ফেনার মত বরফের কেউ কিছুটা নেমে এসে থেমে গেছে।

আর ঐ যে দেখছ একটা বরফের পাহাড় মরিয়ম বলল, ওটা সমস্ত ভ্যালিটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে দিয়েছে।

কথায় কথায় মরিয়ম বলল, এখান থেকে ন'মাইল পথ পেরোলেই বালতাল। সিন্ধু উপত্যকার শেষ সীমা ওটি। ওখান থেকে যোজিলা গিরিপাস মাত্র আড়াই মাইল। কাশ্মীরের সঙ্গে লাদাকের ব্যবসার যোগসূত্র এই বালতাল।

জানো কিংশুক, বালতালের পথে আমি ট্যুরিস্টদের সঙ্গে অনেকবার গিয়েছি। সূর্যের সোনাঢালা পথ, রঙীন ফুলের ছড়াছড়ি।

কিংশুক বলল, এবার আগেভাগেই বরফ পড়ে গেছে, তাই হাঁটা পথে যাওয়া কষ্টকর হবে, ফিরে যদি আবার আসি কোনদিন, যাব ওদিকে। অবশ্য যদি তোমার সঙ্গ পাই তাহলে তো কথাই নেই।

মরিয়ম হেসে বলল, ট্যুরিস্টদের থেকে কিন্তু আমি ফ্যাবিউলাস এ্যামাউন্ট পেয়ে থাকি, একেবারে কিছু দেবে না তুমি !

কিংশুক বলল, গরীব আর্টিস্ট, নিজের খরচ চালাতেই হিমশিম, কি দেব তোমাকে বল ?

আমার একখানা ছবি এঁকেও দিতে পারবে না ?—বলল মরিয়ম।

কিংশুক সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এখুনি রাজী। আসি আর না আসি আগাম দাদন দিয়ে যাব।

ওরা বেরিয়ে পড়ল পথে। একটা বাঁক ঘুরে সাদা বরফের পাহাড়ে ওপর দুটো পাইন গাছ সুন্দর ভঙ্গীতে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে এসে পেঁাছল।

কিংশুক বলল, ঐ ওপরের পাইন গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তুমি একপাশ থেকে গাছের দিকে চেয়ে থাক, আমি ঐ পাথরটার ওপর ইজেল রেখে রঙ দিয়ে তোমার ছবি আঁকি। দেখ দেখ, কি সুন্দর আবহাওয়া। ওপরের বনের আড়াল থেকে কেমন সূর্যের ভাঙা আলোর টুকরো ছিটকে এসে পড়েছে গাছের তলায়।

দুহাতে বরফের চাঁই টানতে টানতে তুষারদেশের একটা হরিণীর মত উঠে

গিয়ে গাছের তলায় দাঁড়াল মরিয়ম।

নীচের থেকে কিংশুক হেঁকে বলল, রোদটুকু মেখে নাও মাথায়।

মরিয়ম চেঁচিয়ে বলল, বুঝতে পারছিনা, রোদ মাখব কি করে।

কিংশুক নীচের থেকে নির্দেশ দিল, আর একটু এগিয়ে দাঁড়াও। ঠিক আছে, এবার মুখখানা ডান দিকে সামান্য ফিরিয়ে ওপরের দিকে তাকাও। বাঃ, চমৎকার, চুলগুলো ছুঁয়ে রোদটুকু গালে গড়িয়ে পড়েছে। ইয়েলো স্ল্যাক্স্-এর সঙ্গে লাল গলাবন্ধ সোয়েটার, সাদা বরফ নীল আকাশ আর সবুজ পাইনের পটভূমিতে সত্যিই ওয়াণ্ডারফুল।

মুখ না ফিরিয়েই মরিয়ম বলল, আমাকে পুতুল পুতুল লাগছে, আমি নেমে যাব।

কিংশুক বলল, সর্বনাশ ও কাজটি করো না। তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু ভাব, একদিন আমি এমনি বৃক্ষ ছিলাম, আমার কোন বোধ ছিল না, কিন্তু বাতাসে আমার পাতা কেঁপে কেঁপে উঠত, পাহাড়ের ওপর থেকে রোদ ঝাঁপিয়ে পড়ে আলিঙ্গন করত আমাকে।

থেমে গিয়ে কিংশুক রাফ স্কেচটা করে নিচ্ছিল আগে।

মরিয়ম বলল, থামলে কেন, সুন্দর একটা অনুভূতি হচ্ছিল, বলে যাও।

কিংশুক বলল, তাহলে তোমার ব্যাগ থেকে কলম আর কাগজ বের করে দাও, আমি বসে বসে কবিতা লিখি। ছবি আঁকতে গেলে অত কথা বলা চলবে না। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দিলে সে যেমন আপনার বেগে চলে, তেমনি ভাবনার খেই ধরিয়ে দিলে আপন মনে ভেবে যেতে হয়।

মরিয়ম বলল, আচ্ছা ঠিক আছে মশায়, এখন থেকে আমিই ভাবছি।

মরিয়মের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। কিংশুকের সূক্ষ্ম টানে সেই হাসি কোমল সুন্দর আর জীবন্ত হল।

বেশ খানিক সময় এমনি কেটে যাবার পর কিংশুক বলল, এবার তোমার ছুটি। তুমি চারদিকে চোখ ফেরাতে আর হাত পা চালাতে পার, তবে নামতে পাবে না এখন। কখন কি দরকার পড়ে।

মরিয়ম ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলল, গান গাইতে পারি ?

কিংশুক মরিয়মের মুখে একটা রঙের ওয়াশ দিতে দিতে বলল, খু-উ-ব পার।

একটা জীপ পথের বাঁক ফিরে গর্জন করতে করতে ছুটে এসে কিংশুককে পথের ওপর দেখে দাঁড়িয়ে গেল।

কয়েকটি বিদেশী ট্যুরিস্ট মেয়ে পুরুষে নেমে পড়ল জীপ থেকে। ওদের হাতে মুভি ক্যামেরা। ওরা কিংশুক আর মরিয়মের ছবি নিতে চায়।

একজন হাত তুলে মরিয়মকে ইঙ্গিত করে বলল, তোমরা কি স্বামীস্ত্রী ?

কিংশুক কিছু বলার আগেই ওপর থেকে চেঁচিয়ে মরিয়ম বলল, ইয়েস, ইয়েস।

একটি মেয়ে মরিয়মকে নেমে আসার জন্যে হাতছানি দিতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, এবার কি আমি নামতে পারি মুখার্জী ?

কিংশুক কোন রকমে উত্তর করল, নেমে এসো।

ওরা কিংশুক আর মরিয়মকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে ছবি নেবার উদ্যোগ করতে লেগে গেল।

মরিয়ম হাসছিল। কিংশুক দাঁড়িয়েছিল স্ট্যাচুর মত।

মরিয়ম কিংশুককে ঠেলা দিয়ে বলল, অমন স্টিফ্ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ভয় নেই, ওরা আমাদের এই ছবি তোমার ভাবী বউয়ের কাছে পাঠাবে না।

ওরা নানা এ্যাংগেল থেকে শিল্পী আর মডেলের ছবি তুলে নিয়ে চলে যেতেই মরিয়ম বলল, আমি যখন ওপরে ছিলাম, তখন একটা লোক হাত তুলে কি জিজ্ঞেস করছিল বল তো?

কিংশুক বলল, কথাটা না শুনেই কি তুমি ইয়েস্ ইয়েস্ করে উঠেছিল?

মরিয়ম বলল, ঠিক তাই। ওর হাত তোলা দেখে আমার মনে হল লোকটা সোনমার্গে প্রান্তরটা ডানদিকে কিনা জানতে চাইছে। আমিও অমনি ইয়েস্ ইয়েস্ বলে দিলাম।

কিংশুক বলল, ও অন্য কথা জানতে চেয়েছিল।

মরিয়ম অমনি বলল, কি কথা?

কিংশুক বলল, সে কথা বলা যাবে না।

পীড়াপীড়ি করতে লাগল মরিয়ম, বল না কি কথা, বল না?

কিংশুক বলল, তাহলে কথা দাও, তুমি এমন সুন্দর উচ্চারণে বাংলা বলা কি করে শিখলে তা আমাকে আজ এখুনি বলবে।

প্রথমে চঞ্চল মেয়েটি একটু গম্ভীর হল, তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে বলল, বলব।

কিংশুক বলল, ওরা তোমার দিকে আঙুল তুলে তোমার আমার সম্পর্কটা অতি নিকট কিনা জানতে চাইছিল।

মরিয়ম বুদ্ধিমতী। সে তার ভুলটা বুঝতে পেরেছে। কিংশুকের মনে হল, মরিয়ম বোকার মত 'ইয়েস ইয়েস' বলেছিল বলে এখন লজ্জা পাচ্ছে।

কিংশুক আবার বলল, এখন আমার কথা আমি রেখেছি, তোমার কথাটা শোনাও।

মরিয়ম কিংশুকের হাত ধরে বলল, এসো আমার সঙ্গে এখানে পথে দাঁড়িয়ে কথা হবে না।

কিংশুক ওর সঙ্গে যেতে যেতে ভাবল, মেয়েটি কত সহজে তার হাত ধরে ফেলল। অথচ ওর চোখে মুখে উত্তেজনার কোন ছাপই নেই।

ওরা এসে পড়ল পথ থেকে বেশ কিছু দূরে একটা নির্জন বনস্থলীতে। ওখানে একটা পাথরের চাঁই আশ্চর্যভাবে সূর্যের উত্তাপে খসিয়ে ফেলেছিল তার বরফের মুকুট। ওরা অনেক বরফ ভেঙে তারই ওপরে গিয়ে বসল।

মরিয়ম বলল, আমি জানি, তুমি খুবই উৎসুক হয়ে আছ আমার বাংলা জানার পেছনের রহস্যটুকু জানতে। আগেও তুমি এ প্রশ্ন আমাকে করেছ।

কিংশুক বলল, এ ঔৎসুক্য নিশ্চয়ই স্বাভাবিক বলে তুমি মেনে নেবে।

মরিয়ম বলল, আমি জানি একজন বাঙালীর মুখোমুখি হলে এ প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতেই হবে।

এর পর কিছুক্ষণ নীরবতার ভেতর কেটে গেল। সূর্যের আলো এখন পাইন বনের ভেতর সোনার হরিণের মত খেলা করছে। মসলিন স্বচ্ছ একটা কুয়াশা ভেসে এসে ওদের হিমেল ছোঁয়া দিয়ে চলে গেল।

মরিয়ম বলল, আমি বাবার দিক থেকে কাশ্মীরী হলেও মা ছিলেন আমার বাঙালী। সেদিক থেকে তোমার সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ থাকলেও থাকতে পারে।

কিংশুক বলল, আমার ধারণায় প্রতিটি মানুষ একই রক্তের বাঁধনে বাঁধা।

মরিয়ম বলল, আমার মা ছিলেন বাঙলাদেশের এক বিশিষ্ট বনেদী বাড়ির বিধবা। সতের আঠারো বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। একসময় পরিবারের লোকজনের সঙ্গে অমরনাথ তীর্থের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন কাশ্মীর। পথে ঠিক আজকের ঐ সমরখন্দের ব্যবসায়ীদের মত ঝড়ের মুখে পড়ে যান। বহু তীর্থযাত্রী মারা যান। মা একটা পাহাড়ী নদীর স্রোতে একটুখানি ভেসে বড় পাথরের চাঁইতে আটকা পড়েন। বাবা ওখানকার একটা গ্রামে তাঁর মামার বাড়িতে থাকতেন। নামদা তৈরী করে সাপ্লাই করতেন পহেলগাঁওয়ের বাজারে। যে কোন রকমে তাঁর চোখে পড়ে যায় মায়ের এই মুমূর্ষু অবস্থার ছবি। তিনি মাকে ঐ অবস্থা থেকে উদ্ধার করে সুস্থ করে তোলেন।

বাবা পেঁাছে দিতে চেয়েছিলেন মাকে তাঁর স্বামীগৃহে বাংলাদেশে কিন্তু আমার বিধবা মা সেখানে মনের দিক থেকে সুখী ছিলেন না। তাই যখন বাবা পহেলগাঁওয়ের কিছু দূর থেকে মাকে শ্রীনগরে নিয়ে আসছিলেন, তখন মা আমার বাবাকে তাঁর বঞ্চিত জীবনের কথা বলেন। বাবা তখন যুবক, তিনি মাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। মা সম্মতি জানালে তাঁরা নতুন জীবনে প্রবেশ করেন। আমি মা বাবার একমাত্র সন্তান। দু' এক বছর আগে পিছে আমি আমার মা বাবাকে হারিয়েছি কিংশুক। আমার মা বাংলাদেশ থেকে ডাকে বহু বই আনতেন। তাঁর কাছে বহু যত্নে আমি বাংলা শিখেছি। আগেই বলেছি বাবা ছিলেন আমার শিল্পী মানুষ। শালের ওপর বহু উৎকৃষ্ট কাজ তিনি করেছেন, কিন্তু তাঁর কাজের অনুপাতে অর্থ তিনি সঞ্চয় করে যেতে পারেননি। দুহাতে মানুষকে তিনি দান করেছেন। অবসর পেলেই ঘুরে বেড়িয়েছেন। আমার মায়ের মৃত্যু আগে হয়েছিল। বাবা এমন আঘাত পেয়েছিলেন যে পুরো দুটো বছর প্রায় নির্বাক হয়ে কাজকর্ম না করে কাটাতেন। শেষে মায়ের কাছে গিয়ে তিনি শান্তি পেলেন।

কথা বলতে বলতে ভারী হয়ে উঠল মরিয়মের গলা। সে কতক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

কিংশুক বলল, কিছু যদি মনে না কর একটা কথা জানতে চাই।

মরিয়ম মুখ তুলে তাকাল কিংশুকের দিকে। চোখে তার জল টলটল করছে।

কিংশুক অমনি বলল, থাক্, এখন আর কোন কথা নয়।

মরিয়ম চোখ মুছে বলল, বল কি জানতে চাও।

কিংশুক বলল, তুমি কি এখনও একা মরিয়ম ?

মরিয়মের মুখে বৃষ্টিভেজা রোদ্দুরের ছোঁয়া লাগল। বলল, মানুষ কি কখনো একা থাকতে পারে মুখার্জী। তবে তুমি যে অর্থে একা কিনা জিজ্ঞেস করছ সে অর্থে আমি নিঃসঙ্গ।

একটু থেমে আবার বলল, তুমি যখন জিজ্ঞেস করেছ তখন কোনকিছু লুকোবো না তোমার কাছে। আমি বিয়ে করেছিলাম। তিন বছর সংসারও করেছি, কিন্তু যার দোষেই হোক সে সংসার জীবনে ছেদ পড়ে গেছে।

কিংশুক ডাক্তার সান্যালের বাড়িতে যা শুনে এসেছিল মরিয়মের মুখে তাই শুনল। হঠাৎ আর একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হল তার। যদিও এ ধরণের কৌতূহল উচিত নয় বলে মনে হল তবুও তাকে দমন করতে পারল না সে।

কিংশুক বলল, মনসুরের সঙ্গে তোমার আলাপ অনেক দিনের তাই না ?

মরিয়ম একটু হেসে বলল, এ সম্বন্ধে কি বলে তোমার বিতস্তা ?

লজ্জায় মাথাটা নীচু হয়ে গেল কিংশুকের। বলল, আমার অবাধ্য কৌতূহলের জন্যে মাপ চাইছি মরিয়ম।

মরিয়ম একটুখানি চুপ করে থেকে বলল, আমার বান্ধবীরা আমার সম্বন্ধে একটু বেশী কৌতূহলী। অবশ্য এতে তাদের যতটা অপরাধ তার চেয়ে অনেক বেশী অপরাধ আমার স্বভাবের। জান কিংশুক, আমি কোনদিন সমাজের বাঁধাধরা পথে হাঁটি না। আমার যা কিছু ভাল লাগে তাই আমি করে যাই। আমার জন্যে বাইরের পাঁচজনের দুশ্চিন্তা দেখলে আমি আরও জেদের সঙ্গে সমাজবিরুদ্ধ কাজগুলো তাদের চোখের ওপর করতে থাকি।

কিংশুক বলল, ছকে বাঁধা জীবন আমিও পছন্দ করি না।

মরিয়ম বলল, উচ্ছৃংখল হয়ে যাওয়া যেমন জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না তেমনি কঠোর সামাজিকতাও আমাদের জীবনের একমাত্র সত্য হতে পারে না।

মনের উত্তেজনা একটু প্রশমিত হলে মরিয়ম বলল, হ্যাঁ, তুমি যা জানতে চেয়েছ সোজাসুজি তার উত্তর দিচ্ছি। আমার সঙ্গে মনসুরের পরিচয়, বলতে পার আমার কিশোরী অবস্থার থেকে।

আমরা পাশাপাশি থাকতাম। ওরা খুব গরীব ছিল, কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই মনসুর সৎ আর পরিশ্রমী। আমরা একসঙ্গে খেলা করতাম। ওর নৌকোয় চড়ে ফ্লোটিং গার্ডেনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে যখন সব্জি তুলে নিতাম তখন ও আমার ওপর রাগ করত। আমি যত ডানপিটে ছিলাম, ও ছিল ঠিক ততখানি শান্ত।

ধীরে ধীরে আমরা বড় হয়ে উঠলাম। স্কুল থেকে আমি কলেজে ঢুকলাম, আর মনসুর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। ওর পড়াশোনা বিশেষ এগোয়নি, কিন্তু তাতে আমাদের বন্ধুত্বে কোনদিন ভাটা পড়েনি।

আমি বেশ বুঝতাম, মনে মনে ও আমাকে ভালবাসে কিন্তু কোন নির্জন মুহূর্তেও সেকথা সে প্রকাশ করেনি আমার কাছে।

আমার দিক থেকেও বলি, আমি ওকে ভালবাসি, ঠিক ছোটবেলার খেলার সাথী হিসেবে, কোনদিন ওকে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করব এ কথা ভাবতেও পারি না।

কিংশুক বলল, আমার দোষ নিও না, কিন্তু কেন তুমি পারবে না ওকে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করতে?

মরিয়ম একটু হাসল। কিংশুকের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তোমার ছোটবেলার সঙ্গিনী, যার সঙ্গে তুমি পাঠশালায় পড়েছ, অনেকদিন পরে তার সঙ্গে হঠাৎ তোমার দেখা হয়ে গেল। তুমি তাকে দেখে নিশ্চয়ই খুশী হবে। কিন্তু যখন দেখবে সে সাধারণ রুচির ওপরে আর একটুও উঠতে পারেনি, তখন নিশ্চয়ই তাকে জীবনসঙ্গিনী করবার ইচ্ছে তোমার জাগবে না।

আমরা অনেক সময় হয়ত জীবনের সাময়িক উত্তাপে উচ্ছ্বাসে অনেক কাজ করে ফেলি, কিন্তু উত্তেজনা নিভে এলে সারাজীবন অনুতাপে ভুগি। আমি আর মনসুর বন্ধু, আজ এটুকু কথাই শুধু সত্য বলে জেনে রেখ কিংশুক, তার বেশী নয়। ও হৃদয়বান কিন্তু আমার সঙ্গে রুচি, সংস্কৃতিতে ওর ফারাক বহুৎ। তুমি আমাকে আশা করি ভুল বুঝবে না কিংশুক। একজনকে ভাল লাগা আর তাকে ভালবাসা, এ দুটো সব সময় এক নয়।

কিংশুক বলল, মনসুর এখনও বিয়ে করেনি বলেই জানি, সেটা কি তোমার জন্য নীরব প্রতীক্ষা নয়?

মরিয়ম বলল, একেবারে নয় বলে নিশ্চয়ই উড়িয়ে দিতে পারি না, তবে মনসুর ভাল করেই জানে মরিয়ম কোনদিন তার জীবনসঙ্গিনী হবে না।

কিংশুক বলল, একথা সে হয়ত মেনে নিয়েছে তবু তোমার ওপর তার আকর্ষণ যায়নি।

মরিয়ম হেসে বলল, এ অবস্থায় আমি নিরুপায় মুখার্জী। তবে ওর মনটা যে অনেক বড় তার বহু প্রমাণ আমার কাছে রয়েছে। আমি তোমাকে আগেই বলেছি, এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমার সাদি হয়েছিল, আর তুমি শুনলে হয়ত বিস্মিত হবে বিয়ের শোভাযাত্রার নৌকো সাজানো থেকে রাতের রোশনাই অবধি সব কাজের ভার মনসুরই নিয়েছিল। ও যে কতখানি আমাকে ভালবাসে সে সময় সারা অন্তর দিয়ে বুঝেছিলাম।

আমার সঙ্গে আমার স্বামীর বিচ্ছেদের দিনগুলোতে ও যে কি রকম উদ্বিগ্ন আর অস্থির হয়ে পড়েছিল, তা চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। সেদিন মনসুর ছিল আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। ওর হাউসবোটে আমি কতদিন থেকেছি, আমার সুখদুঃখের কত গোপন কথা ওকে বলেছি, কিন্তু সেদিনের ছড়ানো সুযোগের এক কণা মনসুর গ্রহণ করেনি। জীবনের সেই দুঃখের দিনগুলোতে আমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম যে ও ইচ্ছে করলে হয়ত আমাকে তার প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করাতে পারত, কিন্তু তা সে করেনি। তবু

কিংশুক, মনসুরের মহত্ত্ব আমাকে অভিভূত করলেও ওকে স্বামী হিসেবে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে কোনদিনই সম্ভব নয়।

কিংশুক কয়েকদিন পরেই একটি আশ্চর্য ঘটনার মুখোমুখি হল।

ওরা সেদিন বেড়াতে গিয়েছিল গুলমার্গ। টাঙমার্গ থেকে পথের ওপর পড়েছিল বরফের আস্তরণ। ট্যাক্সিতে ওরা উঠে গেল ওপরে। তুষার তুষার কেবল তুষার। বিরাট প্রান্তর জুড়ে সাদা বরফের যেন একটা আশ্চর্য হ্রদ। ওদিকে খিলেনমার্গের তুষার পর্বত দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে ওঠার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

হোটেলের সামনে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা বলাবলি করছিল, এবার অনেক আগেই স্কী খেলতে এসে যাবে ফরেনাররা।

কিংশুক এ কদিনে বেশ বুঝতে পেরেছিল, মরিয়ম তার ছবি আঁকার সময় পাশে এসে না দাঁড়ালে কেমন করে যেন সব সুর কেটে যায়। মরিয়মও ছবির স্বাদ নিতে জানে। রঙের পাশে রঙের মিল সে বোঝে। বলিষ্ঠ রেখার টান সে তারিফের চোখে দেখে। কিংশুক ছবি আঁকতে শুরু করলে মরিয়মকে যেন কি এক নেশা পেয়ে বসে। সে শুরু থেকে যতক্ষণ না কিংশুক তার ছবিকে ঝোলার ভেতর বন্দী করে ততক্ষণ মগ্ন মুগ্ধ এক দর্শকের মত তাকিয়ে থাকে।

সেদিন গুলমার্গের তুষারছাওয়া পথের ওপর দাঁড়িয়ে ওরা প্রান্তরে স্লেজের খেলা দেখছিল। স্লেজের ওপর চড়িয়ে পাহাড়ী লোকগুলো চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ট্যুরিস্টদের।

মরিয়ম ছেলেমানুষের মত চঞ্চল হয়ে উঠল। সে কিংশুককে বলল, আমি স্কী করেছি, দারুণ এক্সাইটমেণ্ট, কিন্তু স্লেজে কোনোদিন চড়িনি, আজ চড়ব। চল, তুমিও চড়বে, ভীষণ মজা হবে।

কিংশুকের ছবি আঁকার চোখ তখন অন্য কথা ভাবছিল। অনেক ওপর থেকে এই নীচের প্রান্তরের লাল নীল হলদে বেগুনী রঙের পোশাক পরা স্লেজের আরোহীদের ছবিগুলো কেমন দেখায়।

কিংশুক মরিয়মকে তার মনের কথা জানিয়ে বলল, তুমি খেলার আসরে নেমে যাও মরিয়ম, আমি ঐ ওপরের পাহাড়ে বরফ ভেঙে উঠছি। ওখানে পাইন গাছের কাণ্ডগুলোর ফাঁকে দাঁড়িয়ে তোমাদের দেখব আর আঁকব। আমার মনে হচ্ছে দারুণ এক কম্পোজিশন হবে।

মরিয়ম একবার বলল, এত উঁচুতে বরফ ভেঙে উঠবে! মনসুর গাড়িতে বসে আছে, ওকে না হয় জিজ্ঞেস করে দেখ।

কথাগুলো বলা শেষ করেই ও হৈ হৈ করতে করতে নেমে গেল। একটা স্লেজের ওপরে চেপে হাত নাড়তে লাগল।

কিংশুকের পৌরুষে লাগল মনসুরকে জিজ্ঞেস করতে। মনে হল তার সবাইকে জানিয়ে উঠলে সবাই তার দিকেই তাকিয়ে থাকবে, তাতে ছবি আঁকার মনোযোগটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

কিংশুক বরফের বড় বড় চাঁইগুলোর ওপর দিয়ে প্রায় অবিশ্বাস্যভাবে যখন উঠে এলো বরফে ঢাকা পাইন বনের কাছে তখন দস্তুর মত হাঁফাচ্ছিল ও। পাইন গাছের ঠিক গোড়াগুলোতে বড় আলগা বলে মনে হল তার। যাক্, কষ্ট করে সে এখন অনেক ওপরে উঠে এসেছে।

গায়ের বরফগুলো ঝেড়ে ফেলে ও পাইন গাছের কাণ্ডের সঙ্গে কৌশলে ইজেলটাকে সেট করল। এবার নীচের দিকে তাকাল ও। সত্যি, ওপরে না উঠলে বোঝা যেত না কত সুন্দর একখানা ছবি নীচের প্রান্তরে ফুটে উঠেছে। কিংশুকের মনে হল, সাদা চাদরের মাঝখানে, রঙের সুতোয় বিস্ময়কর এক জাজিম বোনা হচ্ছে।

ছবি আঁকতে আঁকতে কখন মগ্ন হয়ে গেছে কিংশুক, তীব্র ঠাণ্ডাতেও দারুণ এক উন্মাদনায় হাতের তুলি চলেছে তার।

হঠাৎ কোথায় যেন একটা কি শব্দ হল। কিংশুকের মগ্নতা ভেঙে গেল। সে প্রান্তরের দিকে চেয়ে দেখল কতকগুলো হাত তার দিকে উঠে আছে। কি যেন ইঙ্গিত করছে প্রান্তরের লোকগুলো, আর সে-ই তাদের লক্ষ্যের বস্তু।

ঐ তো মরিয়ম, সে হঠাৎ যেন ভয় পাওয়া হরিণের মত ছুটে আসছে। কি ব্যাপার! কিংশুক পায়ের নীচে তাকাতেই মাথাটা তার ঘুরে গেল। পাইন গাছের তলায় জমাটবাঁধা তুষারের চাঙড় একেবারে নীচে খসে নেমে চলে গেছে। তার পায়ের নীচ থেকে পাইন গাছ বরাবর অনেক দূর পর্যন্ত গভীর এক খাদ।

কিংশুক যদিও শক্ত পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে তবু পাইন গাছের কাণ্ডগুলো ধরে না থাকলে সে হয়ত নিজেকে সামলাতে পারত না। সামনে খাদ, পেছনে অনেক বরফ-জমা পাহাড়। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার সারা শরীর ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল।

কতক্ষণ সে এমনি করে দাঁড়িয়ে রইল। একটা অর্ধ-সচেতন অবস্থায় সময়-গুলো তার পার হয়ে যাচ্ছিল। সে নীচের দিকে একেবারেই তাকাতে পারছিল না।

একসময় পেছন থেকে কে যেন তার গায়ে হাত রাখল। সে ভয়ানক ভয় পেয়ে চীৎকার করতে গিয়েও গলা থেকে কোন আওয়াজ বের করতে পারল না।

ভয় নেই, আমি মনসুর।

আশ্চর্য নিরুদ্বিগ্ন গলা মনসুরের।

আবার বেজে উঠল তার কণ্ঠ, আমার পিঠের ওপর উঠে বসুন, খুব সাবধানে। একটুও নড়বেন না, যতটা সম্ভব দম বন্ধ করে রাখবেন।

কিংশুক তাই করল। মনসুর অসীম ক্ষমতায় কিংশুককে পিঠে নিয়ে চলল। সামনে আর একটা পাহাড়ী মনসুরের হাত ধরে, আগে আগে চলল, মনসুর তার পেছনে অতি সন্তর্পনে গিরিশিরায় পা রেখে রেখে চলতে লাগল। সে যে কি শক্তি আর কৌশলে তারা কিংশুককে পাহাড়ের ওপার দিয়ে নামিয়ে নিয়ে এল তা কিংশুকের সকল ভাবনার বাইরে।

তখনও নীচে নামতে কিছু পথ বাকী হঠাৎ মনসুর চীৎকার করে উঠল, কে

তোমাকে বরফ ভেঙে এত ওপরে উঠে আসতে বলেছে মরিয়ম। তুমি কি আমার ওপর একটুও ভরসা রাখতে পার না!

সারা পাহাড়ে যেন মনসুরের ক্ষুব্ধ গলার স্বর ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

মুহূর্তমাত্র, তারপর একেবারে নীরবতা। মনসুরকে এর আগে এমন সুরে কথা বলতে বুঝি কেউ শোনেনি।

সেদিন হাউসবোটে ফিরে এসে যেন নবজন্ম পেল কিংশুক। মনসুর যে এত বড় একটা উপকার করেছে তা তার আচরণে কিন্তু এতটুকু প্রকাশ পেল না। প্রতিদিনের মত বিনীত হাসিতে সে তার সব কাজ রুটিন মাফিক করে যেতে লাগল।

মরিয়ম কিংশুকের পাশে বসে কফির কাপে মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছিল আর পলকহীন তাকিয়েছিল কিংশুকের মুখের দিকে।

এক সময় চাপা গলায় বলল, আজ কি সর্বনাশই না ঘটে যেতে পারত। এমন আত্মভোলা মানুষ তুমি! এমন ছবি পাগল যে বিপদ হতে পারে কিনা একবার ওঠার আগে মনসুরকে জিজ্ঞেস করে নিলে না! আমারই দোষ হয়েছিল, একা তোমাকে ছেড়ে দেওয়া একেবারেই ঠিক হয় নি।

হঠাৎ কাপটা নামিয়ে রেখে প্রবল উত্তেজনায় মরিয়ম কিংশুকের হাতটা চেপে ধরে বলল, আল্লা মেহেরবান, তোমাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তোমার কিছু একটা হলে আমিও আর ফিরে আসতাম না ওখান থেকে।

কিংশুক বলল, মরিয়ম, তোমাদের সকলের কাছে চিরদিনের ঋণে আমি বাঁধা পড়ে রইলাম।

মরিয়মের হাতটা কাঁপছিল। কিংশুক গোধূলি বেলার ম্লান আলোয় বুঝতে পারল না ওর চোখে জল কিনা। ঠিক সেই মুহূর্তে ভেতরের করিডরে কে যেন আলো জ্বালিয়ে দিল। একটা ভাঙা রশ্মি এসে পড়ল বসার ঘরে। মরিয়ম হাতটা সরিয়ে নিল। মনসুর এসে ঢুকল ড্রইং রুমে।

রাতে বিছানায় শুয়ে কিংশুকের প্রথম যে মুখখানা মনে পড়ল তা মরিয়মের। সে মুখে প্রবল ভালবাসার একটা ছায়া কাঁপছে। মরিয়ম তাকে সত্যিই কি নিবিড়ভাবে ভালবাসে! তার সহজ চঞ্চল ব্যবহার কিংশুকের মনে দোলা দিয়েছে সত্য কিন্তু আজই কেবল সে বুঝতে পারল তার জন্যে মরিয়মের হৃদয়ের উত্তাপ কতখানি। কিংশুকের কানে মরিয়মের একটা কথা সংগীতের ধ্বনির মত ফিরে ফিরে বাজতে লাগল, তোমার কিছু একটা হলে আমি আর ফিরে আসতাম না ওখান থেকে।

কিংশুক এই প্রথম অনুভব করল, কয়েকটা শব্দ কি আশ্চর্য ক্ষমতায় নক্ষত্র-খচিত ঐ নীল আকাশটাকে হৃদয়ে ভরে দিতে পারে।

আর মনসুর! কিংশুকের চোখের সামনে ফুটে উঠল দ্বিতীয় এই মুখখানা। একটুও কি ঈর্ষার মেঘ ঘনায় না এ মুখে। কিংশুকের মনে হল, কি স্বার্থ ছিল

আজ মনসুরের এমন করে বিরাট বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তাকে উদ্ধার করতে যাওয়ায়। হাউসবোটের একটি ট্যুরিস্টের প্রতি কর্তব্য? না, কখনো কেউ শুধু সেজন্যে নিজের জীবন এমন করে বিপন্ন করতে পারে বলে মনে হয় না। শুধুমাত্র নিজের ভালবাসার পরীক্ষা দিতেই এগিয়ে গেছে মনসুর। মরিয়মের সেই মুহূর্তের আকুলতা একটি ভিন্ন পুরুষের জন্য, মনসুরকে আহত না করে তার মনে সঞ্চিত ভালবাসার শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে। সেই ভালবাসার জোরেই সে পেরেছে মৃত্যুর মুখোমুখি নির্ভীকের মত দাঁড়াতে। কিংশুকের মনে হল মনসুর বহু ব্যবহৃত বিশেষণগুলোর একেবারে বাইরে।

গুলমার্গের সেই বিপদের দিনগুলোর পর থেকে একটুও সুযোগ নষ্ট হতে দেয় না মরিয়ম। হোটেলের অবসরের ফাঁকে ফাঁকে সে পালিয়ে আসে হাউসবোটে।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই বলে, এ্যাই কি করছ?

কিংশুক ছবির পাতা থেকে মুখ তুলে চোখে মুখে হাসি ছড়ায়।

পাশে নিবিষ্ট হয়ে বসে ছবির কাজ দেখতে থাকে মরিয়ম।

সেদিন কিংশুক এঁকেছে ডাল লেকে সূর্যাস্তের ছবি। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবেছে। সোনালী আর লালে মেশা একটা উজ্জ্বল ছটা আকাশের মেঘ আর ডালের জলকে রাঙিয়ে দিয়েছে। জলের ঢেউগুলো সোনালী মধুর রঙ থেকে ধীরে ধীরে পাংশু হয়ে এসেছে। দুই তীরের পপলার গাছ সিলুয়েট, ঠিক যেন রাতের ছোঁয়ায় মুছে গেছে প্রাণের সবুজ রঙ। একটি শিকারা দিনান্তের রঙ গায়ে মেখে কাজের শেষে ফিরে চলেছে।

মরিয়ম ছবি দেখতে দেখতে বলল, হঠাৎ তোমার সূর্যাস্তের ছবি আঁকার প্রেরণা এল কেন কিংশুক।

শেষের তুলির রঙটুকু জলে ধুয়ে নিতে নিতে কিংশুক বলল, ঐ শিকারাটার মত তার শিল্পীরও ঘরে ফেরার ঘণ্টা বেজেছে।

মরিয়ম বলল, সত্যি যাচ্ছ?

কিংশুক হেসে বলল, সারা জীবন কি এখানে থাকব বলে এসেছি।

একটা ম্লান হাসি মুখে ফুটিয়ে মরিয়ম বলল, ঠিক, একদিন তো তোমাকে ফিরতেই হবে। ছুটিও তো তোমার ফুরিয়েছে।

কিংশুক বলল, এক এক সময় মনে হয় কেন এলাম এই রূপের জগতে, প্রাণের মেলায়। না এলেই বুঝি ভাল হত।

মরিয়ম প্রায় অস্ফুট গলায় বলল, আমারও তাই মনে হয়। তোমার আসার চেয়ে না আসাই ছিল অনেক ভাল।

কিংশুক পরিস্থিতিটাকে আর ভারী হতে দিতে চাইল না। সে প্রসঙ্গ পাল্টে নিয়ে বলল, জান মরিয়ম, আজ দুপুরে বিতস্তা এসেছিল এখানে।

মরিয়ম কিছু শোনার জন্যে তাকিয়ে রইল।

কিংশুক বলল, প্রথম অনুযোগ, আমি দীর্ঘদিন কেন যাইনি ওদের ওখানে।

তারপর আমার আঁকা ছবিগুলো টেবিলের থেকে তুলে নিয়ে একটি একটি করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

সোনমার্গে তুমি যেখানে পাইন গাছের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিলে, সেই ছবিখানা অনেকক্ষণ ধরে দেখে বলল, মেয়েটিকে খুব চেনা চেনা লাগছে।

আমি কোন উত্তর করলাম না দেখে আবার বলল, খুব সুন্দর হয়েছে ছবিটা। মরিয়মকে লাল সোয়েটারখানা বড় সুন্দর মানিয়েছে।

বললাম, আমার আঁকা ছবিটা এখন বেশ বুঝতে পারলাম, একটুও উৎরোয়নি।

ও আমার কথা শুনে প্রশ্ন চিহ্ন চোখে মুখে এঁকে তাকাল।

বললাম, আমি যখন ছবি আঁকি তখন বিশেষ কোন মুখ আমার ছবিতে ফুটে ওঠে না। একটা বিশেষ মুড বা ভাবকে আমি ধরে রাখতে চাই। এই ছবির মেয়েটি যদি তোমার চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ে থাকে তাহলে শিল্পী তার শক্তি হারিয়েছে বলতে হবে।

বিতস্তা বলল, অতশত বুঝি না, তবে ছবিখানা খুব ভাল হয়েছে, বেশ বোঝা যাচ্ছে খুব দরদ দিয়ে এঁকেছেন।

কথা না বাড়িয়ে বললাম, তোমার ভাল লেগেছে তাতেই আমি খুশী।

বিতস্তা অমনি বলল, আমার যা খারাপ লাগে আপনার কিন্তু তাও ভাল লাগে।

অবাক হয়ে বললাম, কি রকম ?

বিতস্তা আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রায় কান্না ভাঙা গলায় ও বলল, কেউ আমার জন্যে পাত্রের খোঁজ করুক, এ আমার বড় খারাপ লাগে কিংশুকদা। আর আপনি ঐ কাজটুকু করতে পারলে আনন্দ পান। দোহাই আপনার আর যাই করুন, আমার জন্যে পাত্রের খোঁজ অন্ততঃ আপনি করবেন না।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল বিতস্তা।

মরিয়ম বলল, আর ঠিক ওর চলে যাবার পরেই মনটা তোমার কাশ্মীর ছেড়ে পালাই পালাই করল। সঙ্গে সঙ্গে বিদায়ের এই ছবিখানা আঁকতে বসে গেলে।

কিংশুক বলল, অসাধারণ তোমার অনুমান ক্ষমতা মরিয়ম।

মরিয়ম অমনি বলল, শুধু মুখের প্রশংসায় চলবে না, পুরস্কার দাও।

আমার ক্ষমতার ভেতর যা আছে তাই দেব, বল কি তোমার চাই।

মরিয়ম কি ভাবল, তারপর কিংশুকের দিকে তাকিয়ে বলল, আজ পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় ডালের জলে নৌকা করে ঘুরে বেড়াব।

কিংশুক বলল, অতি উত্তম কথা মরিয়ম, আমি মনসুরকে এখুনি শিকারা তৈরী করতে বলছি।

মরিয়ম বলল, শিল্পীদের মাথায় কি বাস্তব বুদ্ধির এত ঘাটতি। শুধু আমি আর তুমি থাকব নৌকায়। লেকের জল, আকাশের চাঁদ আজ রাতে শুধু আমাদের।

কিংশুক বলল, তোমার অভিনব প্রস্তাবে আমার পূর্ণ সমর্থন জানবে।

মরিয়ম উঠে যাবার আগে বলল, এ ঘাটে নয়, আমার হোটেল থেকে একটু এগিয়ে একটা ভাঙা ঘাট পাবে, সেখানে থাকবে আমার নৌকো চীনার গাছের ছায়ার গভীরে। ভাঙা ঘাটে সাবধানে নেমো।

মরিয়ম চলে গেল। কিংশুক বসে বসে কতক্ষণ ধরে ভাবল মরিয়মের কথা। চলে যাবার ঘণ্টা যতই বেজে উঠছে, মরিয়মকে কাছে ধরে রাখার ইচ্ছেটা জাগছে তত বেশী।

কনকনে ডিসেম্বরের শীত। নৌকা ভেসে চলেছে চার চীনার ডাইনে রেখে মোগল গার্ডেনের দিকে। মরিয়ম ওস্তাদ মাঝি। বৈঠার ঘায়ে তর্ তর্ করে এগিয়ে চলেছে নৌকো।

কিংশুক কথা বলল, আর একদিন এমনি এসেছিলাম ডালে শিকারা করে।

মরিয়ম বলল, সেদিন পাশে ছিল বিতস্তা আর তার বাবা।

কিংশুক বলল, সেদিন সূর্যাস্তের সমারোহ ছিল আকাশে।

মরিয়ম বলল, আর আজ আকাশে সূর্যাস্তের পরের ছবিটা দেখাতে তোমাকে আনলাম। ঐ দেখ লেকের জলে এগিয়ে এসেছে যে পপ্‌লার বীথি, তার মাথায় রূপোলী চাঁদটা উঁকি দিচ্ছে।

কিংশুক তাকিয়ে রইল সেদিকে। কতক্ষণ পরে বলল, এ ছবি কোন দিন ভুলব না মরিয়ম।

তুমি জাত শিল্পী কিংশুক, শুধু চোখেই তোমার ছবি ফোটে না, মনেও ফোটে।

কিংশুক অন্য কথা পাড়ল, তুমি একদিন বলেছিলে মরিয়ম, ফরেন ট্যুরিস্টরা গুলমার্গে স্কী খেলার জন্যে ভীড় করবে, সে কবে?

মরিয়ম বলল, সময় হয়েছে।

কিংশুকের গলায় আবার প্রশ্ন বেজে উঠল, তুমি স্কী ভালবাস, তাই না মরিয়ম?

মরিয়ম বলল, ভালবাসতাম একদিন।

কিংশুক অবাক হয়ে বলল, তার মানে! গত বছরও তো তুমি ফরেনারদের নিয়ে দারুণভাবে স্কী করেছ।

মরিয়ম উদাস গলায় বলল, হয়ত এ বছরও নামতে হবে স্কী-এর মাঠে, কিন্তু খেলা বুঝি আর হবে না।

কিংশুক বলল, কেন মরিয়ম?

ভুলে গেছি খেলা। খেলতে গেলেই আছাড় খেতে হবে পায়ে পায়ে।

কিংশুক বলল, এ আমি বিশ্বাস করি না মরিয়ম। কোনদিন তোমার ও দুটো পা তার জোর হারাবে না।

হাসল মরিয়ম। বলল, শুধু পায়ের জোরে কি খেলা হয় কিংশুক। সব খেলাতেই চাই মনের জোর।

কিংশুক বলল, এখানেও তোমার শক্তির শেষ নেই।

মরিয়ম বলল, তাই জানতাম এতদিন, আল্লা বোধহয় আমার সে অহংকার-টুকুও ভেঙে দিলেন।

কিংশুক কোন কথা বলতে পারল না।

একটা আর্চের ভেতর দিয়ে নৌকাটাকে ওপারের লেকে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে মরিয়ম বলল, বড় দুরন্ত জীবন ছিল আমার কিংশুক। কোন কাজে হার মানিনি। কোন বাধাকে স্বীকার করিনি। একটা দুরন্ত ডানাওয়ালা পাখির মত পাহাড়ে পাহাড়ে, জলে জলে উড়ে আর ভেসে বেড়িয়েছি। জীবনে মধু আর কটু দুটো রসই আমি পান করেছি, মুখে বিকারের বিন্দুমাত্র চিহ্ন না এঁকে। কিন্তু আজ বুঝেছি জীবনে এমন জায়গা আছে যেখানে থেমে দাঁড়াতে হয়, যেখানে হার মানতে হয়।

কিংশুক বলল, এ কথা কেন মরিয়ম?

মরিয়ম বলল, জীবনে বিরাট একটা পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ সত্যটার মুখ স্পষ্ট করে দেখতে পেলাম।

পাতলা একটা হিমেল কুয়াশা কয়েক মুহূর্তের জন্যে ওদের ঢেকে ফেলল। আবার ওরা বেরিয়ে এল আলোয়।

মরিয়ম বলল, আমার জীবনে একটা অপূর্ণতার দুঃখ আছে, কিংশুক। সে দুঃখ কাউকে জানাবার নয়। তাই সে দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমি একটি ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি এসে এমন করে আমাকে নাড়া দিলে যাতে আমার ব্যবস্থার দেয়ালগুলোতে চিড় ধরে গেল।

কিংশুক অপরাধীর মত বসে রইল নৌকায়।

একসময় মরিয়ম বলল, আচ্ছা কিংশুক, তোমার মায়ের কথা মনে পড়ছে না?

কিংশুক বলল, অনেকদিন মাকে আমার ছেড়ে এসেছি মরিয়ম। মা আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন, বেশ বুঝতে পারছি।

হাসল মরিয়ম, বলল, ছবির জগতে থেকে তোমার কিন্তু মাকে তেমন করে মনে পড়েনি।

কিংশুক মনে মনে লজ্জিত হল, তবু বলল, তোমার কথা মিথ্যে নয় মরিয়ম। মা যেমন করে আমার কথা ভাবেন, আমি সত্যি তেমন করে ভাবতে পারি না।

নৌকাটা এসে ভিড়ল মোগল গার্ডেনের প্রায় গা ছুঁয়ে। মরিয়ম প্রথম নৌকা থেকে নেমে হাত বাড়িয়ে দিল কিংশুকের দিকে।

কিংশুক বলল, আমি একাই নামতে পারব।

মরিয়ম বলল, জায়গাটা আমার চেনা, তোমার অচেনা, হাত ধরতে আপত্তি কি?

কিংশুক হাত ধরে নেমে পড়ল। মরিয়মের হাতের ভেতর কিংশুকের হাত।

মরিয়ম হেসে বলল, তোমার হাতখানা এমনি করে যদি সারাজীবন ধরে রেখে দিতে পারতাম। কিন্তু রাখতে চাইলেই তো আর রাখা যায় না।

কিংশুক মরিয়মের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল না। ডালের কুলে তারা দুজনে দাঁড়িয়ে রইল।

সামনের লেকটা মনে হল যেন অচেনা একটা জগৎ। কেমন রহস্য আর মায়ার মন্ত্র দিয়ে গড়া। পীরপাঞ্জাল বরফের চাদর জড়িয়ে বসে আছে। পেছনে পাহাড়ের কোলে চীনার আর পপ্‌লারের তলায় মোগল সম্রাটদের তৈরী বাগান। চাঁদের আলো আর পাতলা কুয়াশা যেন মসলিনের একখানা ওড়্‌না দিয়ে ঘুমন্ত সুন্দরী মেয়ের শরীরটা ঢেকে দিয়েছে।

কিংশুক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

মরিয়ম বলল, জানো কিংশুক, আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগে সম্রাট জাহাঙ্গীর তার প্রিয়তমা নুরজাহানের হাত ধরে এই হ্রদের তীরে এসে দাঁড়াত। তখনও আকাশে পূর্ণ চাঁদটা এমনি করে থাকত তাকিয়ে। নুরজাহান সম্রাটের হাতে ধরে উঠত শিকারায়। গানের কলি সুরের হাওয়ায় ভর করে ছড়িয়ে পড়ত হ্রদের জলে। একটা মিহি সুরের জলতরঙ্গ বেজে উঠত। কতক্ষণ জলবিহার করে আবার ফিরে আসত সম্রাট। তারপর দু'জনে ঐ উদ্যানের চত্বরে বসে কাটিয়ে দিত সারাটা রাত।

গার্ডেনের দিকে ফিরে মরিয়ম বলল, কিংশুক, আমাদের সকলের ভেতরেই একজন সম্রাট অথবা সম্রাজ্ঞী বাস করছে। প্রেমের যে কোন একটা মুহূর্ত আমাদের হাত ধরে সিংহাসনে এনে বসিয়ে দেয়।

কিংশুক বলল, মরিয়ম, অদ্ভুত লাগছে আজকের এই রাত। চেনা জগৎটাকে চোখের সামনে থেকে একেবারে সরিয়ে দিয়েছে।

মরিয়ম কতক্ষণ কোন কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইল। কিংশুক দেখল মরিয়মের চোখে জল।

তুমি কাঁদছ মরিয়ম ?

মরিয়ম বলল, আজকের এই মুহূর্তটির আনন্দের ভারটুকু আমি বইতে পারছি না কিংশুক, তাই কাঁদছি।

কিংশুক এবার বলল, চল মরিয়ম ফেরা যাক্‌, আস্তানায় ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

মরিয়ম চোখ মুছে স্থির হল। কিংশুকের হাতখানা দৃঢ়ভাবে ধরে রেখে বলল, আর একটুখানি এসো আমার সঙ্গে, হয়ত আর কোনদিন দেখা হবে না, আমার সত্যিকারের সংসারটা তুমি দেখে যাও।

ওরা এল মোগল গার্ডেনের পাশ কাটিয়ে একটা ক্ষেতির ধারে। দুটো পপ্‌লার গাছের তলায় টিন আর কাঠ দিয়ে তৈরী ছোট্ট একখানা বাড়ি।

দরজায় কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে দরজাটা খুলে দিল কেউ।

মরিয়ম বলল, তুমি একটু দাঁড়াও কিংশুক, আমি এখুনি আসছি।

ঘরের ভেতর থেকে একটা বাতি জ্বেলে নিয়ে এসে কিংশুকের সামনে দাঁড়াল মরিয়ম। পেছনে একটি বছর তের বয়েসের মেয়ে দাঁড়িয়ে।

মরিয়ম বলল, ভেতরে এস কিংশুক।

কিংশুক মরিয়মের পেছনে পেছনে গিয়ে ঢুকল একখানা ছোট ঘরে।

বস এখানে।

কিংশুক বসে বসে দেখতে লাগল। আসবাবপত্রের একেবারেই বাহুল্য নেই ঘরখানার ভেতর, তবে ছিমছাম পরিচ্ছন্ন।

মরিয়ম বলল, এই ঘরখানা আমার। আর এই মেয়েটি হল নাজিমা, আমার ঘরের দেখাশোনা তদারকী করে। বয়সে ছোট কিন্তু নিখুঁত এর কাজ।

মরিয়ম একটু থেমে বলল, তোমার্ তাড়া আছে ফেরার, চল তোমাকে পাশের ঘরখানা দেখিয়ে আনি।

কিংশুককে নিয়ে মরিয়ম পাশের একটি ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। অকাতরে পাঁচ সাতটি মেয়ে ঘুমুচ্ছে। ছয় থেকে দশ বছরের ভেতর বয়েস হবে তাদের।

কিংশুক বলল, এরা কারা মরিয়ম?

মরিয়ম বলল, এরা আমার পথ থেকে কুড়োনো মানিক। এদের খেতে পরতে দিতে পারে না মা বাবারা। আমি তাই এনে রেখেছি এখানে। কাজের চাপ যখন কম থাকে তখন এদের নিজেই পড়াই। নইলে সারাদিন এরা ঘুরে বেড়ায় মোগল গার্ডেনে। পাখির ডাক শোনে, দু'চোখ ভরে ফুলপাতা দেখে। প্রজাপতির পেছনে ছোটে। ছাগল আর ভেড়া আছে, তাদের চরায় আর খেলা করে তাদের সঙ্গে।

কিংশুক বলল, আশ্চর্য সুন্দর তোমার খেলাঘর। তুমি যে শিশুদের এমন করে ভালবাস তা কেউ বুঝতে পারবে না তোমার বাইরের ঐ দুরন্ত জীবনের ছবিখানা দেখে।

মরিয়ম কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। কি যেন ভাবল আপন মনে। তারপর একসময় অনেক গভীর থেকে বলল, মনের মধ্যে মন থাকে কিংশুক। সে মনটাকে তো সবার খুঁজে পাবার কথা নয়। কোন সাগরের কোন্ তলে মুক্তো পাওয়া যায় সে শুধু অভিজ্ঞ ডুবুরীতেই জানে সাধারণে সাত সাগরের ঢেউ গুনেই কাল কাটায়।

কিংশুক বলল, আজ তোমার একটা নতুন ছবি দেখলাম মরিয়ম।

দোহাই তোমার, আমার এ একান্ত গোপন সংসারের কথাটুকু যেন ফাঁস করে দিও না কারো কাছে,—মরিয়মের গলায় মিনতির সুর বেজে উঠল।

সে একটু থেমে আবার বলল, সবাই জানে আমি একটা পাঠশালা খুলেছি, এর বেশী কারো কিছু জানা নেই।

কিংশুক বলল, যদি আজকের রাতে এখনো না আসতাম তাহলে তোমার অনেকখানি না জেনেই আমাকে চলে যেতে হত।

মরিয়ম বলল, এসো, তোমার রাত হল, বোটে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কিংশুক আর মরিয়ম বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আসার সময় নাজিমাকে বলল, বাস চালু থাকলে ফিরে আসব, না আসতে পারলে কিছু যেন ভেব না। ভয় পাবার কিছু নেই।

ছোট্ট গৃহিণী নাজিমা মাথা নাড়ল।

আবার সেই লেকের বুকে ভেসে চলা। বাঁধানো আর্চটা পেরিয়ে ওপারের লেকে পৌঁছনোর আগেই নৌকোটা আর্চের একপাশে ঠেকিয়ে ডাঙায় উঠে পড়ল

মরিয়ম। একটা বিশেষ জায়গায় কৌশলে বেঁধে ফেলল নৌকোটা।

ততক্ষণে নিজেই ডাঙায় উঠে পড়েছে কিংশুক।

মরিয়ম বলল, এবার আমার হাত ধরে ডাঙায় উঠতে পৌরুষে বাধল, তাই না কিংশুক?

ম্লান হাসি ফুটে উঠল কিংশুকের মুখে। বলল, যা চিরদিন ধরে রাখতে দেবে না তাকে দু'দণ্ড ধরে থেকে কি লাভ বল?

মরিয়ম উঠে এসে দুটো হাতই ধরল কিংশুকের। বলল, দারুণ রাগ হচ্ছে আমার ওপর তাই না কিংশুক?

রাগ নয় মরিয়ম, মনে হচ্ছে দু'জনে অপরিচয়ের অন্ধকারে থেকে গেলেই ভাল হত।

মরিয়ম বলল, এ কথা কেন কিংশুক, চলার পথে বন্ধুত্ব হয় না কারো সঙ্গে?

জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভেসে চলার বন্ধুত্বে আমি বিশ্বাসী নই মরিয়ম।

মরিয়ম কিংশুককে ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে হেসে বলল, বড্ড সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে কিংশুক। আমি এলাম চাঁদের আলোয় একটুখানি বেড়াব বলে, আর তুমি সব পরিস্থিতিটাকে গভীর করে তুলছ।

কিংশুক বলল, চল এগোই।

ওরা দু'দিকে লেকের মাঝখানের পথটা দিয়ে হেঁটে চলল। আকাশে চাঁদ। নক্ষত্রগুলোকে অতি শীতল বরফের উজ্জ্বল টুকরোর মত মনে হচ্ছিল। দূরের পাহাড়, পপলার সবই সিলুয়েট ছবি হয়ে গেছে। লেকের জলে চাঁদ এক একটা বিশেষ জায়গা বেছে নিয়ে তার জ্যোৎস্না ঢেলে দিচ্ছে। সেই জায়গাগুলোতে এক একটি আলোর পরী যেন নাচছিল।

ওরা চলছিল। কোন কথা ছিল না ওদের মুখে। ভালবাসার শ্রেষ্ঠ অনুভূতিগুলো বোধহয় এমনি নীরবতার ভেতরে লালিত হয়।

কতক্ষণ পরে মরিয়ম কথা বলল, এই প্রচণ্ড শীতে কতখানি উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটা যায় তার উদাহরণ আমরা দু'জন, তাই না কিংশুক?

আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না মরিয়ম। মনে হচ্ছে যেন শুধু আজকে নয়, অনেকদিন আগে আমাদের এই চলা শুরু হয়েছে।

মরিয়ম বলল, তুমি বড় বেশী রোমান্টিক কিংশুক।

জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি রোমান্সের ভেতর থেকেই জন্ম নেয় মরিয়ম। এই মুহূর্তে একটি নারী আর পুরুষ পরস্পরের সান্নিধ্য চাইছে এটা তুমি মিথ্যে বলে অস্বীকার করতে পার?

কিংশুক হঠাৎ উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দু'হাতে তুলে ধরল মরিয়মের মুখ। বলল, বল মরিয়ম, কোন্ মিথ্যুক আমাদের এই মুহূর্তটিকে সত্য নয় বলে প্রচার করবে?

কিংশুকের অঞ্জলিবদ্ধ হাতে মরিয়মের মুখ। সমস্ত প্রচলিত উপমা এই ছবিটির কাছে এসে ম্লান হয়ে গেল।

কিংশুক কতক্ষণ তাকিয়ে রইল মরিয়মের মুখের দিকে। মরিয়মও দেখছিল

কিংশুককে, পলক পড়ছিল না তার চোখে। হঠাৎ ঝকঝকে দুটি ঝিনুকের মত চোখ বন্ধ হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে অনেক দামী দুটো মুক্তোর বিন্দু খসে গড়িয়ে পড়ল মরিয়মের গাল বেয়ে।

কিংশুক মরিয়মের মুখখানাকে নিজের হাতের অঞ্জলি থেকে মুক্তি দিয়ে বলল, এই মুহূর্তটিকে তুমি চোখের জলে ভিজিয়ে দিলে মরিয়ম?

মরিয়ম প্রথমে মাথা নাড়াল। তারপর বলল, আমি তোমার ভালবাসাকে একটুও লঘু করতে চাইনি কিংশুক। শুধু আমার ভালবাসায় বিধাতাপুরুষের যে অভিশাপ আছে তারই কথা ভেবে নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি।

বিস্ময় কিংশুকের চোখে। একটা চাপা কণ্ঠস্বর বেজে উঠল, তোমার ভালবাসায় অভিশাপ! কিসের অভিশাপ মরিয়ম?

কান্নার ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে এল কথা, আমাকে তোমার ভালবাসা জানিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিও না কিংশুক। আমি পারি একটি পুরুষের দেহমনের সঙ্গিনী হতে কিন্তু বিধাতা আমাকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করেছেন মাতৃত্ব থেকে। কিংশুক, স্ত্রী হয়ে তোমাকে তৃপ্তি দিতে পারব, কিন্তু একটি সুন্দর শিশু তোমাকে উপহার দিতে পারব না, এ কথা ভাবলে আমি পাগল হয়ে যাব।

কিংশুক বলল, তোমার বলিষ্ঠ উচ্ছল জীবনটাই আমাকে আকৃষ্ট করেছে, ওরই ভেতর আমি দেখতে পেয়েছি আমার শিল্পের প্রেরণা।

মরিয়ম মাথা নেড়ে বলল, হয় না, তা হয় না কিংশুক। উত্তেজনা, উত্তাপ একদিন নিভে আসবেই, তখন সমস্ত মন তার সঞ্চিত স্নেহটুকু ঝরিয়ে দেবার জন্য বুভুক্ষু হয়ে উঠবে। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার গ্রন্থিটা যখন আলগা হয়ে যায় তখন ওই স্নেহ এসেই যে দু' হাত দিয়ে শিথিল গ্রন্থিটাকে শক্ত করে ধরে কিংশুক।

অস্বীকারের ভঙ্গীতে কিংশুক মাথা নেড়ে বলল, তোমার আমার প্রয়োজন এক নয় মরিয়ম।

এ সবার প্রয়োজনের কথা কিংশুক। এখন যা অপ্রয়োজনীয় বলে তুমি অস্বীকার করবে, সংসারের পথে কিছুটা এগিয়ে যাবার পর তাকেই তোমার অনেক বেশী প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে।

একটু থেমে মরিয়ম বলল, চল এবার ফেরা যাক্। হাউসবোটে মনসুর তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। এত রাত দেখে সে নিশ্চয়ই চিন্তিত হয়েছে।

ওরা নৌকার দিকে ফিরে হাঁটতে লাগল।

মরিয়ম এক সময় স্বগতোক্তির মত করে বলল, দবীরও আমাকে বিয়ে প্রথম দিনগুলোতে তার ভালবাসার উচ্ছ্বাসে আবেগে স্নান করিয়ে দিত। কিন্তু কি নিষ্ঠুর হয়ে উঠল দবীর, যখন ডাক্তারের মুখে শুনল তার মরিয়ম কোনদিন মা হতে পারবে না। কিংশুক, শুধু তোমাকে ভালবাসি বলেই তোমার কাছ থেকে এমন করে সরে আসতে চাইছি। দবীরের মত তোমাকে আমি আর হারাতে চাই না। আমার বঞ্চিত মাতৃত্বের দুঃখ শুধু আমাকেই বইতে দাও।

এরপর হাতে গোনা কয়েকটি দিন মাত্র শ্রীনগরে ছিল কিংশুক। বহু প্রতিক্ষা করেও মরিয়মের দেখা পায় নি সে হাউসবোটে। এদিকে ডিসেম্বরের শেষে এত বরফ পড়তে শুরু করেছে, যে কোন দিন কাশ্মীর থেকে ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। শ্রীনগর ছেড়ে আসার আগের দিন সন্ধায় কিংশুক গেল হোটেল ডালভিউতে। রিসেপশান রুমে মরিয়মের চেয়ারে বসে আছে একটি যুবক। কিংশুক তার কাছে খোঁজ নিয়ে জানল, ফরেন ট্যুরিস্টদের সঙ্গে মরিয়ম গেছে গুলমার্গ।

একটু হেসে, কথায় খানিকটা গর্বের সুর ঢেলে যুবকটি বলল, মরিয়ম ছাড়া কাশ্মীরে স্কী-এর আসরই বসবে না মিস্টার।

বোটে ফিরে এল কিংশুক। ক'দিন ধরে যে ছবিখানা আঁকছিল তাতে শেষ তুলির কয়েকটা টান দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

অনেক ডালিয়া আর প্রজাপতির মাঝখানে মরিয়ম দাঁড়িয়ে। তাকে ঘিরে কয়েকটি শিশুর হাসি।

পরের দিন চলে আসার সময় মনসুরের হাত ধরে বলল কিংশুক, মরিয়মকে দেখো মনসুর। যদি তার সত্যি কারের কোন বন্ধু থাকে, সে তুমি। আর আমার হয়ে এই ছবিখানা দিও মরিয়মকে।

মনসুর লম্বা ফারাণের হাতায় চোখ মুছে বলল, বাবুসাহেব আপনাকে কোন দিনও ভুলতে পারব না।

ভুলতে সত্যিই পারে নি মনসুর। পাঁচ বছর পরে তাই কিংশুককে দারুণ অবাক করে দিয়ে এল মনসুরের চিঠি।

বাবুসাহেব,

আমার চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে যাবেন জানি। পাঁচ বছর পরে একটা নৌকাওয়ালা পুরোনো খাতার ঠিকানা হাতড়ে আপনাকে চিঠি পাঠাবে, এ আপনার একেবারে ভাবনার বাইরে, তাই না বাবুসাহেব!

তবু চিঠি আমাকে পাঠাতেই হল। অনেকবার ভেবেছি, আপনাকে বিরক্ত করব না বাবুজী, কিন্তু কাশ্মীর ছেড়ে যাবার সময় আপনি আমাকে বলে গিয়েছিলেন, মরিয়মকে যেন আমি দেখি।

আপনার কথা আমি সাধ্যমত রাখার চেষ্টা করেছি। ওর বিপদে পাশে দাঁড়িয়েছি, ওর ডাকে সব সময় সাড়া দিয়েছি, কিন্তু পারি নি শুধু ওর খেয়াল-খুশীর সঙ্গে তাল রেখে চলতে। আর এইখানেই আমি হেরে গেছি বাবুজী।

আমি জানি ও মনের দিক থেকে একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, কিন্তু কোনদিন ও কারো কাছে সান্ত্বনা চায় না। যখন ও সবচেয়ে বেশী মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে তখন ওকে দেখলে মনে হয় ও যেন ভীষণ রকম মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে সময় কাউকে কাছে ঘেঁষতেই দেয় না। তখন আমি শুধু দূর থেকে ওকে লক্ষ্য করি, কাছে যাই না, সামান্য সান্ত্বনার কথাও শোনাই না।

যখন নিজের মধ্যে জ্বলতে জ্বলতে ও এক সময় নিভে যায় তখন হঠাৎ কোন

একদিন চলে আসে আমার বোটে। এসেই বলে, মনসুর বড় ক্লান্ত, কফি বানাও।

কতদিন কফি তৈরী করে এনে দেখেছি ও ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে বিছানায়। বাবুজী, আপনি পেছনের যে ঘরটাকে শোবার ঘর করেছিলেন, ঐ ঘরের ডিভানে পরম নিশ্চিন্তে ওকে কতদিন ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছি।

আমার তৈরী কফি ঠাণ্ডা হয়েছে, তবু কোনদিন ডাকহাঁক করে ওর ঘুম ভাঙাইনি।

ঘুম থেকে উঠেই ও লজ্জা পেয়েছে। আমি বলেছি, তুমি বস, এই আমি কফি আনছি।

আপনি চলে যাবার প্রায় সাত আট দিন পরে ও গুলমার্গ থেকে সাহেবদের সঙ্গে স্কী সেরে হোটেলে ফিরে এল। দূর থেকে ওকে দেখলাম। মনে হল বড় ক্লান্ত। বিকেলে হোটেলের বেয়ারা আমাকে ডেকে নিয়ে গেল।

মুখোমুখি হলাম ওর। বাবুজি, ওকে দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম, ভীষণ একটা ঝড় এ ক'দিন বয়ে গেছে ওর ওপর দিয়ে।

ও আমার দিকে কেমন যেন আচ্ছন্ন দুটো চোখ তুলে বলল, মনসুর, এখন নিশ্চয়ই তোমার হাউসবোটটা খালি রয়েছে, ভাবছি হোটেল থেকে ক'দিন ছুটি নিয়ে তোমার ওখানে ঘুমিয়ে কাটাব।

বললাম, কেউ নেই, আর এ শীতে নতুন ভিজিটারের আসার সম্ভাবনাও নেই, তুমি আরামে থাকতে পার।

খুশী হয়ে ওঠার বদলে ওর চোখেমুখে ম্লান একটা ছায়া ঘনিয়ে উঠল।

আমি পরে বুঝেছিলাম, আপনি হাউসবোট ছেড়ে চলে গেছেন কিনা, ও শুধু সে কথাটুকুই জানতে চেয়েছিল।

ও কিন্তু অনেকদিন আর আমার হাউসবোটে আসে নি। ছুটি নিয়ে ও চলে গিয়েছিল মোগল গার্ডেনের পাশে ওর নিজস্ব ডেরায়।

আমি যেদিন শিকারায় করে আপনার ছবিখানা নিয়ে ওর ডেরায় পৌঁছে দিতে গেলাম, ও দেখি একটা পপ্‌লার গাছের তলায় বসে ইংরাজী বই পড়ছে এক মনে।

আমাকে কাছে যেতে দেখে চমকে উঠল, কিন্তু আপনার ছবিখানা পেয়ে চমকালো না। অনেকক্ষণ ছবিটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর একসময় ঘরে ঢুকে গেল ছবিখানা হাতে নিয়ে।

অনেকক্ষণ আমি বসে রইলাম গাছের তলায়। নাজিমা বলে ছোট একটি মেয়ে আমার জন্যে চা আর খাবার নিয়ে এল। তার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, আপনার ছবিখানা নিয়ে মরিয়ম বিছানায় বসে কাঁদছে।

বাবুসাহেব, আজ আপনাকে বলছি, মরিয়ম জীবনে যদি কাউকে তার ভালবাসা দিয়ে থাকে তাহলে সে শুধু আপনাকেই।

পাঁচ বছরের অনেক কথা ছবির মত চোখের ওপর ফুটে উঠছে বাবুজী। সব কথা বলা যায় না চিঠির পাতায়।

আজ যে কথা বলার জন্যে এ চিঠি পাঠাচ্ছি আপনার কাছে, তা হল, মরিয়ম

কাশ্মীর ছেড়ে রাণীক্ষেত রওনা হয়ে গেছে। হোটেল 'ডালভিউ'-এর মালিক রাণীক্ষেতে নতুন হোটেল খুলেছেন। সেখানে কাজ নিয়ে চলে গেল মরিয়ম।

আমার চোখের সামনে থেকে সে সরে গেছে, তাই চিঠি লিখলাম আপনাকে। আপনি কাশ্মীর থেকে চলে যাবার সময় ওকে দেখবার যে দায়িত্ব আমার ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন, তা আমার আর রইল না।

এই পাঁচ বছরে ও যেন নিজেকে একেবারে শেষ করে ফেলতে চেয়েছিল। ফরেনারদের সঙ্গে গাইড হয়ে ঘুরত। কতদিন হোটেলে ফিরত না। গোপনে পহেলগাঁও, গুলমার্গের হোটেলগুলোতে খবর নিয়ে জানতাম, মরিয়ম ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে যখন আসত আমার কাছে তখন সাধ্যমত ওর যত্ন করতাম। ও শুধু পড়ে পড়ে ঘুমুতো আপনার ঐ পেছনের ঘরের বিছানায়।

জানি না বাবুসাহেব, আপনি ঐ ঠিকানায় আছেন, না ঠিকানা বদল করেছেন। তবে একদিন বলেছিলেন, এটা নাকি আপনার স্টুডিওর ঠিকানা। তাই ভরসা করে চিঠি পাঠালাম। সঙ্গে দিলাম মরিয়মের রাণীক্ষেতের ঠিকানা। ইচ্ছে হলে চিঠি দিয়ে ওর সঙ্গে একটা যোগাযোগ রাখতে পারেন। ওর জন্যে দুঃখ হয়। আমি যা এ পাঁচ বছর চেষ্টা করেও পারলাম না, হয়ত আপনার একখানা চিঠিতেই ওর মনের সেই পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে।

আপনার অনুগত মনসুর।

কিংশুক চিঠিখানা পড়া শেষ করে টেবিলের ওপর রাখতেই কোথা থেকে ছুটে এল সাড়ে তিন বছরের পিউ, অর্থাৎ পাপিয়া মুখার্জী।

চিঠিখানা ধরে উল্টেপাল্টে পড়তে লাগল। তার নিজস্ব অভিধানের শব্দগুলো উজাড় করে একটা মিশ্রিত ধ্বনি ঘরে ছড়াতে লাগল।

তারপর হঠাৎ কিংশুকের মুখোমুখি হয়ে বলল, বাপী একটা রেলগাড়ি বানিয়ে দেবে?

হাতের চিঠিখানা পিউ কিংশুকের দিকে গাড়ি তৈরীর উপকরণ হিসেবে এগিয়ে দিল।

একদিন একখণ্ড কাগজে কিংশুক নৌকো বানিয়ে পিউকে অবাক করে দিয়েছিল, তাই আজ ঐ চিঠির কাগজে রেলগাড়ি তৈরীর আর্জি পেশ করল পিউ।

মনে মনে হাসল কিংশুক। শিশুমন কত দূরের ছবি দেখতে পায়। ঐ রেলগাড়িতেই কি একদিন সে পিউকে নিয়ে চলে যাবে রাণীক্ষেতে মরিয়মের কাছে।

রেলগাড়ি বানিয়ে দাও না বাপী?

ছোট পিউ-এর ডাকে কিংশুক তার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে রেলগাড়ির বদলে একটা পাখি বানাতে লেগে গেল।

রাতের রেলগাড়িতে যাত্রীসংখ্যা বড় বেশী ছিল না। শীতের এই দিনগুলোতে পাহাড়ে কেউ বড় একটা বেড়াতে যায় না। কাজের মানুষরাই চলাচল করে।

পাহাড়ী দেশে পেঁছবার আগেই কম্পার্টমেণ্ট ফাঁকা হয়ে যায়।

ঘুম ছিল না কিংশুকের চোখে। সে বসেছিল জানালার ধারে। কাঁচের শার্সির ভেতর দিয়ে তাকিয়েছিল রাতের প্রান্তর আর আকাশের দিকে। শীতের আকাশ অনেক হীরে ছড়িয়েছে। জ্বল জ্বল করে জ্বলছে ক'টা। চাঁদ নেই আকাশে। চাঁদ জাগার তিথি নয় বোধহয় এটা। অথবা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে মরা চাঁদটা শেষ রাতে একা একা জেগে উঠবে। করুণ কুয়াশার চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে হয়ত বিধবার মত স্মৃতিচারণ করবে।

নীচের পৃথিবী এখন হারিয়ে গেছে গভীর অন্ধকারে। জল ডাঙা গাছপালা সব ডুবে আছে একখানা কালো বারোয়ারী কম্বলের তলায়।

কিংশুক রাতের রেলগাড়ি ভালবাসে। সে কোনদিন স্লিপারে ঘুমিয়ে অন্য যাত্রীদের মত রাত কাটায় না। অনেক কষ্ট করে হয়ত জানালার ধারের স্লিপারটা যোগাড় করে। পরিপাটি করে বিছানাও পেতে নেয়, আরাম করে বসে, কিন্তু ঘুম আসে না চোখে।

অখ্যাত কোন স্টেশনের লাল্‌চে মোরাম ছড়ানো প্ল্যাটফর্মের ওপর পুরনো জৌলুস-মরা সোনার মত আলোগুলো লুটিয়ে আছে। গাড়িটা থেমে গেল। কম্পার্টমেন্টে একটিও যাত্রী জেগে নেই। এখানে মেল ট্রেনের থামার কথা নয়, তবু থামল। বেশ লাগল কিংশুকের। দু'একটি রেলের লোক এদিক থেকে ওদিক চলে গেল। হঠাৎ একটা চা-ওলা মাঝরাতে চা চাই কিনা তার নিজস্ব ভাষায় হেঁকে হেঁকে জিজ্ঞেস করে গেল। কিংশুক এক ভাঁড় চা নিল জানলার শার্সীটা তুলে। শীতের রাতে গরম চা, তাও আবার যেখানে পাবার কথা নয় সেখানে দৈবাৎ মিলে যাওয়া। এমনি হঠাৎ পাওয়াগুলো মনে কেমন এক ধরনের যেন চমক দিয়ে যায়।

গাড়িটা এবার চলতে শুরু করেছে। যেন বস্তা বস্তা ভাঙা লোহালক্কড় পাথুরে রাস্তার ওপর দিয়ে কড়্ কড়্ ঝড়্ ঝড়্ শব্দে বাজতে বাজতে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে মেল ট্রেন নিজের মেজাজে চলতে শুরু করল। এখন সারা গাড়িতে একটা দুলুনি লেগেছে।

পিউ শুয়ে আছে ডানদিকের একটা খালি বাঙ্কে। অনেক কটা বাঙ্কই তো এ সময় খালি যায়।

কিংশুক পিউয়ের টিকিট কেটেছে। তার ঠিক ওপরের স্লিপারটিও তাদেরই। কিন্তু পিউকে ওখানে শোয়ান যায় না। ঘুমের ঘোরে নীচে পড়ে গিয়ে একটা কেলেঙ্কারী বাধাবে। তাই ডানদিকের খালি স্লিপারটা দখল করে আছে পিউ।

এখন পিউ ঘুমোচ্ছে। সারাদিন ওই কিন্তু মাতিয়ে রেখেছিল সারা কম্পার্টমেণ্ট।

ও প্রত্যেকটি সীটের কাছে গিয়েছে। ওর কথাবার্তায় আদর কেড়ে নিয়েছে সকলের। কখনো পছন্দমাফিক লোকের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছে। কেউ খাবার সাধলে ও দৌড়ে চলে এসেছে কিংশুকের কাছে। কচি দুটো হাতে কিংশুকের গাল চেপে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে সম্মতি চেয়েছে। কেউ তার গোপন

পরামর্শ জানতে পারল কিনা আড়চোখে চেয়ে চেয়ে তাই আবার দেখেছে।

সবচেয়ে ওর ভাব জমেছিল যে তরুণীটির সঙ্গে সে এখন ঘুমোচ্ছে ওর উল্টো দিকের বাঙ্কে।

অবাঙালী তরুণী বধূ আর তার স্বামীটি প্রথম থেকেই কিংশুকের চোখ টেনেছিল। নতুন বিয়ে, অনুচ্চ গলায় হাসি গল্প চলছিল। মূক অভিব্যক্তি-টাই বেশী। দুপুরের দিকে ছেলেটি মেয়েটির কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। মেয়েটি কি একটা যেন বই পড়ছে, আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে ছেলেটির মুখের দিকে। শীতের মিষ্টি রোদের মত আমেজে ভরা চোখের চাহনি।

কতক্ষণ পরে ছেলেটি ঘুমিয়ে উঠল। এখন পড়া বইয়ের পাতা উল্টে বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো মেয়েটি দেখাতে লাগল ছেলেটিকে।

দু'জনে হাসছিল। পিউ হঠাৎ সিট ছেড়ে উঠে গিয়ে ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কি লক্ষ্য করল। তারপর খিল খিল করে হেসে উঠল। ওরা পিউকে এমন করে হেসে উঠতে দেখে ওকে জড়িয়ে ধরে হাসতে লাগল।

মেয়েটি দারুণ ভাবে জমাতে পারে। নানা রকম মুখ-চোখের ভঙ্গী করে সে কথা জমিয়ে তুলল পিউয়ের সঙ্গে। ওদের প্রশ্ন আর উত্তরে কোন মিল ছিল না। না থাক, ভাব জমানোতে ভাষা কোন বাধাই নয়। দু'এক মিনিটের ভেতরেই বসল ওদের মাঝখানটিতে। হাত নেড়ে পা দুলিয়ে ও কথা বলে যাচ্ছিল। নতুন শেখা দুটো গানের কয়েক কলি গেয়ে উঠে হাততালি আর বাহবা কুড়িয়ে নিল নতুন বন্ধুদের। হঠাৎ আবার কি আবেগের কারণ ঘটল, পিউ মেয়েটির মুখখানা জড়িয়ে ধরে কি যেন বলতে লাগল। ছেলেটি যেন না শোনে তাদের গোপন কথা, এমনি একটা ভাব।

কিংশুকের মনে হল পিউকে এবার একটা সতর্ক করা দরকার। নতুন দম্পতির অসুবিধে হতে পারে। সে অমনি চেঁচিয়ে উঠল, পিউ।

পিউ অসীম বিরক্তিতে তার আর্ধেক বলা কথা ফেলে কিংশুকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, বিরক্ত কর না বলছি।

এ উক্তি কিংশুকের। পিউ কিংশুককে তারই বলা কথা ফিরিয়ে দিল। ছবি আঁকার সময় পিউ রঙ তুলি নিয়ে অনেক বেশী ছড়ানোর খেলায় মেতে উঠলে কিংশুক পিউকে ঐ কথাটি বলে বারণ করার চেষ্টা করে।

সারা দুপুর মেয়েটি পিউকে রাখল কাছে। ওকে বিকেলের জলযোগের ভাগ দিল। এবার আর পিউ এসে কিংশুকের অনুমতি চেয়ে নেবার প্রয়োজন বোধ করল না। খেতে খেতে শুধু কিংশুকের মুখের দিকে তাকাল একবার। ওদের দেওয়া ফল খেল না পিউ, মুচ্ মুচ্ করে চিবুতে লাগল কুচো নিম্‌কি।

কিংশুক ভাবতে লাগল, নতুন স্বামী-স্ত্রী তৃতীয় আর একটি জীবনের স্রষ্টা হতে চায়, তাই পিউকে চাইছে না কাছছাড়া করতে।

রাতে মেয়েটির সঙ্গেই পিউ খেয়েছে। মেয়েটি গল্প করে গান গেয়ে পিউকে ঘুমও পাড়িয়ে দিয়েছে।

কিংশুক ভদ্রতা করে দু'একবার ওদের চা অফার করেছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করেছে মৃদু হেসে।

এখন সবাই ঘুমিয়ে। ওরা হয়ত অনেক দিনের অনেক কথার জগতে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে স্বপ্নের ভেতর।

জানালার দিকে মুখ ফেরাল কিংশুক। আবার সেই অন্ধকারের অথৈতে ডুবে গেল তার দুটি চোখ।

অনেক দূরে এক ঝাঁক জোনাকীর মত ঝিকমিক করে উঠল কোন শিল্প নগরীর আলো। কিংশুকের মনের অনেক গভীর থেকে স্মৃতির জোনাকীগুলো হঠাৎ যেন ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে এল। তারা নাচতে লাগল অন্ধকারের বুকে অজস্র আঁকিবুকি কেটে।

একটি দলছাড়া জোনাকী এগিয়ে আসছে। কিংশুক অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। দল ছেড়ে এইটুকু পথ উড়ে এল, কিন্তু কি আশ্চর্য তার ওড়ার ছন্দটা। কিংশুকের সামনে এসেই সে থমকে দাঁড়াল।

মিষ্টি একটুখানি হাসি ছড়িয়ে বলল, মিঃ মুখার্জী, আপনি ভীষণরকম নির্জনতা ভালবাসেন, তাই না?

চমক লাগল কিংশুকের। সে কি বলবে প্রথমটায় ভেবে পেল না। একরকম করে বলল, কেন বলুন তো?

এই আপনি পিকনিক পার্টি থেকে সরে এলেন নদীর ধারে। বটগাছের আড়ালে নিজেকে গোপন করে রেখেছেন।

কিংশুক বলল, আমি বেশ অসামাজিক তাই না?

না না, আমি কিন্তু মোটেই তা বলতে চাইছি না। আমি বলছি, আপনার মত শিল্পীর পক্ষে অনেকগুলি মানুষের সঙ্গে দারুণরকম ভাল লাগার ব্যাপার নয়। তাই আপনি আপনার নিজের জায়গাটি খুঁজে নিয়েছেন।

কিংশুক বলল, এই বিরাট বটগাছটার শেকড়গুলো সামনের এই নদীর থেকে জলপান করে। তাই কৃতজ্ঞতায় দেখুন ছায়ার শরীর দিয়ে কেমন জল ছুঁয়ে আছে।

মধুশ্রী জোনাকীর মত হঠাৎ মুখে খুশীর আলো জ্বেলে বলল, আপনাকে শুধু শিল্পী বলেই জানতুম কিন্তু আপনার যে আরও একটি বড় গুণ আছে তা জানতুম না।

কিংশুক অবাক হবার মুখভাব দেখিয়ে বলল, যেমন?

আপনি কবি, মস্ত বড় কবি।

কিংশুক আর মধুশ্রী হাসল। মধুশ্রীর হাসিটা জলতরঙ্গ বাজনার মত শোনাল।

কিংশুক বলল, আপনার সেদিনের নাচ কিন্তু অসাধারণ।

আর আপনার স্টেজ সাজানো! বলল মধুশ্রী সপ্রশংস ভঙ্গীতে চোখে মুখে বিশেষ মুদ্রা ফুটিয়ে।

জানেন মিঃ মুখার্জী, সুপর্ণা বলেছিল, মঞ্চ পরিকল্পনার জন্যেই নাকি আমার নাচ সবার অনেক বেশী ভাল লেগেছে। সুপর্ণাকে আপনি নিশ্চয়ই

চেনেন না, ও আমার ইউনিভারসিটির বন্ধু।

কিংশুক বলল, আপনার বন্ধুটির প্রশংসার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

মধুশ্রী বলল, আপনার কৃতজ্ঞতার কথা সুপর্ণাকে জানিয়ে দেব।

হঠাৎ একটু থেমে গিয়ে বলল, কি দরকার আমার জানাবার, দাঁড়ান একটু-খানি, ওকে ডেকে আনছি। যাকে জানাবার তাকে মুখোমুখি জানিয়ে দিন।

কিংশুক বলল, দোহাই আপনার, কৃতজ্ঞতা আমার মনে মনেই থাকে। এই মুহূর্তে কথা বলার একাধিক মানুষ কাছে পেতে মন চাইছে না।

হাসল মধুশ্রী, তবে মনের হাসি মুখে ছায়া ফেলল মাত্র। বলল, ওদিন নাচতে নাচতে যখনই স্টেজে ঢুকেছি তখনই চোখে পড়েছে স্টেজের কোণে রাখা পলাশের ডালটা। কি অদ্ভুত ভঙ্গীতে যে ওটাকে আপনি ওখানে রেখে দিয়েছিলেন, আমার তো মনে হচ্ছিল বসন্তলক্ষ্মী জ্বলন্ত প্রদীপের ডালি হাতে নাচের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে।

কিংশুক বলল, ওই পলাশের ডালটি কিন্তু সেদিন ছিল আপনারই প্রতীক।

মধুশ্রী বলল, আর লাল বাটিকের পর্দায় আঁকা বাঁকা ডালপাতার ফাঁকে যে কোকিলটি ডাকছিল সে কার প্রতীক?

কিংশুক বলল, ও কিন্তু ঋতুপতি নয়। ও বড়জোর ঋতুরাজের জলসাঘরের গাইয়ে হতে পারে। গান গেয়ে ঋতুলক্ষ্মীকে আহ্বান জানাচ্ছিল।

মধুশ্রী কিংশুকের মুখে দিকে তাকিয়ে বলল, কোকিলটা যখন ডেকে উঠল হঠাৎ তখন নাচতে নাচতে সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভুলে গিয়েছিলাম যে পেছন থেকে টেপরেকর্ড চালান হয়েছে।

কিংশুক বলল, এখন বুঝলাম আমার সাজানোর শ্রমটা সার্থক হয়েছে।

যতক্ষণ না আরও চার পাঁচটি অতি কৌতূহলী মেয়ে সেদিন কিংশুক আর মধুশ্রীর আলাপের মধ্যে এসে পড়েছিল ততক্ষণ ওরা কথার সাঁকো দিয়ে দুজনের অজানা মনের নদীটাকে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল।

মেয়েগুলি এসে পড়তেই আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় কথার স্রোতকে বেমালুম ঘুরিয়ে দিলে মধুশ্রী।

আপনি যতই বলুন মিঃ মুখার্জী সেদিনের স্টেজে ঐ কোকিলটা যখন ডেকে উঠল তখন আমার মনে হল যেন একটা দাঁড়কাক ডাকছে। আসল ডাকের সঙ্গে নকল ডাকের, আসল দৃশ্যের সঙ্গে আপনাদের নকল ছবির ফারাক ঠিক তাই।

কৌতূহলী মেয়েগুলি যে দৃশ্য দেখার আশা নিয়ে এসেছিল তা মিটল না। তারা বরং সম্পূর্ণ উল্টো ব্যাপারটাই দেখল। এদের ভেতর তাহলে সেদিনের স্টেজের ব্যাপার নিয়েই কথা কাটাকাটি চলেছে।

মেয়েগুলি তখন কিংশুকের পক্ষ নিয়ে মধুশ্রীর ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি।

নীপা বলল, হঠাৎ তুই এত ক্ষেপে গেলি কেন মধুশ্রী? স্টেজ সাজান আমাদের কিন্তু খুবই ভাল লেগেছিল।

শ্রাবণী বলল, ওয়াণ্ডারফুল। তোর নাচের সঙ্গে সমান নম্বর পাবে।

শ্রাবণী স্কুলে কাজ করছে, তাই তুলনা দিতে গেলেই নম্বর দিয়ে বসে।

মধুশ্রী কিছু একটা প্রতিবাদের ভঙ্গীতে হাত নাড়তে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিলে কেতকী, তুই থাম মধুশ্রী, বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল। দাঁড়কাক যদি সত্যিই স্টেজে ডেকে থাকে তাহলে তোর নাচটাও শ্যাওড়া বনে ঘোর অমাবস্যায় কারা যেন নাচে, ঠিক তাদেরই মত হয়েছিল।

কিংশুক এখন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ছে। মধুশ্রীর কথা ঘোরানোর ব্যাপারটা সে কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল, কিন্তু এখন ঘটনার গতি এমনভাবে গড়াতে দেখে সে একটু বিচলিত হয়েই পড়ল।

কিংশুক ওদের আর কথা বাড়াতে না দিয়েই বলল, আজ কিন্তু আমরা পিকনিক করতে এসেছি, লড়াই করতে নয়। সেদিন রাগহিন্দোলে তিলানার দিয়ে মধুশ্রী যে নাচ নেচেছেন তা অনেকদিন মনে রাখার মত। ওঁর নবরসের প্রকাশটিও সুন্দর হয়েছিল।

নীপা বলল, মিঃ মুখার্জী নাচ সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ দেখছি।

কিংশুক হেসে বলল, আপনার কমপ্লিমেণ্টটা কি রকম হল জানেন, বিশ্ববিখ্যাত কোন এক লেখকের লেখার মধ্যে একটি ওষুধের নাম পেয়ে গবেষক লিখলেন, ভেষজ বিদ্যায় লেখকের অগাধ ব্যুৎপত্তি আমাদের সত্যিই বিস্মিত করে।

নীপা ছাড়া ওরা সকলেই হেসে উঠল।

কিংশুক বলল, নাচের আমি কিছুই বুঝি না। নাচ দেখে ভাল লাগে এটুকু বলতে পারি। দু'একটা শব্দ নাচের বিষয়ে শুনেছি তাই মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

নীপা আহত হয়েছিল, তাই সে সহজে ছাড়ল না, আপনি কি মনে করেন সব কজন গবেষক আপনার বলা ঐ গবেষক নামধারী লোকটির মত?

কিংশুক বলল, বিশ্বাস করুন, সমালোচক, গবেষকদের সম্বন্ধে আমার কেমন যেন একটা ভয় মেশানো ভক্তি আছে। দারুণ দারুণ সব কথা বলেন ওঁরা।

নীপা বলল, তাঁরা তাদের পরিশ্রমলব্ধ বিশ্বাসের কথাই বলেন।

কেতকী বলল, বাপরে, পিকনিকে এসে পরিশ্রমলব্ধ কথা শুনলে আমার কেমন যেন কান ভোঁ ভোঁ আর মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে।

নীপা সম্প্রতি একটি গবেষক যুবকের সঙ্গে বাক্‌বন্ধ। শরৎ সাহিত্যে ক্রন্দন ও ভোজন কতবার কি প্রসঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে, সে সম্বন্ধে ভদ্রলোক গবেষণারত।

নীপা সত্যিই প্রসঙ্গটার অত সহজে ইতি করতে দিত না কিন্তু ওদের কথার ভেতর ঝড়ের মত এসে পড়ল অলোকেন্দু।

বললে, সর্বনাশ হয়েছে।

সবাই অলোকেন্দুর কথা শুনে দারুণ রকম হকচকিয়ে গেল। রান্নার ব্যাপারে কারো শাড়িতে আগুন লাগল নাকি! না কোন সদ্য প্রেমিক ফিয়াসে'র কাছে সাহস দেখাবার জন্যে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আর ওঠেনি!

অলোকেন্দু সবাইকে তটস্থ করে রেখে হঠাৎ সর্বনাশের কারণটা বলে ফেলল,

মাংস রান্না বাকি, তেল নেই।

সবার যেন ধড়ে প্রাণ এল। কেতকী বলল, আপদ গেছে। আদিম মানুষদের মত এখন থেকে আমরা কাঁচা মাংসই ঝলসে খাব। তেলের বালাই আর থাকবে না।

অলোকেন্দু বয়েসে সব চাইতে ছোট তাই উৎসাহ অতিরিক্ত। প্রতিটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ নিউজ সে ডাকগাড়ির গতিতে সবার কাছে পেঁাছে দেয়।

অলোকেন্দু বলল, ইতিমধ্যে তপনদা হিরণদি সবাই গাড়ি নিয়ে তেলের খোঁজে বেরিয়েছিল, কিন্তু এক ফোঁটাও মেলেনি।

শ্রাবণী আবার তপন গুহর সঙ্গে হিরণ সেনের মেলামেশাটা আপদেই বরদাস্ত করতে পারে না। তপন এস, ও, তে ভাল কাজ করছে। শ্রাবণী অনেকদিন থেকে টোপ করে আছে তপনের। হিরণ সেন আজকাল বাপের গাড়ি নিয়ে তপনকে লিফ্‌ট দিতে শুরু করেছে।

তাই অলোকেন্দুর কথার পিঠে শ্রাবণী মন্তব্য করে বসল, জানি, অপয়া হিরণ সেন যেখানে গেছে সেখানেই সব নাস্তি নাস্তি।

কেতকী বলল, হরিণদির দোষ দিচ্ছিস কেন শ্রাবণী। ভূ-ভারতে তেল কোথাও নেই। দেশসুদ্ধ লোক ওপরওয়ালাদের তেল মাখাতে মাখাতে সবটুকু তেল শেষ করে ফেলেছে। মাখতে মাখতেই গেল, রান্নার জুটবে কি করে।

সবাই হাসতে হাসতে সেদিন রান্নার বিপর্যয় কি ঘটল তাই দেখতে চলে গিয়েছিল।

কিংশুক সেদিন ছিল নিমন্ত্রিত। তপন গুহদের দক্ষিণ কলিকাতা ক্লাবে নেচেছিল মধুশ্রী। সত্যি অসাধারণ ওর নাচ। প্রতিটি ঋতু ওর নাচে একেবারে যেন স্টেজে এসে আবির্ভূত হচ্ছিল।

মধুশ্রীর গোপন অনুরোধে ক্লাব থেকে ডাকা হয়েছিল কিংশুককে মঞ্চ সাজানোর জন্যে। মধুশ্রীর বাবা ভারত পাবলিসিটির অন্যতম কর্মকর্তা। তাঁর ফার্মেই কিংশুক চীফ কমার্শিয়াল আর্টিস্ট।

সেই সূত্রে ক্লাবের পিকনিকে কিংশুক ছিল নিমন্ত্রিত।

মধুশ্রী কিংশুককে কাছে পেতে চায়। একটি সুন্দরী শিক্ষিতা নৃত্যনিপুণা ধনীগৃহের কন্যা অর্থাৎ সংবাদপত্রের পাত্র-পাত্রীর কলমকে আলো করে রাখবার মত একটি মেয়ে কিংশুক মুখার্জীর ভেতর কি দেখেছে যে জন্যে নিজেই এসে ধরা দিতে চেয়েছে বারে বারে।

সেদিনের পিকনিকে মধুশ্রী আর কিংশুকের ভেতর যে কথার শুরু সে কথা দক্ষিণেশ্বর, গড়ের মাঠ গঙ্গার ঘাটে ছড়িয়ে ঢেলেও শেষ হল না।

কিংশুক ভয় পেয়েছিল। ফার্মের খোদ কর্মকর্তার মেয়ের সঙ্গে মন দেয়া নেয়া। গরীব শিল্পীর চাকরিটা নিয়েই না টানাটানি পড়ে শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু কিছুই হল না। মধুশ্রী একদিন কিংশুককে নিয়ে গেল তার বাড়ি। কিংশুককে দিয়েই তাদের বিয়ের প্রস্তাবটা পেশ করল।

মধুশ্রীর মা দারুণ খুশীর ভাব দেখালেন। কিংশুক কিন্তু এত সহজে

ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হবে ভাবতে পারেনি। মধুশ্রীর মায়ের সম্মতিতে সে খুশী হয়েছিল ঠিক কিন্তু মনে মনে অবাক হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী।

বিয়ে হল ওদের। মধুশ্রীর বন্ধুরা এসেছিল, কিন্তু এল না একজন। সবাই অবাক হল। শ্রাবণী কেতকীর কানে কানে বলল, মধুশ্রীর নৃত্যগুরু সব্যসাচী চ্যাটার্জীর না আসার কারণটা জানিস?

কেতকী বলল, শুনেছি উনি আমেরিকা যাবার তোড়জোড়ে ব্যস্ত। ওখানে নাকি ঘরটর নেওয়া হয়ে গেছে, আমেরিকানদের ভারতীয় নাচ শেখাবেন।

শ্রাবণী বলল, ভেতরের কথাটা হল, সব্যসাচী চ্যাটার্জী চেয়েছিল মধুশ্রীকে জীবন সঙ্গিনী করে নিয়ে যেতে। বাদ সাধলেন মধুশ্রীর বাবা। তাই সাত তাড়াতাড়ি কিংশুক মুখার্জীর সঙ্গে বিয়েতে রাজী হয়ে গেলেন।

কেতকী বলল, মধুশ্রী সব্যসাচীকে ভালবাসত জানতাম, কিন্তু ওই বা কিংশুককে বিয়ে করতে গেল কেন?

শ্রাবণী সমস্যায় পড়ল। অনেক গূঢ় তত্ত্বের অর্থভেদ করলেও এখানে সে আটকে গেল।

বিয়ের পর নৃত্যশিল্পী আর চিত্রশিল্পীর মিলন যেভাবে ঘটা উচিত ছিল সেভাবে ঘটল না। কিংশুক মধুশ্রীকে স্টেজে নামাতে চাইত, কিন্তু মধুশ্রী একটুও আগ্রহ দেখাত না। বলত, ওসব নাচটাচ বিয়ের আগেই সাজে, বিয়ের পরে নয়।

মনে মনে দুঃখ পেত কিংশুক কিন্তু কিছুই বলত না। একটা প্রতিভা এমনি করে সাধারণ সংসারের কাজে নষ্ট হয়ে যাবে এ তার মত শিল্পীর কাছে খুবই কষ্টের ব্যাপার বলে মনে হত। তার চেয়ে মধুশ্রী যদি বিয়ে না করে নাচের সাধনা করত তাহলে অনেক বেশী খুশী হত কিংশুক। শিল্পকে রক্তের ভেতর যে অনুভব করেছে, শিল্পীরা মৃত্যু সে চাইবে কেমন করে।

এ নিয়ে উপদেশ কিংবা কথা কাটাকাটি কোনটিই করেনি কিংশুক। যে যার নিজের নিজের ভাবনা আর পথচলার অধিকারে সে বিশ্বাসী।

মধুশ্রীর কথা ভাবতে গিয়ে ট্রেনে শীতের রাতেও হঠাৎ ঘামতে লাগল কিংশুক। কতকগুলো চীৎকার যেন তার মাথার ভেতরকার কোষগুলোকে ছিঁড়ে গুঁড়িয়ে দিতে লাগল। মধুশ্রীর বাবার গলাটা বেজে উঠল, তুমি, তুমি আমার মেয়েকে মেরে ফেলেছ। কেন তুমি খবর দাও নি আমাদের। একটা রাস্তার আঁকিয়েকে আকাশে তুলেছিলাম। রাস্কেল, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।

সেই মুহূর্তে বড় কষ্টে দমন করেছিল কিংশুক নিজেকে। তার পকেটেই ছিল মধুশ্রীর চিঠিখানা। সে ঐ লোকটির মুখে ছুঁড়ে মারতে পারত। কিন্তু কিছুই করল না সে। অপমান হজম করে ড্রইংরুম থেকেই বেরিয়ে গেল। শুধু তাই নয়, তারপর থেকে ভারত পাবলিসিটি অফিসেও সে আর যায় নি কোনদিন।

পাপের কোনরকম ছোঁয়ার ভেতরেই সে থাকবে না। পাপের সব কিছু চিহ্ন

কম্পার্টমেন্টে নীলাভ আলো। শীতের রাতের ঘুমে সবাই ডুবে আছে। পিউ ঘুমোচ্ছে। সারাদিনের দুরন্তপনা রাতের নিশ্ছিদ্র ঘুমের ভেতর হারিয়ে গেছে। একটা গভীর মমতা কিংশুকের সমস্ত মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তার মনে হল, মধুশ্রীকে হারালেও পিউকে সে হারিয়ে যেতে দেবে না কোনদিন।

গাড়ি বদল হল বেরিলিতে। ঘুমন্ত পিউকে বুকে তুলে নিয়ে দেরাদুনের গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল কিংশুক। বেরিলিতে নতুন গাড়িতে উঠে পিউকে তেমনি শুইয়ে দিলে। কাঠ-গুদাম পর্যন্ত পথটুকু ফার্স্ট ক্লাশেই যাবে কিংশুক। ঠিক তেমনি জানালার পাশে বসে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। হঠাৎ একটা ভাবনা এল তার মনে। এখন কি বিপরীত গোলার্ধে সন্ধ্যার আয়োজন চলেছে! এখানে শেষ রাতের ঠান্ডা হাওয়ায় ভোরের সূচনা হচ্ছে। কিংশুকের চোখে ফুটে উঠল একটি ছবি। আমেরিকার কোন একটি শহরের রঙ্গমঞ্চ আলোর মালায় সাজান। ধীরে ধীরে নিভে গেল দীপ। আশ্চর্য একটা হলুদ আলো লুটিয়ে পড়ল রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে। এক তাপস বসে আছে পদ্মাসনে। আশ্রমের তরুলতার নিবিড় থেকে কোকিল ডেকে উঠল। হঠাৎ একটা গোলাপী আভার আলো হরিণের মত নেচে ফিরতে লাগল ইতস্ততঃ। ঐ তো স্বর্গনটী মেনকা। নৃত্যের বৃত্ত রচনা করে অনিন্দ্য দেহভঙ্গিমায় তাপস বিশ্বামিত্রকে প্রদক্ষিণ করে ফিরছে।

ধ্যান ভঙ্গ হল তাপসের। লীলা নৃত্যে মত্ত হল পুরুষ আর প্রকৃতি। ধীরে ধীরে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন নেমে এল। পুরুষ নারীর হাত ধরে সেই কামনার স্রোতে হারিয়ে গেল।

এরপর স্টেজে ফুটে উঠল নীলাভ আলো। স্বর্গনটী মেনকা ফেলে দিয়ে যাচ্ছে আপন কন্যা শকুন্তলাকে। নবজাতকের কান্নায় সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ কেঁপে উঠেছে। জননী-হৃদয় সে কান্নায় ভেঙে পড়ছে না। যেন একটা স্বপ্নের সীমান্ত পেরিয়ে চলে যাচ্ছে মমতাহীন এক জননী।

আবার ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা চলতে শুরু করল। ছিঁড়ে গেল কিংশুকের সুদূর স্বপ্নের সূক্ষ্ম জাল।

পিউয়ের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, মেনকা আর শকুন্তলার কাহিনী অতীতের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে অভিনীত হচ্ছে তারই চোখের সামনে।

ভোরের আকাশে আলো ফুটছে। কিংশুক তাকিয়ে আছে সকালের আয়োজনের দিকে। গাছের পাতায়, প্রান্তরের ঘাসে শিশিরের সমারোহ। ভোরের আলোয় হঠাৎ তার মনে হল কাল রাতের নটী স্বর্গে ফিরে যাবার পথে তার হীরেমণির হার ছড়িয়ে ফেলে গেছে পথে প্রান্তরে।

পিউ এসে হি হি করতে করতে ঢুকে পড়ল এক ফাঁকে কিংশুকের কম্বলের ভিতর। মুখ লুকালো কিংশুকের বুকে।

কিংশুক মুখ নামিয়ে বলল, সারা রাত মনে পড়ল না, এখন এসেছ আদর কাড়তে।

পিউ কম্বলের ভেতর থেকে মুখখানা বের করে বলল, তুমি রাতে আমার

কাছে শোওনি বাপী ?

কিংশুক বলল, এই তো আমি সারারাত এখানে বসে আছি। তুমি এলে না, তাই ঘুমও আর এল না।

অবিশ্বাসের একটা দৃষ্টি হেনে পিউ আবার লুকলো কম্বলের ভেতর।

পিউ জানে বাপীর বুক পরম নিশ্চিন্ত একটা আশ্রয়।

কাঠ-গুদামে গাড়ি পেঁাছতেই পিউকে নিয়ে নেমে পড়ল কিংশুক। এক বাণ্ডিল কম্বল আর একখানা সুটকেশ কুলির মাথায় চাপিয়ে দিয়ে পিউর হাত ধরে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে এল।

ট্যাক্সিতে বসে বলল, রাণীক্ষেত।

ড্রাইভার একটু তাকাল আরোহীর দিকে। অবাক হয়েছে সে। আরোহী আর ড্রাইভারে কোন দরদস্তুর হল না। কাছে পিঠে নৈনীতাল নয়, একেবারে রাণীক্ষেত যেতে চাইছে মানুষটি। তা হোক্, যাত্রী নিয়ে যাওয়াই তার কাজ, অকারণ কৌতূহল দেখানোর কাজ তার নয়।

গাড়ি উঠছে ওপরে। সমতল নীচে নেমে যাচ্ছে ক্রমশঃ। ওপরের থেকে নীচের উপত্যকা গাছপালা আঁকা ছবির মত দেখাচ্ছে। বাঁয়ে একটা পাহাড়ী বস্তি দেখা গেল। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে চাষের ফসল। অতি জীর্ণ শীতের পোশাকে গা ঢেকে রোদ্দুর পোহাচ্ছে ক'টা পাহাড়ী ছেলেমেয়ে।

পিউ বড় বড় চোখ মেলে ওদের দেখছিল। হঠাৎ কিংশুকের দিকে ফিরে প্রশ্ন করে বসল, ওরা খুব লক্ষ্মী ছেলে না বাপী ?

কিংশুক হেসে বলল, কি করে বুঝলে ?

পিউ বলল, ওরা দুষ্টুমি করে না। চুপ করে বসে থাকে।

এর বেশী পিউ লক্ষ্মী ছেলের ব্যাখ্যা দিতে জানে না।

অনেক পাহাড় আর অনেক চীড় পাইনের বন পেরিয়ে এল গাড়ি।

এক জায়গায় দেখা গেল বনের ভেতর উঁচুনীচু পাহাড়ী পথে ফসলের বোঝা নিয়ে চলেছে পাহাড়ী মেয়েরা। মাথায় ঘোমটার মত করে স্কার্ফ জড়ান। গায়ে সোয়েটার। পরনে কালো রঙের ঘাগরা। ওরা ছন্দিত তালে লয়ে চলে যাচ্ছিল।

কিংশুকের মনে হল আঁকার মত সুন্দর একখানা সাবজেক্ট।

পিউ চেঁচাতে শুরু করেছে, কোথায় যাচ্ছ তোমরা ? আমাকে নিয়ে যাবে তোমাদের সঙ্গে ?

ওরা ভাষা বোঝে না, কিন্তু শিশু কণ্ঠের ডাক ঠিকই ওদের কানে গিয়ে পেঁাছেছে।

ওরা থমকে দাঁড়াল। হেসে তাকাল গাড়ির দিকে। পিউকে দেখে হাত নাড়তে লাগল।

ব্যস, ততক্ষণ খরগোশের মত কিংশুকের বুকে মুখ লুকিয়েছে পিউ। মাঝে মাঝে পাশ দিয়ে একটুখানি দেখে নিয়ে আবার মুখ লুকোচ্ছে। ওরা ওদের মাথার ঐ বিরাট বিরাট ঝুপড়িগুলোর ভেতর যদি ওকে নিয়ে পালায়।

গাড়ি ওদের পেছনে ফেলে এখন অনেকখানি দূরে চলে এসেছে। নিরাপদ দূরত্বে থেকে গাড়ির পেছনের কাঁচ দিয়ে এখন ওদের দেখছে পিউ। মাঝে মাঝে ছোট দুটো হাত বিপুলভাবে নেড়ে চলেছে।

পথের মাঝে মাঝে গাড়ি দাঁত করাচ্ছিল কিংশুক। চীড় পাইনের ফাঁকে ফাঁকে ঝকঝকে বরফের পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে। ক্যানভাসে আঁকা প্রকৃতির এক একখানা অতি মূল্যবান ছবি। চোখ ভরে দেখেও যেন আশ মেটে না।

পিউ হঠাৎ আকাশের নীলে ছোট আঙুল তুলে বলল, ওটা কী পাখী বাপী?

কিংশুক দেখল। একটা খুব বড় আকারে চিল ডানা মেলে উড়ছে। চিলটা যখন চক্কর দিয়ে রোদ্দুরের মুখোমুখি আসছে তখন ওর গলা আর বুকে আশ্চর্য রকমের একটা রূপোলী সাদা ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

কিংশুক বলল, ঐ পাখীটার নাম চিল। পিটু যেমন করে বায়না ধরে, চেঁচায়, ও পাখীটাও ঠিক তেমনি চেঁচায়।

পিউ অনেকক্ষণ ঘাড় কাত করে কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করল। তারপর বলল, কই চিল তো চেঁচায় না।

কিংশুক বলল, চিলটা খুব লক্ষ্মী হয়ে গেছে, ঠিক পিউ রাণীর মত।

পথে একটা মন্দির পড়ল। পিউ-এর আবার প্রশ্ন, ওটা কি?

কিংশুক বলল, মন্দির, হনুমানজীর মন্দির।

পিউ অমনি বলল, আমার হনুমান আছে। কামড়ায় না, খুব ভাল হনুমান।

কিংশুক ওকে একদিন প্যারাগনে নিয়ে গিয়েছিল। অনেক পুতুলের ভেতর কোন্‌টা নেবে ঠিক করতে পারেনি। শেষে একটা স্প্রীং দেওয়া হনুমানকে বাঁশের ওপব ওঠা-নামা করতে দেখে দারুণ পছন্দ হয়ে যায়। সেদিন থেকে ও হনুমানের ভক্ত হয়ে পড়ে।

গাড়িটা অনেক পাহাড় ডিঙিয়ে এক সময়ে এসে ঢুকল রূপবতী রাণীক্ষেতের এলাকায়।

ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল অলকা হোটেলের সামনে।

ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে কিংশুক হোটেলের গাইডের সঙ্গে এসে উঠল অলকায়। এখন সে ইচ্ছে করেই খোঁজ নিল না হোটেল পাইন-ভিউয়ের। অলকায় থেকে পথের ক্লান্তি দূর করে যাবে মরিয়মের খোঁজে পাইন-ভিউতে।

দুপুরটা কাটল একখানা ঘুমের ভেতর। শেষবেলায় বিকেলের চা-পর্ব চুকিয়ে বেরুলো পাইন-ভিউ-এর খোঁজে। চৌবাটিয়ার দিকে উঠে যেতে পথে পড়বে নতুন হোটেল পাইন-ভিউ। ধীরে ধীরে বাঁধান সুন্দর পাহাড়ী পথ ধরে উঠতে লাগল কিংশুক। চড়াই ভাঙতে মাঝে মাঝে কষ্ট হচ্ছিল তাব। কিন্তু অবাক করে দিল তাকে পিউ। একটা নোটন পায়রার মত ঝোটন বাঁধা মেয়েটা বকম্ বকম্ করতে করতে সমানে চড়াই ভেঙে উঠতে লাগল ওপরে। একটুও কোলে ওঠার জন্যে বায়না ধরল না।

ওরা এসে পড়ল একটা পাইন বনের কাছে। পথ থেকেই তীরচিহ্ন দিয়ে পাইন-ভিউ হোটেলে যাবার নিশানা দেওয়া হয়েছে। ঢোকার পথে থমকে দাঁড়াল কিংশুক। পাইন বনের ভেতর সাদা রঙের একটা দোতলা বাড়ি। ছাদটা সুন্দর লাল রঙে রাঙানো। কিংশুক দেখল বিরাট লন জুড়ে মরশুমী ফুলের বেড।

সবচেয়ে ভাল লাগল পাইনের ফাঁকে দূরের তুষার চূড়াগুলোর ছবি। শেষ সূর্যের সোনায় নন্দাদেবী ত্রিশূল চৌখাম্বা তখন স্বর্গের স্বর্ণভাণ্ডার বলে মনে হচ্ছিল।

মগ্ন হয়ে ছবি দেখছিল কিংশুক। কখন হোটেলের লনে ফুলেরা হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়েছে পিউকে তা খেয়াল করেনি সে। এখন আবার সোনার রঙে ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে সিঁদুরের আভা। বিদায়ী সূর্য কোন্ পাহাড়ের আড়াল থেকে তার সিঁদুরের রঙের কিরণ পাঠাচ্ছে তা বোঝার উপায় নেই।

কিংশুকের মনে পড়ল একটা কথা। কোন এক শিল্পীর মুখ থেকে শুনেছিল একবার। অবনীন্দ্রনাথ রঙ-তুলি নিয়ে আকাশের রঙ ধরতে বসতেন। কত অপরূপ রঙের ছবি যে ফুটে উঠত তাঁর কাগজে তার লেখাজোখা নেই। কিন্তু তিনি তার অধিকাংশই ফেলে দিতেন। অশান্ত হয়ে বলতেন, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেল।

কিংশুকের মনে হল, এ রঙ কোনদিন কোন শিল্পীই ধরতে পারে না।

কয়েকটা কথার শব্দে কিংশুকের তন্ময়তা ভেঙে গেল। কথাগুলো ভেসে আসছিল হোটেলের বাগানের ওধার থেকেই। কিংশুক বুঝল তার অন্যমনস্কতার সুযোগে পিউ সাজানো বাগানে ট্রেস্‌পাস্ করেছে।

একটি নারীকন্ঠ বার বার প্রশ্ন করে পিউয়ের জানার চেষ্টা করছে। পিউ নির্বাক। কিংশুক উঁকি দিয়ে দেখল পিউয়ের হাতে এক গোছা মরশুমী ফুল। বিনা অনুমতিতে ছিঁড়ে নেওয়া। ধরা পড়ে গিয়ে অপমানবোধ জেগেছে। পালিয়ে আসতেও পারছে না। এদিকে হিন্দী-ভাষাটা অজানা থাকায় প্রশ্ন-কর্ত্রীর প্রশ্নের জবাব দেওয়াও তার পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়েছে।

পাঁচ বছর পরেও কিংশুকের চিনতে ভুল হল না মুখখানা। তেমনি একটু-খানি লম্বা আকারের মুখ, বড় বড় চোখ দুটো অচঞ্চল। কেমন যেন লক্ষ্যের দিকে স্থির হয়ে থাকে।

কিংশুক পথের উপর দাঁড়িয়ে একটা পাইন গাছের আড়ালে নিজেকে গোপন করে ব্যাপারটা দেখতে লাগল।

পিউ একবার তাকাল পথের দিকে। যদি বাপীকে দেখতে পায়, কিন্তু তার সে ইচ্ছা পূর্ণ হল না। সেই মুহূর্তে পিউয়ের মনে হল সে সম্পূর্ণ অপরিচয়ের জগতে হারিয়ে গেছে। আর মনে হওয়া মাত্র হাতের ফুল ফেলে দিয়ে দুটি চোখ ছোট দুটি হাতে ঢেকে ফেলল।

এক মুহূর্ত দেরি হল না মরিয়মের। সে পিউকে বুকের ভেতর লুফে নিল। পিউয়ের উদগত চোখের জল তখন সশব্দে ঝরে পড়ছে।

মরিয়ম পিউকে নানা কথা বলে ভোলাতে চেষ্টা করল। কিংশুক শুনতে পেল মরিয়ম তখনও হিন্দী ভাষায় পিউকে সান্ত্বনা দিয়ে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছে। পিউ তার ভাষা যতই বুঝতে পারছে না কান্না তার ততই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। শেষে মরিয়ম পিঙ্ক রঙের এক গুচ্ছ চন্দ্রমল্লিকা তুলে নিয়ে পিউয়ের হাতে ভরে দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

পিউ কান্না থামিয়ে একবার তাকাল ফুলের দিকে, কিন্তু ঐ ফুলগুলো তার অসহায় অবস্থার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে হল না। সে আবার তার কান্নার খেইটাকে ধরে ফেলল।

মরিয়ম এবার একটা টুকটুকে লাল গোলাপ পিউয়ের চোখের সামনে তুলে ধরতেই পছন্দ হয়ে গেল পিউয়ের। সে হাত বাড়িয়ে গোলাপটা ধরল। এখন কান্না থেমে গেছে। মরিয়মের কোল থেকে নেমে পড়ে পিউ বলল, বাপীর কাছে যাব।

মরিয়ম তো অবাক। মেয়েটি তো বাঙালী! মরিয়ম অমনি বলল, কোথায় তোমার বাপী?

পিউ বেশ অবাক হয়ে মরিয়মের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এতক্ষণে তার মনে হল এই মেয়েটি খুব একটা অপরিচিত নয়।

আবার বলল মরিয়ম, কোথায় তোমার বাপী?

পিউ আঙুল তুলে দেখাল পথের দিকে। মরিয়ম পিউয়ের হাত ধরে বাগান পেরিয়ে আসতে লাগল পায়ে পায়ে।

এখন গাছের আড়াল আর কিংশুকের কাছে আত্মগোপনের উপযুক্ত জায়গা বলে মনে হল না। সে গেটের ধারে এসে পাইন-ভিউ হোটেলের দিকে তাকিয়ে রইল।

মরিয়ম পিউয়ের হাত ধরে কাছাকাছি এসে পড়েছে। এখন মরিয়ম পিউয়ের বন্ধু। পিউ বক্‌বক্‌ করতে করতে আসছে, মরিয়ম মুগ্ধ শ্রোতা, মুখ নীচু করে তার কথা শুনছে।

পিউ কিংশুককে দেখতে পেয়ে এক গাল হেসে চেঁচিয়ে উঠল, বাপী আমি হারিয়ে গেছি।

পিউ কথা বলার সময় বর্তমান আর অতীত কালের ভেদাভেদটা মানে না।

মরিয়ম পিউয়ের ওপর থেকে চোখ তুলে তাকাল।

মরিয়ম হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়েছে। একটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আলোছায়া খেলে যাচ্ছে তার মুখে। পাঁচটা বছরের অদর্শনের পুরু পর্দা ঠেলে সরিয়ে সে অবাক হয়ে দেখার চেষ্টা করছে তার ফেলে আসা অতীতটাকে।

কিংশুক মুখে হাসি টেনে এনে বলল, চিনতে পার মরিয়ম?

মরিয়ম কিন্তু কোন কথা বলতে পারল না। সে কিংশুকের মুখের ওপর থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে পিউকে হঠাৎ বুকে জড়িয়ে ধরে অন্যদিকে তাকাল। কিংশুক বেশ বুঝতে পারল মরিয়ম তার এই মুহূর্তের আবেগকে কিংশুকের সামনে ঢেলে নিঃশেষ করে দিতে চায় না। নিজেকে আড়ালে সরিয়ে রাখার

একটা দারুণ চেষ্টায় পিউকে সে বুকে জড়িয়ে রাখল কতক্ষণ। ওকে একটা ফুল তুলে দেবার ছলে নিজের টলোমলো চোখের জল মুছে ফেলল। তারপর এক সময় যখন পিউয়ের হাত ধরে কিংশুকের মুখোমুখি হল, তখন চোখের জলের চিহ্ন নেই, মুখে বর্ষাভেজা কোমল একটা আলো খেলা করছে।

মরিয়মের প্রথম কথা, তোমার চেয়ে তোমার মেয়ে আরও সুন্দর হয়েছে।

কিংশুক শুধু হাসল। সে হাসি সুখের কি দুঃখের, কি সুখ-দুঃখ অতিক্রমের তা বোঝা গেল না।

মরিয়মের দ্বিতীয় কথা, কবে এলে?

কিংশুক বললে, আজই।

মরিয়ম ঘাড়টা কাত করে জিজ্ঞেস করল, উঠেছ কোথায়?

অলকায়।

মরিয়ম আর কিছু বলল না, তেমনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

কিংশুক আবার বলল, ট্যাক্সি একেবারে এনে তুলল অলকায়। তাই ওখানেই উঠেছি।

মরিয়ম ছোট্ট করে বলল, ভাল হোটেল।

কিংশুক বলল, ভালমন্দ বুঝি না, একটা আশ্রয় হলেই হল।

মরিয়ম ম্লান একটুখানি হাসল, তারপর বলল, তুমি তো আর ঝড়ের রাতে এসে পড়নি কিংশুক যে, যেমন তেমন একটা আশ্রয় পেলেই চালিয়ে নেবে।

মরিয়ম পাঁচ বছর আগের কাশ্মীরের এক ঝড়ের রাতের ছবি দেখছিল। দেখছিল, এক অসহায় যুবকের রাতের আশ্রয়ের জন্য আকুতি।

কিংশুক কথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, কি করে বুঝলে আমি ঝড়ের ভেতর এসে পড়িনি। বাইরের ঝড় তোমার পাইন বনের ডালপাতা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে না ঠিক, কিন্তু ঝড় যে আর কোথাও বইছে না, সে কথা তুমি কি করে বুঝলে?

মরিয়ম কিংশুকের কথার পিঠে, আর কথা বাড়াল না। একেবারে আলাদা প্রশ্ন করে বসল, বউকে এখানে আনলেন না কেন, হোটেলে একা একা কি ভাল লাগবে?

কিংশুক হাসল মনে মনে। বলল, কে সঙ্গে আসবে আর কে আসবে না সে বিচার যে করবে তার ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

মরিয়ম হয়ত অনুমান করল কিংশুকের স্ত্রী ক্লান্ত হয়ে পড়ায় ওপরে উঠতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। তাই ও প্রসঙ্গের জের না টেনে শুধু বলল, বসবে না আমার হোটেলে?

পরমুহূর্তে কি ভেবে বলল, তুমি হয়ত আরও উপরে উঠে যেতে পারবে, কিন্তু তোমার মেয়ে তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে পারবে না। তাই একটু জিরিয়ে নাও। পরে ইচ্ছে হলে আবার ওঠ ওপরে।

কিংশুক বলল, আর ওপরে ওঠার ইচ্ছে নেই আমার মরিয়ম। তোমার সঙ্গে দেখা করতেই এলুম।

মরিয়মের গলায় বিস্ময়, আমার সঙ্গে। কি করে জানলে আমি এখানে আছি ?

কিংশুক হেসে বলল, মানুষ গ্রহান্তরের খবর বয়ে আনছে আর এই এত কাছের রাণীক্ষেতের খবরটুকু যোগাড় করা কি এতই শক্ত।

মরিয়ম পিউয়ের হাত ধরে হোটেলের দিকে চলল। কিংশুক চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে চলল মরিয়মের পিছে পিছে।

হোটেলের সামনে এসে চীড় পাইনের দুটো গাছ দেখতে পেল কিংশুক। একটা লতা জড়িয়ে আছে গাছগুলোর কাণ্ড। বড় বড় পাতার ফাঁকে ফাঁকে লালের ছিটে দেওয়া গাঢ় হলুদ ফুলের গুচ্ছ উঁকি দিচ্ছিল। তলায় সবুজ রঙে রাঙানো কয়েকখানা চেয়ার পড়ে আছে। মাঝখানে গোল একটা টেবিল। সুন্দর সাদা টেবিল ক্লথ পাতা। ভায়োলেট, পিঙ্ক, গ্রীন ব্লু রঙের সুতোয় ছোট ছোট চোখ জুড়ানো কাশ্মীরী লতাপাতা ফুলের কাজ।

মরিয়ম কিংশুককে বসতে ইঙ্গিত করে নিজে পিউকে বসিয়ে দিল আর একখানা চেয়ারে।

পিউ তৎক্ষণাৎ নেমে পড়ে মরিয়মের হাত ধরে বলল, আমাকে ফুল দেবে না ? বাগানে চল।

কিংশুক বলল, দুষ্টুমি করেনা পিউ, লক্ষ্মী হয়ে বস।

পিউ কিন্তু কিংশুকের কথায় খুব বেশী আমল দিল না। সে মুখে পীড়াপীড়ি না করলেও মরিয়মের হাত ধরে টানতে লাগল।

মরিয়ম কিংশুকের দিকে তাকিয়ে বলল, খুব মিষ্টি নাম রেখেছ মেয়ের। বহুক্ষণ সাধ্যসাধনা করেও ওর মুখ থেকে নামটা জানতে পারিনি।

একটু থেমে আবার বলল, নামটার জন্যে প্রশংসাটা কার প্রাপ্য, তোমার না মিসেসের ?

কিংশুক বলল, পিউকে জন্ম দিয়েছে যে, প্রাপ্যটা তারই বেশী হবার কথা। কারণ পিউ না থাকলে নামকরণের প্রশ্নই উঠত না। তবে নামকরণ যদি বল তাহলে সেটা এই আনাড়ীর।

মরিয়ম বলল, প্রশংসাটা তোমারই প্রাপ্য ছিল, কিন্তু তুমি সেটাকে ভাগ করে নিলে। তাই আর একটা প্রশংসা তোমার পাওনা হয়ে গেল।

কিংশুক বলল, কি রকম ?

মরিয়ম হেসে বলল, তোমার পত্নীপ্রেম প্রশংসা পাবার যোগ্য।

মরিয়মের হাসিতে যোগ দিতে পারল না কিংশুক।

মরিয়ম একটুখানি বসতে বলে পিউকে নিয়ে চলে গেল বাগানে। কিংশুক দূরের ভ্যালীর দিকে চেয়ে অদৃশ্য এক শিল্পীর বিরাট ক্যানভাসের ওপর রঙ বোলানো দেখতে লাগল।

কতক্ষণ পরে হোটেলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মরিয়ম। পেছনে বেয়ারার হাতে কফি আর স্ন্যাক্‌স্‌।

টেবিলে রাখা হলে পট থেকে কফি ঢেলে মরিয়ম কিংশুকের হাতে দিয়ে বলল,

দেখ মুখে রোচে কিনা। এটা মনসুরের হাতের তৈরি কফি তো নয়।

কাপটা হাতে নিয়ে কফিতে চুমুক দিয়ে স্থির হয়ে কতক্ষণ বসে রইল কিংশুক। মনসুরের কথায় পুরানো দিনগুলো চোখের ওপর ছায়া ফেলতে লাগল।

মরিয়ম পাশের চেয়ারে বসতেই কিংশুক বলল, পিউ কোথায়?

মরিয়ম হেসে বলল, ভয় নেই, হারাবে না। দুদিকের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন পাইন বনের ভেতর স্লিপে চেপে সে তামাম দুনিয়া ভুলে আছে। এখন তার সবচেয়ে বড় বন্ধু আমাদের হোটেলের কুক্ শিউশরণ।

কিংশুক বলল, পিউয়ের জন্যে আমার একটুও ভাবনা নেই। যার হাতে দিয়েছি সেই বুঝুক। আমি শুধু বলছিলাম, ওকে একটু সাবধানে রাখা দরকার। মূল্যবান বস্তুকে ও কানাকড়ি মূল্য দেয় না। হাতের কাছে পেলেই ভেঙে চুরমার করে দেয়।

মরিয়ম হেসে বলল, অত ভাবনা তোমায় করতে হবে না, আসল লোকের জিম্মায় রেখে এসেছি।

কিংশুক মনসুরের কথাতেই এবার ফিরে এল। বলল, কেমন আছে মনসুর?

মরিয়ম বলল, হাউসবোট আর ট্যুরিস্টদের নিয়েই আছে।

কিংশুক বলল, মনসুরকে ভোলা যায় না মরিয়ম।

মরিয়ম কাপটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে বলল, মনসুরও তোমাকে ভোলেনি কিংশুক। তোমার চলে আসার কয়েক সপ্তাহ পরেও আমি তাকে তোমার প্রসঙ্গ উঠলেই ভেঙে পড়তে দেখেছি।

কিংশুক কোন কথা না বলে কফির কাপে শেষ কয়েকটা চুমুক দিলে।

মরিয়ম বলল, কই বিতস্তার খবর জানতে চাইলে না তো?

আবার নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিয়ে বলল, অবশ্য এখন আর তোমার বিতস্তার খবর নিয়েই বা দরকার কি?

কিংশুক বুঝল মরিয়ম তার বিবাহিত জীবনের ইঙ্গিতই করছে।

হেসে উঠে কিংশুক বলল, বিয়ে করেছি বলে কি সবকিছু স্ত্রীর কাছে বাঁধা দিয়ে রেখেছি নাকি!

মরিয়মও হেসে বলল, দিয়েছই তো, কয়েক বছর বিয়ের পর বন্ধকী জিনিসগুলো সব তামাদি হয়ে যায়। তখন জোরে কথা বলার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলে সবাই। চারদিকে তাকিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে দু' একটা কথা বলে।

কিংশুক বলল, যার সে বালাই নেই? অর্থাৎ ধর যার স্ত্রী নেই।

মরিয়ম কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। একটু থেমে কিংশুকের মুখের ওপর দুটো চোখের দৃষ্টি স্থির রেখে কি যেন পড়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু পাঠোদ্ধার করতে না পেরে বলল, সে কথা এখানে আসছে না। তোমার ক্ষেত্রে বিতস্তার প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল।

কিংশুক অমনি বলল, কোন একটি মেয়ের কাছে অন্য একটি মেয়ের প্রসঙ্গ না তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

মরিয়ম হঠাৎ বিনা দ্বিধায় কিংশুকের হাতখানা ধরে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ওঠ তো এখন বুদ্ধির জাহাজ। হোটেলের ভেতর গরমে বসে যত চাও শোনাব বিতস্তার কথা। আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলে অযথা ডাক্তারের ফি গুণতে হবে।

কিংশুক উঠে দাঁড়াল। মরিয়ম তার হাত ধরে একটি তরুণী চঞ্চল মেয়ের মত টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে চলল।

করিডোরে তখনও আলো জ্বলে নি। আধো আলো আঁধারিতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে মরিয়ম বলল, তোমার বউ এ দৃশ্য দেখলে নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে না।

কিংশুক হেসে বলল, সংসারে এই হল বিপদ, স্বামীরা যাতে খুশী হয় স্ত্রীরা সব সময় তাতে আনন্দ পায় না। বরং উল্টোটাই হয়।

মরিয়ম অমনি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে বলল, তোমরা মহাপুরুষেরা যত মহৎ কাজ করে যাবে আর স্ত্রীরা চোখ বুজে তা সমর্থন করবে, এ রকম আশা কর কি করে।

কথা বলতে বলতে ওরা এসে ঢুকল বসার ঘরে।

সাজানো ঘর। শীতের দিনে ভীড় নেই ট্যুরিস্টদের তেমন। ন্যুটিমার ফরেনার রয়েছে পাশের ব্লকে। হোটেল প্রায় শূন্য।

ওরা বসল সোফায় পাশাপাশি।

মরিময় বলল, জান কিংশুক, পিউকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কে তোমাকে বেশী ভালবাসে, মা না বাপী? ও বলল কি জানো, বাপী।

কিংশুক বলল, তাই বলেছে বুঝি?

মরিয়ম অমনি বলল, মেয়েগুলো একটু বেশী বাপ-ঘেঁষা হয়, তাই না?

মাথা নেড়ে সমর্থন জানিয়ে হাসতে লাগল কিংশুক।

মরিয়ম হঠাৎ অন্য কথায় এল, আমি ভাবতেও পারি নি কিংশুক, তোমার সঙ্গে আমার এভাবে দেখা হয়ে যাবে।

কিংশুক বলল, পৃথিবীতে এমন অনেক অঘটন ঘটে যায় বলেই তো এত বিস্ময়।

মরিয়ম বলল, কিংশুক, আমার স্বামী ধবীর আমাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী যদি কেউ দিয়ে থাকে তো সে তুমি।

কিংশুক এর কোন উত্তর দিতে পারল না। মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে পাক দিতে লাগল।

মরিয়ম বলল, আজ তোমার সুখের জীবনকে আমি আমার কষ্টের কথা দিয়ে ভারী করে তুলতে চাই না কিংশুক। শুধু তুমি জানবে মরিয়ম একজন শিল্পীকে ভালবাসে, আর তার সুখের জন্যে সে প্রায় রোজ প্রার্থনা জানায় তার আল্লার কাছে।

কিংশুক বলল, তোমার প্রার্থনা তোমার আল্লা হয়ত শুনেছেন মরিয়ম। আজ এই মুহূর্তে আমার মত সুখী কেউ আছে কিনা ভাবতে পারছি না।

মরিয়ম বলল, কিংশুক, এখানেই ইতি করে দাও এ প্রসঙ্গের। আমরা সকলেই

ুর্বল, কখন যে কোথায় নিজেদের হারিয়ে ফেলি তার ঠিক নেই।

একটু থেমে বলল, কাল যদি তোমার আপত্তি না থাকে তাহলে যাব তোমার হোটেলে। আলাপ করে আসব তোমার স্ত্রীর সঙ্গে।

কিংশুক বলল, আমি আর পিউ ছাড়া আমার সংসারে আর কেউ নেই রিয়ম।

কিংশুকের গলায় কি সুর বাজল, মরিয়ম অবাক চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। পিউ যে মাকে এত অল্প বয়সে হারিয়েছে এ কথা বিশ্বাস করতেও ন তার কষ্ট হচ্ছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তটিতে দু'টি ব্যথিত হৃদয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়াল পিউ। সে দুজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

কিংশুক হঠাৎ বলল, তুমি কোন দুষ্টুমি করনি তো পিউ।

পিউ বলল, আমি স্লিপে চড়েছি বাপী।

তারপর দুটো হাত দু'পাশে প্রসারিত করে দিয়ে বলল, এই এতো ফুল লেছি।

কিংশুক বলল, তুমি খুব দুষ্টুমি করেছ, বাগানের ফুল কেউ ছেঁড়ে না। তামাকে হোটেলে বন্ধ করে রেখে এসে ভাল হত।

কিংশুকের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল পিউ। ধীরে ধীরে ছোট টি তার কেঁপে কেঁপে উঠল। তারপর কখন দুটো কচি হাত তুলে ঢেকে ফলল বড় বড় দুটো চোখ।

মরিয়ম ততক্ষণে অনেক দুঃখের সাগর থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে পিউকে ঠাৎ বুকে জড়িয়ে ধরে সেখান থেকে সরে গেল ভেতরের কোন ঘরে।

মরিয়ম চলে গেলে আশ্চর্য পরিতৃপ্তি কিংশুকের সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফলল। তার মনে হল, এমন অনেক দুঃখ আছে যা সংসারের সাধারণ পাঁচটা খের চেয়ে অনেক বেশী তৃপ্তি দেয়।

এর পর সকালগুলো যখন রঙ লাগাত নন্দাদেবী ত্রিশুলের ধবধবে সাদা রফের চূড়ায় তখন অলকা হোটেলের বার নম্বর ঘরের সামনে রাখা ফোনটা জে উঠত।

ফোন ধরেই পাইনভিউ হোটেলে মরিয়মকে সুপ্রভাত জানাত কিংশুক। র ওদিক থেকে মরিয়ম কিংশুককে বলে দিত সেই বিশেষ দিনটির জন্যে কি ভাবনীয় প্রোগ্রাম সে ছকে রেখে দিয়েছে।

সারাদিন ওরা ঘুরত চৌবাটিয়ার আপেল বাগানে। ছোট্ট খাবারের দোকানের সামনে চেয়ারে বসে বসে রোদ্দুর পোহাত। আপেলে রস খেত নুক দিয়ে।

আবার কখনো রাণীক্ষেত থেকে পাহাড়ী পথের হাজার বাঁক পেরিয়ে হঠাৎ জির হত নৈনীতালের লেকে।

সেখানে পাল তোলা নৌকোর খেলা দেখে, ভাড়া নৌকোয় দাঁড় টেনে,

ফোয়ারার হিম কুয়াশার জলে রামধনুর ছবির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, নন্দাদেবীর সিঁথিতে সিঁদুরের রঙ লাগার আগেই ফিরে আসত রাণীক্ষেত।

কিংশুক বলে, এখনও তুমি আগের মতই ডাকাবুকো আছ মরিয়ম।

মরিয়মের উত্তর, জীবনটা নৌকোর মত কিংশুক। ভেসে চলাতেই সে খুশী হয়। বাঁধনটা শুধু তার সাময়িক বিশ্রাম।

কিংশুক একদিন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে বসল, আচ্ছা মরিয়ম, তুমি যে কাশ্মীর ছেড়ে চলে এলে, এখন কে দেখছে তোমার ঐ শিশু আশ্রমটি?

মরিয়মের ঢেকে রাখা একটা ব্যথার ওপর কে যেন আচমকা আঘাত দিয়ে বসল।

মরিয়ম চোখ দুটো বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল কতক্ষণ। তারপর এক সময় কিংশুকের দিকে তাকিয়ে বলল, সে অনেক ইতিহাস কিংশুক। সে কথা মনে করলে মানুষের ঘরে জন্মেছি বলে লজ্জা পাই।

বিস্মিত কিংশুক তাকিয়ে রইল মরিয়মের দিকে।

মরিয়ম বলল, তোমার কাশ্মীর ছেড়ে চলে আসার পর কেন জানি না নিজের ওপর একটা প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে জাগল। মনে হল, অনেক নীচের নরকে নেমে দেখি সেখানে কতখানি অন্ধকার। তোমাকে যতটুকু দুঃখ দিয়েছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করব নিজেকে আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে।

আমার ঠিক সেই অস্থিরতার দিনগুলোতে কে যেন পুলিশে খবর দিলে, আমি ছোট ছোট মেয়েদের নানাভাবে সংগ্রহ করে এনে রেখেছি আমার ডেরায়। তাদের বেড়ে ওঠার অপেক্ষায় রয়েছি আমি। ঐসব সুন্দর মেয়েগুলো নাকি একদিন হয়ে উঠবে আমার অনেক টাকা রোজগারের শিকার।

বলতে বলতে থেমে গেল মরিয়ম। হঠাৎ এক সময় উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, জান কিংশুক, অনেক খোঁজখবরের পরে আমি জেনেছিলাম বিতস্তা আর আমার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীতে মিলে আমার এ উপকারটুকু করেছে। ঐ বান্ধবীটি আমার জীবনের প্রায় সব খবরই রাখত। সে আবার ছিল বিতস্তারও বন্ধু।

কিংশুক অবাক হলে বলল, বিতস্তাও!

মরিয়মের মুখে ফুটে উঠল একটা দুঃখের হাসি। বলল, কোন পুরুষ নয় কিংশুক, মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু।

কিংশুক বলল, তারপর?

মরিয়ম বলল, ওদের দিয়ে গেল গভর্ণমেণ্ট অরফ্যানেজে। ভেঙে দিয়ে গেল আমার বুকের পাঁজর।

কিংশুক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মরিয়মের মুখের দিকে।

মরিয়ম একটু থেমে বলল, পুলিশ কেস শুরু হয়েছিল, কিন্তু বেশীদূর গড়ায়নি। ডাল ভিউ হোটেলের প্রোপ্রাইটার মিঃ সিং তদ্বির করলেন। পুলিশ কেসটা উইথড্র করে নিল।

পরে আমি অরফ্যানেজে ওদের দেখতে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে ওদের সে কি কান্না।

আমি ফিরে এসে আমার ব্যাঙ্কে যা ছিল সব দিয়ে দিলাম সরকারকে ওদের উন্নতির জন্যে।

অরফ্যানেজের পরিচালক একদিন এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমার ওপর যে অন্যায় আচরণ করা হয়েছে সেজন্যে লজ্জিত হলেন। আমাকে বার বার করে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, অফিসিয়াল বলছি না, কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধ রইল, আপনি সময় পেলেই ওদের দেখে আসবেন। আপনার সাহায্য আর উপদেশের মূল্য আমার কাছে অনেকখানি জানবেন।

তবু আমি আর ওখানে যেতে পারিনি কিংশুক। আমি গেলে ওরা যতটা খুশী হত, আমি চলে আসার সময় ওরা কষ্ট পেত তার চেয়ে অনেক বেশী।

ভাবলাম, কি দরকার মায়া বাড়িয়ে। কিন্তু থাকতেও পারলাম না কাশ্মীরে।

তুমি যে সমরখন্দের গুজর মেয়ে-পুরুষদের সোনমার্গ যাবার রাস্তায় দেখেছিলে, তাদের একদিন ডেকে এনে দিয়ে দিলাম আমার ঐ ডাল লেকের পাশের আস্তানাটা। বছরে বছরে ওরা এসে থাকবে ওদের মালপত্র আর পশুগুলো নিয়ে। মনে হল, সেই ভাল—সেই ভাল।

এদিকে ডালভিউয়ের মালিক মিঃ সিংকে রাজী করালাম নতুন একটা হোটেল খোলার ব্যাপারে। উনি রাজি হলেন একটিমাত্র শর্তে। আমাকে পুরোপুরি নিতে হবে সে হোটেলের ভার। আমিও রাজী হয়ে গেলাম।

থামল মরিয়ম। এক সময় স্বগতোক্তির মত করেই বলল, বড় হুড়োহুড়ি করতাম কিংশুক, ভালবাসতাম চিরদিন লোকজনের সঙ্গ, আজ একেবারে নির্জনে নির্বাসিত। এও এক জীবন। ধীরে ধীরে মানিয়ে নিয়েছি। এখানে একা একা বসে সকাল দুপুর সন্ধ্যে চীড়পাইনের গান শুনি। দু'একটা পাখি উড়ে এলে মনে হয় কোন অতিথি এল আমার হোটেলে।

কিংশুক বলল, যখন ট্যুরিস্টদের ভীড় থাকে না তখন সারাদিন কাটে কি করে তোমার? এই যেমন প্রবল শীতের দিনগুলো?

মরিয়ম বলল, ফুল ফোটাই। দারুণ শীতের দিনে অনেক রকম মরশুমী ফুল ফোটে। সারাদিন ওদের নিয়েই মেতে থাকি। প্রথম প্রথম হোটেলে একটা বার রেখেছিলাম। এ্যামির লোকেরা আসত। ড্রিঙ্ক করত। আমি পিয়ানো বাজাতাম। শেষে ওটাও আর ভাল লাগল না। তুলে দিলাম। জানো কিংশুক এখন নিঃসঙ্গতা সয়ে গেছে।

একটি মিষ্টি ঘন্টার আওয়াজ নীচে কামেশ্বর মন্দির থেকে সন্ধ্যার তরল অন্ধকারের পথ ধরে ওপরে উঠে আসে। কিংশুকের মনে হয়, এই সন্ধ্যা এই এই কাঁসর ঘন্টার ধ্বনি, হিমালয়ের ধ্যানমগ্ন রূপ পেছনে ফেলে রেখে সে আর কোথাও যাবে না। জীবনের বাকী দিনগুলো এখানে কাটিয়ে দিলে মন্দ কি।

কিন্তু তবু যেতে হয়। কাজের জগতের ডাক অনেক পথ প্রান্তর পাহাড় নদী পেরিয়ে তার কানে এসে বাজতে থাকে।

মরিয়ম কয়েক দিন থেকেই মনে মনে তৈরী করছিল নিজেকে কিংশুকের সঙ্গে আবার বিচ্ছেদের জন্য। যতই যাবার দিন ঘনিয়ে আসতে লাগল ওদের ততই

পিউয়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার সময় বেড়ে গেল মরিয়মের।

পিউয়ের দস্যিপনায় আর বাধা দিতে পারে না কিংশুক। বাধা দিতে গেলেই পিউ অমনি মুখে আঙুল রেখে শাসনের সুরে বলে, বড় দুষ্টু হয়েছ তুমি, এবার খু-উ-ব বকুনি খাবে।

মরিয়ম ফুলের বাগান থেকে বলে, হল ত, মেয়ের কাছে সব বাবাই জব্দ।

যাবার আগের দিন মরিয়ম বলল, আজ একটা নতুন জায়গায় তোমাকে নিয়ে যাব। আলমোড়া, কৌসানী সবই তোমার দেখা হয়ে গেছে। এখন একেবারে কাছেপিঠের একটা জায়গা চল যাই।

কিংশুক হেসে বলল, মনে হচ্ছে ওটা তোমার গুপ্তধনের সবসেরা মণি মরিয়ম?

মরিয়ম চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, সে কথা এখন নয়, আগে তো চল যাই।

পায়ে হেঁটেই চলল ওরা। কামেশ্বরের পাশ কাটিয়ে নেমে এল বাজারে। বাজার ছাড়িয়ে বাস স্ট্যান্ড। বেশ খানিক পথ হেঁটে আসার পর ডানদিকে পড়ল একটা প্রশস্ত গ্রাউন্ড। মিলিটারীরা শীতের সকালে গায়ে রোদ্দুর মেখে মার্চ করছিল।

ওদের পেছনে ফেলে এগিয়ে এল ওরা। পথের ধারে শীতের দিনে গাছের পাতায় লেগেছে কাঁচা হলুদ আর তামাটে রঙের ছোপ। তার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে দূর হিমালয়ের ঝক্‌ঝকে সাদা বরফ। আকাশের নীলে, পাহাড়ের সাদায় আর গাছপালার সবুজে হলুদে প্রকৃতি বার বার চোখ দুটোকে টেনে টেনে নিচ্ছে।

ওরা অনেকগুলো বাঁক পেরিয়ে এসে পৌঁছল গল্‌ফ্‌ মাঠে। বাঁ দিকে উঁচুনীচু খানিকটা পাহাড়ী টিলার প্রান্তে লাল ছাউনির একখানা বাড়ি। ডানদিকেও ঢেউ খেলানো প্রান্তর। দু দিকের প্রান্তরকে সিঁথির মত ভাগ করে চলে গেছে পাহাড়ী পথটা। প্রান্তরের চারিদিক ঘিরে চীড়পাইনের বন।

মরিয়ম বলল, এসো কিংশুক, আমার আবিষ্কার করা জগৎটা দেখাই তোমাকে।

পিউ ধরেছে মরিয়মের হাত, পেছনে চলেছে কিংশুক।

ওরা লাল ছাউনির বাড়িটা বাঁয়ে রেখে এসে দাঁড়াল ঢেউ খেলানো মাঠের প্রান্তে। কিংশুক দেখল, এর পর ছোট বড় চীড়পাইনের অরণ্য ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে গেছে। অনেক নীচে ভ্যালির ওপারে আবার একটা পাহাড়। তেমনি আশ্চর্য পাইন বনে ছাওয়া। দু'প্রান্তে দুটি পাহাড়, মাঝে গিরিখাদ আর অরণ্যের ওপারে সেই ত্রিশূল নন্দাদেবীর শুভ্র তুষার-মহিমা।

মরিয়ম বলল, খুব সাবধানে আমার পেছন পেছন নেমে এসো কিংশুক। ছোট ছোট চীড়পাইনের ডালগুলোর সাহায্য নিও দরকার হলে। ওটা নামার তৈরি পথ নেই এখানে।

কিংশুক বলল, পিউকে দাও আমার কাছে।

মরিয়ম বলল, নিজে আগে নাম তো সাবধানে, পিউয়ের কথা ভাববার লোক আছে এখানে।

মরিয়ম পিউকে কোলে তুলে নিতে গেল, কিন্তু গোল বাধাল পিউ। সে বাপীর মত একা একাই নামবে।

খুব শক্ত সমস্যা। গভীর গিরিখাদের দিকে নেমে যাওয়াই একটা দারুণ বিপজ্জনক ব্যাপার, তার ওপর ছোট মেয়েটিকে আগলে রেখে নামতে সাহায্য করা—সে আরও কঠিন কাজ।

কিংশুক ধমক দিল, কি হচ্ছে পিউ, কথা শুনছ না কেন ?

জেদ বেড়ে গেল পিউয়ের। সে দুটো হাত খুব শক্ত করে বুকের কাছ বরাবর চেপে ধরে রইল। কেউ যেন তাকে কোলে তুলতে না পারে। মরিয়ম ধরতে যেতেই পিউ আধ-বসার ভঙ্গীতে সরে দাঁড়াল।

এসো আমার হাত ধরে সাবধানে।

পিউ ধরল মরিয়মের একটা হাত। নামতে লাগল মরিয়মের পাশে পাশে। খানিক নেমেই উৎরাইয়ের সংকট আরও বাড়ল। কয়েকটা শিশু চীড়গাছের জটলা সেখানে। ঐ গাছগুলোর ডাল-পাতার ওপর দেহের অনেকখানি ভার রেখে একটা ঢালু অংশ পার হতে হবে।

মরিয়ম হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিল পিউকে। অমনি চেঁচিয়ে প্রবল অসম্মতি ঘোষণা করতে লেগে গেল পিউ। সে কিছুতেই শক্ত করে জড়িয়ে ধরবে না মরিয়মকে। দারুণ বিব্রত হয়ে পড়েছে মরিয়ম। এগিয়ে এল কিংশুক। হঠাৎ পিউয়ের মাথাটা ধরে খুব জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দিল। পিউয়ের পায়ে পায়ে এই অবাধ্যতা কিংশুকের বড় অসহ্য বলে মনে হল।

পিউ অবাক হয়ে বড় বড় চোখ মেলে তাকাল কিংশুকের দিকে। বাপীর কাছ থেকে এই ব্যবহার তার একেবারে অপরিচিত বলে মনে হল। সে জোর করে জরিয়ে ধরল মরিয়মকে। একটা হঠাৎ ভয় পেয়ে যাওয়া শিশু যেমন করে জড়িয়ে ধরে তার মাকে।

ওরা এবার নেমে এল আরও নীচে। একটা প্রশস্ত টিলার ওপর দাঁড়িয়ে ওরা দম নিল। কিংশুক আর মরিয়মের মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তে ওরা আশ্চর্য রহস্যময় এক জগতের বাসিন্দা। এখানে বুঝি কোনদিন এই কটি প্রাণী ছাড়া আর কারো পদচিহ্ন পড়েনি।

ওপরে—অনেক ওপরে নীল আকাশের টুকরো টুকরো ছোট বড় অংশ দেখা যাচ্ছিল ঘন পাইনের ডালপাতার ফাঁকে ফাঁকে। আর যেখানে বন নিবিড় সেখানে গাছের শাখা পল্লবের প্রতিরোধ ভেদ করে টিলার ওপর এসে পড়ছিল কতকগুলো সোনালী আলোর রশ্মি। ছায়া-আলোর আঁকিবুকিগুলো এই নির্জন গভীর গিরিখাতে শীতের বয়ে আসা কাঁপন লাগা হাওয়ার ছোঁয়ায় সত্যিই যেন কোন অদৃশ্য ডেকোরেটারের পেতে রাখা আসন বলে মনে হচ্ছিল। এ যেন অজানা পুরীতে হঠাৎ এসে পড়া জনপদবাসীর আপ্যায়নের ব্যবস্থা।

দুটো পাহাড় আর অজস্র তরঙ্গিত অরণ্যবৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল

ঝকঝকে তুষারের ছবি।

কতক্ষণ ওরা কথা না বলে অরণ্য পাহাড়ের সঙ্গে নিজেদের মনটাকে কোমল লাবণীর মত মিশিয়ে মাখিয়ে দেখতে লাগল। ওদের নীরব চাওয়া গাছের ঝিরিঝিরি পাতা, শাখাপ্রশাখা, পাহাড়ের কোল বেয়ে গড়িয়ে চলল ঝর্ণা ধারার মত। সব শেষে দুজনের চাওয়া দুটি মুখের ওপর এসে স্থির হয়ে গেল।

এক সময় কিংশুক কথা বলল, এখানে একটু বসবে মরিয়ম।

মরিয়ম কোন কথা বলল না। সে ঐ আলোছায়ার জাজিমের ওপর বসে পড়ল।

কিংশুক পাশে বসল। হঠাৎ তার কি মনে হল সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে তাকাতে লাগল। চীড়গাছের পাতার ফাঁকে অজস্র আলোর পথ। এই পথ ধরে তার অবাক দৃষ্টি নীল আকাশে নীলকণ্ঠ পাখির মত উড়ে গেল।

অতি সন্তর্পণে নিজের কোলের ওপর কিংশুকের মাথাটা তুলে নিয়েছে মরিয়ম। সে এখন পাহাড় অরণ্য আকাশ থেকে সরিয়ে নিয়েছে তার চোখ। কিংশুকের মুখের ওপর সে দেখছে আকাশের ছবি, অরণ্যের ছায়া।

কিংশুক আকাশের দিকে চেয়ে চেয়েই বলল, মরিয়ম, আজকের এই সকালটা ভাগ্যের বিধাতা পুরুষ যেন আমাদেরই জন্য সৃষ্টি করেছেন। এখানে আলো হাওয়ার গাছের ছায়ায় হারিয়ে যাবার সুর বাজছে।

মরিয়ম বলল, অনেক পাহাড় আর অনেক বনের গভীরে মনে হচ্ছে আমরা যেন তলিয়ে গেছি।

কিংশুক মরিয়মের মুখে চোখ রেখে বলল, এটা আমাদের বন-বাসর।

মরিয়ম কোন কথা বলল না।

কিংশুক আর মরিয়মকে একবার পাক দিয়ে বেরিয়ে গেল পিউ। সে পাশের শিশু চীড় গাছের সরু সরু পাতা ছিঁড়েছিল। তার সেই সম্পদগুলো সে আপন মনে কি বলতে বলতে ছড়িয়ে দিয়ে গেল ওদের ওপর?

ওবা হাসল। শিশু-অভিনন্দনের উত্তর দিল মরিয়ম মিষ্টি চোখের দৃষ্টিতে।

এবার মরিয়ম বলল, পিউয়ের বড় কষ্ট। ও আরও একটু বড় হলে হয়ত মায়ের জন্যে কাঁদবে। মা-মরা মেয়ের বড় দুঃখ।

কিংশুক বলল, তুমি ওকে যত দুঃখী ভাবছ তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখী ও।

মরিয়মের চোখে বিস্ময়। কিংশুকের কথাটার অর্থ সে ধরতে পারল না।

কিংশুক বলল, তুমি কি বিশ্বাস করবে মরিয়ম ওর মা এখনও জীবিত।

একটা ভয়ার্ত বিস্ময়ের স্বর বেরিয়ে এল মরিয়মের গলা দিয়ে।

কিংশুক বলল, পিউয়ের মা মধুশ্রীকে আমি বিয়ে করেছিলাম, কিন্তু তখন জানতাম না বিয়ের আগে থেকেই সে পিউকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে তার দেহের গভীর গোপনে।

মরিয়মের গলায় আর্ত কান্নার সুর, তাহলে পিউয়ের কি কোন পিতৃ পরিচয় নেই!

কিংশুক ম্লান হাসি হেসে বলল, জন্ম দিয়েই ওদের কাজ ফুরিয়েছে মরিয়ম। এখন যেহেতু আমি ওকে পালন করছি, আমিই ওর পিতা।

মরিয়ম বলল, এখন কোথায় আছে পিউয়ের মা ?

কিংশুক বলল, লোকে জানে মধুপুরে বেড়াতে গিয়ে পিউকে জন্ম দিয়েই মধুশ্রী মারা গেছে। কিন্তু আসল ঘটনা ও জানিয়ে গেছে আমাকে একখানা দীর্ঘ চিঠিতে। এক নৃত্যশিল্পীকে ও ভালবাসত। নাচও শিখত তার কাছে। পিউ তারই মেয়ে। আমেরিকার নাচের স্কুল করে সেখানেই রয়েছে ওরা।

মরিয়ম বহুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না।

কিংশুক আবার বলল, জানো মরিয়ম, মধুশ্রী একটা ঝিয়ের কাছে মেয়েটাকে কিছু টাকা দিয়ে ফেলে রেখে যায়। পিউয়ের কোন দায়িত্বই সে নিতে চায়নি। আমি পারিনি ওকে ঐ ঝিয়ের কাছে ফেলে রেখে আসতে। সবাই জানে পিউ আমারই মেয়ে।

মরিয়মের মুখে ফুটে উঠেছে একটা আলো। চোখ দুটি কিংশুকের দিকে তাকিয়ে সজল। কিংশুকের মনটা কোথায় যেন তার মনের সঙ্গে মিলে গেছে। রোদের সোনা আর সবুজ যেমন করে মাখামাখি হয়ে মিলে আছে।

একটা কণ্ঠের শব্দ হঠাৎ কানে বাজল। মরিয়মের চোখ কিংশুকের মুখের ওপর থেকে সরে গেছে ততক্ষণে।

ছুটেছে মরিয়ম। গাছের ডালপাতা ধরে হরিণের মত লাফাতে লাফাতে সে চড়াই ভেঙে উঠে চলেছে।

কিংশুক তাকিয়ে দেখল, পিউ অনেক ওপরে উঠে গেছে কখন। হঠাৎ পা ফসকে একটা সরু ডাল ধরে ঝুলে আছে সে। মরিয়ম ঝাঁপিয়ে পড়ে অনিবার্য পতনের হাত থেকে ছিনিয়ে বুকে চেপে ধরল পিউকে।

বিহ্বল কিংশুক উপরে উঠে গিয়ে দেখল, মরিয়মের বুকে মুখখানা চেপে রেখেছে পিউ। সারা শরীরটা তার কেঁপে কেঁপে উঠছে। একি শিশুমনের অভিমান। তার দিকে দৃষ্টি না দেবার জন্যই কি চলে যাওয়া!

মরিয়মের মুখও পিউয়ের মাথাটাকে চেপে ধরেছে। তার মুখ-চোখে উদগত কান্নার ছবি।

ওরা অনেক চড়াই ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল। এখন আর পিউ একটি বারও মরিয়মের কোল ছাড়া হতে চাইছে না। নিঃসাড়ে একা ওপরে ওঠার ভয়ংকর পরিণাম সে বুঝতে পেরেছে। তার শিশু মনে একটা বিশ্বাস গভীর হয়েছে, এই মহিলার বুকে মুখ ডুবিয়ে দুটো হাতে গলা জড়িয়ে নির্ভয়ে ঘুমনো যায়।

ওরা উঠছে, আকাশ আর আলো ওদের অভ্যর্থনা করার জন্যে অনেক বড় হয়ে নীচে নেমে আসছে।

রাতে মরিষম বলল, শোন, পিউকে আমি ছেড়ে দিতে পারব না তোমার হাতে। ও থাকবে আমার কাছে রাণীক্ষেতে।

কিংশুক মরিয়মের হাতখানা নিজের বুকেব মধ্যে চেপে ধরে বলল, জানি,

পিউ তোমাকে আর ছাড়বে না। ও তোমার কাছেই রইল। আমি আসব তোমার কাছে, যেদিন মন লাগবে না কাজে,রোদ্দুরে লাগবে কাঁচা সোনার রঙ। সেদিন রঙ তুলিগুলো আধখানা আঁকা ছবির ওপর ছড়িয়ে ফেলে রেখে নিশ্চিত জেনো আমি চলে আসব এখানে।

মরিয়ম কিংশুকের বুকের ওপর রাখা তার হাতখানা বুলিয়ে নিতে নিতে বলল, আমি রিসেপশনিস্ট কিংশুক, আকার সমস্ত মন তোমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য সারা জীবন উন্মুখ হয়ে থাকবে।